রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ

হুমায়ুন আজাদ

অবতরণিকা

এক চমস্কীয় রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের উৎসারণ-প্রসার-প্রতিষ্ঠা বিশ শতকী জ্ঞানজগতের একটি বড় ঘটনা : ভাষাবিজ্ঞানের সমগ্র ইতিহাসে এর তুলনা পাই না। রূপান্তর ব্যাকরণ অভাবিত নতুন কালের সূচনা করে ভাষাবিজ্ঞানমণ্ডলে, এবং মানববিদ্যার বিভিন্ন শাখায় সঞ্চার ক'রে দেয় গভীর-ব্যাপক প্রভাব। চমস্কি ভাষার খণ্ডাংশের দিকে না-তাকিয়ে চোখ দেন ভাষার সর্বাঙ্গে : পেশ করেন বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব, এবং রচনা করেন ভাষাবিশ্লেষণের সুশৃঙ্খল প্রণালিপদ্ধতি। ১৯৫৭-উত্তর কালে রূপান্তর ব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞান হ'য়ে ওঠে প্রায় সমার্থক; তাই এ-সময়কে ডাকা যায় রূপান্তর ব্যাকরণের কাল নামে। বিগত দু-দশকে রূপান্তর ব্যাকরণ-বিষয়ক ও ভিত্তিক-রচনা এতো বিপুল পরিমাণে রচিত হয়েছে যে তার সমতুল্য রচনা, সম্ভবত, রচিত হয়নি ভাষাবিজ্ঞানের সারা ইতিহাসেও। কিন্তু বাঙলা ভাষায় রূপান্তর ব্যাকরণ বিষয়ক রচনা রচিত-প্রকাশিত হয়েছে সামান্য; এবং রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের তত্ত্ব ও কৌশল ভিত্তি ক'রে আজো রচিত হয়নি কোনো বাঙলা ব্যাকরণ। রূপান্তর ব্যাকরণের তত্ত্ব ও প্রণালিপদ্ধতি সম্পর্কে এটিই সম্ভবত প্রথম ব্যাপক-বিস্তৃত উদ্যোগ।

দুই বছরখানেক আগে যখন আমি বাঙলা ভাষার একটি রূপান্তরমূলক কারক-ব্যাকরণ রচনার পরিকল্পনা নিই, তখন বোধ করি যে ব্যাকরণ রচনার আগে রূপান্তর ব্যাকরণের তত্ত্ব ও কৌশল পেশ করা দরকার বাঙালি পাঠকদের সামনে। পেশ করা দরকার, কেননা তত্ত্ব ও কৌশল না-জানা পাঠকদের কাছে বাঙলা ভাষার রূপান্তর ব্যাকরণ জটিল, দুরূহ, অগম্য বোধ হবে। শুরুর সময় ভেবেছিলাম পঞ্চাশ-ষাট পাতার মধ্যে রূপান্তর ব্যাকরণের তত্ত্ব ও কৌশল বর্ণনা করলেই হয়তো চলবে; কিন্তু ধীরেধীরে আমার সে-ধারণা বদলে যায়, এবং রচনাটি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'তে থাকে; এবং পরিশেষে বর্তমান রূপ পায়। আমি এখন বুঝতে পারি রূপান্তর ব্যাকরণের তত্ত্ব-কৌশল সম্পর্কে এ-রচনাটিও যথেষ্ট ব্যাপক নয় : আলোচিত-হ'তে-পারতো এমন অনেক বিষয় এখানে অনালোচিত থেকে গেলো ;—যেহেতু কারো একার পক্ষে রূপান্তর ব্যাকরণের সমস্ত তত্ত্ব-কৌশল বর্ণনার বাসনা দুরভিলাষ ও দুঃস্বপ্নের পরাকাষ্ঠা।

তিন বাঙলা ভাষায় ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক রচনা, অধিকাংশ সময়ই, পৃষ্ঠাপরম্পরায় ভরা থাকে বিদেশি ভাষার অঢেল উপাত্তে ও উদাহরণে। আত্মদুর্বলতা মোচনের ওটি এক চমৎকার উপায়। আমি এ-রচনায় সব সময়ই নিয়েছি বাঙলা উপাত্ত। ফলে এ-তে পাঠকেরা ঢুকতে পারবেন অনেক আরামে। তবে এ-টি সহজসরল স্নিগ্ধ হয়তো হ'য়ে ওঠেনি : যেহেতু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞানের মতোই, বিপুল পরিমাণে সাহায্য নেয় গণিতপ্রতীকসংকেতের। আমি, পাঠকদের ভেবে, প্রতীকীসাংকেতিক ভাষ্যের চেয়ে অধিক দিতে চেয়েছি গদ্যভাষ্য; তবে অপরিহার্য প্রতীকসংকেতরাশিকে এড়াই নি। যদিও ভুলিনি যে পাণিনি বহিষ্কৃত হয়েছিলেন পাঠশালা থেকে দুরূহতার অভিযোগে; তবু কোথাও অতি সরলীতরলীকরণে যাই নি আমি এ-কথা ভেবে যে এ-রচনার লক্ষ্য কোমলমতীরা নয়।

চার যে-সব সংকেতপ্রতীক ও সংক্ষেপক ব্যবহৃত হয়েছে এ-রচনায়, সে-সবের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যথাস্থানে; তবু, সুবিধার জন্যে, এখানে তাদের পেশ করা হলো :

সংকেতপ্রতীক

তীর : পুনর্লিখন সূত্রে ব্যবহৃত পুনর্লিখন চিহ্ন

দ্বিতীর : রূপান্তর-সূত্রে ব্যবহৃত সাংগঠনিক রূপান্তর নির্দেশক চিহ্ন

( ) প্রথম বন্ধনি : ঐচ্ছিকতাজ্ঞাপক চিহ্ন

{ } দ্বিতীয় বন্ধনি : বিকল্প সম্প্রসারণজ্ঞাপক চিহ্ন

[ ] তৃতীয় (চতুষ্কোণ) বন্ধনি : সমস্থানে বিভিন্নতাজ্ঞাপক চিহ্ন

[ ] (নিচে লেখা: বা বা) অভিধাসহ চতুষ্কোণ বন্ধনি : বাক্যের সীমানির্দেশক চিহ্ন

/ / দ্বৈত তির্যক রেখা : ধ্বনিমূলচিহ্ন

/ একক তির্যক রেখা : প্রতিবেশনির্দেশক চিহ্ন

\# দ্বৈত যোগচিহ্ন : বাক্যের, বা অন্য কোনো উপাদানের, সীমানির্দেশক চিহ্ন

ϕ শূন্য : শূন্য-ভাষাবস্তু নির্দেশক চিহ্ন

* তারকা : ব্যাকরণবিরুদ্ধতা নির্দেশক চিহ্ন

\+ যোগচিহ্ন : পুনর্লিখন সূত্রে সংযোগ নির্দেশের জন্যে ব্যবহৃত চিহ্ন

[ ] চতুষ্কোণ বন্ধনি : বাক্যিক, আর্থ, ধ্বনিতাত্ত্বিক 'বৈশিষ্ট্য' নির্দেশক চিহ্ন

Φ পরিচ্ছেদাংশচিহ্ন

শব্দপ্রতীক

অনু : অনুসর্গ ক্রিমূ : ক্রিয়ামূল ; ক্রিরূ : ক্রিয়ারূপ ; ক্রিরী : ক্রিয়ারীতি ; ক্রিস : ক্রিয়াসহায়ক ; ক্রিপ : ক্রিয়াপদ ; নি : নির্দেশক ; বা : বাক্য ; বি : বিশেষ্য ; বিপ : বিশেষ্যপদ ; বিক : বিশেষক ; বিভ : বিভক্তি ; বি$_{মনুষ্য}$: মনুষ্যবাচক বিশেষ্য ; বি$_{বস্তু}$: বস্তুবাচক বিশেষ্য ; মিপ্র : মিশ্রপ্রতীক ; দ্র : দ্রষ্টব্য

পাঁচ রচনাটিতে কতিপয় শব্দের প্রচলিত বানান অগ্রাহ্য ক'রে ব্যবহার করেছি আমার বোধ ও রুচি অনুসারী বানান।

সূচি

১·০ ভূমিকা
১·১ বিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞান
১·২ স্বায়ত্তশাসিত বাক্যতত্ত্ব : রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ
১·২·০ চমস্কীয় বিপ্লব
১·২·১ ভাষিক তত্ত্বের লক্ষ্য
১·২·২ ভাষার সৃষ্টিশীলতা ও বাক্যের অনন্ততা
১·২·৩ 'রূপান্তরমূলক' এবং 'সৃষ্টিশীল'
১·২·৪ যোগ্যতার স্তর
১·২·৫ দুর্বল ও শক্তিমান : ব্যাকরণ মূল্যায়নপ্রণালি
১·২·৬ (ভাষা)বোধ ও (ভাষা)প্রয়োগ
১·২·৭ চৈতন্যবাদ
১·২·৮ ভাষা-অর্জন ও ভাষিক তত্ত্ব
১·২·৯ ভাষা-সর্বজনীনতা
১·৩ রূপান্তর ব্যাকরণের প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য
১·৩·১ বৃক্ষচিত্র / পদচিত্র
১·৩·২ গ্রন্থি ও সূত্র

১·৩·৩ প্রতীকায়ন
১·৪ পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ
১·৪·১ প্রতিবেশমুক্ত ও প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ : কর্তা-ক্রিয়ারূপ সংগতি
১·৪·২ পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ রচনার কৌশল
১·৪·৩ পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা
১·৫ রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ [[এক]]
১·৫·০ "সিন্ট্যা"-কাঠামোর ব্যাকরণ
১·৫·১ "সিন্ট্যা"-কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণের সংগঠন
১·৫·১·১ পদসাংগঠনিক কক্ষ
১·৫·১·২ রূপান্তর কক্ষ
১·৫·১·৩ রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ
১·৫·২ রূপান্তর ব্যাকরণ [[এক]]-এর প্রণালিতে বাক্যবিশ্লেষণ
১·৫·৩ স্বয়ম্ভশাসিত বাক্যতত্ত্ব : বাক্য ও অর্থ
১·৬ রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ [[দুই]]
১·৬·১ রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ [[দুই]]-এর উদ্ভব
১·৬·২ রূপান্তর ব্যাকরণ [[দুই]]-এর সংগঠন
১·৬·৩ ভিত্তি কক্ষ : আভ্যন্তর বা গভীর সংগঠনের বৈশিষ্ট্য
১·৬·৪ পদশ্রেণীকরণ
১·৬·৫ ভূমিকাগত পরিচয়
১·৬·৬ বাক্যিক বৈশিষ্ট্য
১·৬·৭ ভিত্তি কক্ষের সংগঠন : পদসাংগঠনিক উপকক্ষের বৈশিষ্ট্য
১·৬·৮ আভিধানিক উপকক্ষ
১·৬·৯ আর্থকক্ষ
১·৬·৯·১ অর্থজ্ঞান
১·৬·৯·২ শব্দের আর্থসংগঠন
১·৬·৯·৩ আর্থ ও বাস্তব জ্ঞান
১·৬·৯·৪ প্রজেকশন সূত্রাবলি
১·৬·৯·৫ সিলেকশনাল রেস্ট্রিকশন : সংগতিবিধি
১·৬·১০ শুদ্ধতার সূত্র : মাত্রা ও সীমা
১·৬·১১ রূপান্তর উপকক্ষ
১·৬·১১·১ রূপান্তরসূত্র রচনাপ্রণালি
১·৬·১১·২ চক্রাবর্তন : সাইক্লিক প্রিনসিপল
১·৬·১২ রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ
১·৬·১২·১ বহিঃসংগঠন ও ধ্বনিসূত্র
১·৬·১২·২ স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
১·৭ জেনারেটিভ সিম্যানটিকস : সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব
পরিভাষা
রচনাপঞ্জি

১. ০ ভূমিকা

ছোটো, শাণিত ও সর্বাংশে বিজ্ঞানমনস্ক একটি বই বেরোয় বিজ্ঞানস্তুতিমুখর বিশ শতকের ষষ্ঠ দশকের দ্বিতীয়াংশে—১৯৫৭ অব্দে: বইটির নাম "সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচারস", রচয়িতার নাম আবরাম নোয়াম চমস্কি।[১] "সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচারস"-এর প্রকাশ ভূকম্পনতুল্য। নিরন্ধ্র গবেষণাকক্ষে সুসজ্জিত উপাত্তপ্রণালিপদ্ধতি পরিবৃত হ'য়ে বর্ণনামূলক বিজ্ঞানসাধনা করছিলেন যে-ভাষাবিজ্ঞানীরা, ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের নৈর্ব্যক্তিক চিত্তে, এবং ব্যাপক সন্ত্রাসের মধ্যে ভেঙে পড়ে কয়েক দশকের নিরাসক্ত শ্রমেপ্রেমে রচিত উপাত্তপ্রণালিপদ্ধতির, শ্রেণীকরণী সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের, সুদৃশ্য টাওয়ার। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের লক্ষ্য ছিলো নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞানচর্চা। তা-ই তাঁদের আরাধ্য, যা বিজ্ঞানসম্মত। তাঁদের কাছে তা-ই বিজ্ঞানসম্মত, যা দৃষ্টিগ্রাহ্য, বাস্তব, পর্যবেক্ষণসম্ভব, মূর্ত;—গবেষণাটেবিলে ছিঁড়েফেড়ে যা পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ-শ্রেণীকরণ করা যায় না, তাঁদের কাছে তা অবৈজ্ঞানিক;—সুতরাং পরিত্যাজ্য। তাঁরা ভালোবাসতেন সংগৃহীত উপাত্তকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে; ভালোবাসতেন উপাত্তের ওপর প্রণালিপদ্ধতির কৌশল চালিয়ে শ্রেণীকরণ এবং শ্রেণীকরণ এবং শ্রেণীকরণ

---

১. যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া-অন্তর্গত ফিলাডেলফিয়ায় ৭ ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন (আবরাম নোয়াম) চমস্কি [চোম্‌স্কি] (দ্র লায়নস (১৯৭০, ১১৭))। ফিলাডেলফিয়ায় তিনি লাভ করেন বাল্যশিক্ষা; এবং উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। পেনসিলভানিয়ায় তাঁর অধ্যয়নের বিষয় ছিলো ভাষাবিজ্ঞান, গণিত ও দর্শন। তিনি ভাষাবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, তবে তাঁর গবেষণাকাজের অধিকাংশ সম্পন্ন হয় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৫১—১৯৫৫)। ১৯৫৫ সালে চমস্কি অধ্যাপক-রূপে যোগ দেন এমআইটি-তে; এবং আজো আছেন সেখানেই। চমস্কির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বেরোয় ১৯৫৭ সালে, এবং এটির প্রকাশের সাথেসাথে, উনত্রিশ বছর বয়সে, তিনি আয় করেন বিশ্বখ্যাতি। চমস্কি কেবল প্রতিভাবান নন, ভাগ্যবানও। তাঁর খ্যাতি অল্প সময়ে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের এপ্রান্তেসেপ্রান্তে; এবং তিনি বরিত হন সর্বত্র। বিশ্বের সাতটিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি পরিয়ে দিয়েছে। এ-সমস্ত সম্মানমাল্যের অধিকাংশ তিনি লাভ করেন চল্লিশ পেরোনোর আগেই।

ভাষাবিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ তিনি নেন হিব্রুবিদ পিতার কাছে। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকরূপে লাভ করেন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের এক প্রধান পুরুষ জেলিগ হ্যারিসকে। হ্যারিস চমস্কির মেধা ও প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করেন নানাভাবে। হ্যারিস নিজেই উদ্ভবন করে-ছিলেন একরকম বহির্তলভিত্তিক রূপান্তর ব্যাকরণ। হ্যারিসীয় রূপান্তর ব্যাকরণকে চমস্কি অভাবিতরূপে সম্প্রসারিত করেন, এবং সৃষ্টি করেন ভাষাবিজ্ঞানের নবযুগ। শিক্ষক কর্তৃক তিনি যেমন অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তেমনি শিক্ষকের প্রণালিপদ্ধতির বিরুদ্ধেও তাঁর মনে জন্মেছিলো কড়া প্রতিক্রিয়া। হ্যারিস যে-ভাষাবিজ্ঞানের প্রবক্তা, তাকে চমস্কি বাতিল ক'রে দিয়েছেন অন্তঃসারশূন্য 'শ্রেণীকরণী ভাষাবিজ্ঞান' অভিধায়।

চমস্কি আবাল্য বিদ্রোহী—সমাজতন্ত্র ও নৈরাজ্যবাদমুখি। ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর অভিনবত্ব ও আন্তর বিদ্রোহেরই এক রকম পাণ্ডিত্যমণ্ডিত প্রকাশ। ১৯৬৫-র পরে তিনি জড়িয়ে পড়েন প্রকাশ্য রাজনীতিতে; এবং গ্রহণ করেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শক্তিমান বিরোধীর ভূমিকা। ভিয়েত-নামে মার্কিন আগ্রাসনকে তিনি আক্রমণ করেন তীব্রভাবে; এবং ভিয়েতনামে যুদ্ধের জন্যে আরো-পিত যুদ্ধকর পরিশোধ করতে তিনি অস্বীকার করেন। ভাষাবিজ্ঞানে সাময়িক বিরতি দেন তিনি এ-সময়; এবং রচনা শুরু করেন রাষ্ট্রনীতি ও বৈদেশিকনীতি বিষয়ক রচনা। তাঁর রাষ্ট্র ও বৈদেশিকনীতি বিষয়ক রচনাও তুমুল সাড়া ও আলোড়ন জাগায়; এবং এ-এলাকাতেও তিনি পরিগণিত হন অসাধারণ চিন্তাবিদরূপে। এ-বিষয়ে তাঁর প্রথম আলোড়নজাগানো গ্রন্থ হচ্ছে "আমেরিকান পাওয়ার এ্যাণ্ড দি নিউ ম্যানডারিনস" (১৯৬৯)। বর্তমানে তিনি পুনরায় মনোনিবেশ করেছেন ভাষাবিজ্ঞানচর্চায়। তিন সন্তানের জনক চমস্কির সহধর্মিনী হচ্ছেন ভাষাবিজ্ঞানী ডক্টর ক্যারোল চমস্কি।

করতে। ভাষাবর্ণনায় যে-পরিমাণ সাফল্য তাঁরা আয় করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি সফল হয়েছিলেন প্রচলিত ব্যাকরণের নামে বদনাম রটাতে : চরাচরে তাঁরা রটিয়ে দিয়েছিলেন যে প্রচলিত ব্যাকরণ নামী যে-শাস্ত্র বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ানো হয়, তা ভয়াবহভাবে অবৈজ্ঞানিক। প্রচলিত ব্যাকরণের কোনো বিজ্ঞানসম্মত প্রণালিপদ্ধতি নেই ; তাতে দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয় অতীন্দ্রিয় মানদণ্ড। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের মতামত যখন সর্বত্র আস্থা আয় করতে যাচ্ছিলো, তখন বেরোয় "সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচারস" (১৯৫৭), এবং বদলে যায় বিজ্ঞানধারণা (দ্র Φ ১·১)। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানকে চমস্কি দেন নতুন অভিধা—'শ্রেণীকরণী ভাষাবিজ্ঞান'—তাঁর ভাষায় "ট্যাকসোনোমিক লিংগুইস্টিকস", এবং দেখান যে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের মর্মমূলে লুকিয়ে আছে মারাত্মক ত্রুটি। তাঁদের বিজ্ঞানবোধ ভ্রান্ত, এবং বিভ্রান্তিকর। কোনো তত্ত্বের যাথার্থ্য পরখের উপায় হলো ওই তত্ত্বের মুখোমুখি প্রশ্নসংকুল উপাত্ত তুলে ধরা : ওই তত্ত্ব যদি বিরোধী উপাত্ত ব্যাখ্যা করতে পারে, তবে তা সার্থক, অন্যথায় ব্যর্থ। চমস্কি এমন সব উপাত্ত উপস্থিত করেন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের সামনে, যা ব্যাখ্যায় শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয় সাংগঠনিক প্রণালিরাশি। চমস্কি দেখান যে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা সীমাবদ্ধ থেকেছেন বস্তুর বাহ্যস্তরে,—উপাত্তের অন্তরে প্রবেশে তাঁরা হয়েছেন ব্যর্থ। ভাষার মতো বিশাল ব্যাপক সৃষ্টিশীল বিষয়কে সাংগঠনিকেরা সীমাবদ্ধ করেছেন ধ্বনিলিপিতে আবদ্ধ সামান্য তুচ্ছ উপাত্তে। ব্যস্ত থেকেছেন তাঁরা ভাষার বহিরঙ্গের ব্যবচ্ছেদে, এবং ভাষার আন্তরশৃঙ্খলা উদঘাটনের বদলে দশকপরম্পরায় মনোনিবিষ্ট থেকেছেন ভাষার তুচ্ছ খণ্ডাংশের বহিঃস্তরের শ্রেণীকরণে ও বর্ণনায়।

চমস্কি-প্রবর্তিত ব্যাকরণের নাম 'ট্র্যান্সফরমেশনাল জেনারেটিভ গ্রামার', যার বাঙলা নাম দিতে পারি 'রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ' (সংক্ষেপে : রূপান্তর ব্যাকরণ)। 'ব্যাকরণ'[২] শব্দটিকে সাংগঠনিকেরা সাধারণত ব্যবহার করতেন না, করলেও ব্যবহার করতেন অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে। তাঁদের প্রিয় শব্দাবলি হচ্ছে 'ধ্বনিতত্ত্ব', 'রূপতত্ত্ব', 'অব্যবহিত-উপাদান', 'বাক্যতত্ত্ব' প্রভৃতি। এমন ধারণারও তাঁরা জন্ম দিয়েছিলেন যে ব্যাকরণচর্চা ভাষাবিজ্ঞান নয়, ভাষাবিজ্ঞান হচ্ছে ধ্বনিতত্ত্ব-রূপতত্ত্ব এবং, সামান্য পরিমাণে, বাক্যতত্ত্বের চর্চা। 'ব্যাকরণ' শব্দটিকে পুনরায় শ্রদ্ধেয় ক'রে তুলেছেন চমস্কি,

২. 'ব্যাকরণ' ('শুদ্ধ শব্দনির্মাণবিদ্যা'), ও 'গ্রামার' ('শুদ্ধ বর্ণবিন্যাসবিদ্যা') শব্দের মূল ও আক্ষরিকার্থ বিনষ্ট হ'তে বেশি সময় লাগে নি। সাধারণ ভাষাভাষীদের কাছে 'ব্যাকরণ'-এর অর্থ হচ্ছে 'ব্যাকরণপুস্তক', যা অনিচ্ছায় বিদ্যালয়ে-মহাবিদ্যালয়ে পড়তে হয়। প্রচলিত ব্যাকরণ যদিও অর্থনির্ভর, তবু এর বিশেষ লক্ষ্য বিদ্যার্থীদের শুদ্ধ শব্দ গঠনের নিয়মকানুন শেখানো। এ-দিকে গুরুত্ব দিয়ে 'ব্যাকরণ' শব্দের বদলে পতঞ্জলি ব্যবহার করেছিলেন 'শব্দানুশাসন' শব্দটি। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা 'ব্যাকরণ' বলতে বুঝতেন 'বাক্যতত্ত্ব', কখনো 'রূপতত্ত্ব' ; বা কখনো 'বাক্যতত্ত্ব' ও রূপতত্ত্ব। 'ব্যাকরণ' শব্দটিকেই পরিহার করতেন তাঁরা। ভাষার সমগ্র রূপ পর্যবেক্ষণ না ক'রে তাঁরা মনোযোগ দিয়েছিলেন ভাষার বিভিন্ন স্তরে : 'ধ্বনিতত্ত্ব', 'রূপতত্ত্ব' প্রভৃতিতে। এমন ধারণা তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন যে 'ব্যাকরণ' একটা পুরোনো ব্যাপার ; কিন্তু 'ধ্বনিতত্ত্ব', 'রূপতত্ত্ব' ইত্যাদি হচ্ছে অভিনব, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্র। অর্থকে তাঁরা বর্জন করেছিলেন সম্পূর্ণভাবে। রূপান্তর ব্যাকরণের উন্মেষযুগে অনেক রূপান্তরবাদীও মনে করতেন 'ব্যাকরণ' হচ্ছে 'রূপতত্ত্ব+বাক্যতত্ত্ব'। ক্যাটজ ও ফোদোর (১৯৬৩) সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন যে 'ভাষাবর্ণনা থেকে ব্যাকরণ বাদ দিলে যা থাকে, তা-ই অর্থতত্ত্ব'। রূপান্তরবাদীরা 'ব্যাকরণ' শব্দটিকে পুনর্বাসিত করেন। আজকাল 'ব্যাকরণ' ও 'ভাষাবিজ্ঞান' প্রায় সমার্থক। তবে দুটি প্রধান অর্থে রূপান্তর ব্যাকরণে 'ব্যাকরণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয় : (ক) কোনো ভাষার সমগ্র নিয়মশৃঙ্খলা হচ্ছে ওই ভাষার 'ব্যাকরণ' ; এবং (খ) 'ভাষাবিজ্ঞানী কর্তৃক কোনো ভাষার সমগ্র নিয়মশৃঙ্খলার বর্ণনা (ধ্বনি+রূপ+বাক্য) হচ্ছে ওই ভাষার ব্যাকরণ (দ্র Φ ১·২·৮)।

কেননা তাঁর তত্ত্বে ব্যাকরণই প্রধান বস্তু, যার বিভিন্ন কক্ষ হচ্ছে বাক্যতত্ত্ব-অর্থতত্ত্ব-রূপতত্ত্ব-ধ্বনিতত্ত্ব। এ-রচনায় আমার লক্ষ্য চমস্কীয় রূপান্তর ব্যাকরণের তত্ত্ব ও কৌশলের ব্যাপক-বিস্তৃত ও অনুপুঙ্খ বিবরণ দান (দ্র ৫ ১'২'৩—৫১'৭)। রূপান্তর ব্যাকরণের তত্ত্ব ও প্রক্রিয়া অনুধাবন ও আয়ত্তের জন্যে কালকালান্তরের ভাষাবিশ্লেষণ-রীতি, ও বিশ শতকী সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার (দ্র আজাদ (১৯৭৯ ক. খ))।

১. ১ বিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞান

ভাষাবিজ্ঞানের ভাষ্যকারেরা সাধারণত 'ভাষাবিজ্ঞান'-এর সংজ্ঞা দিয়ে তাঁদের গ্রন্থ শুরু করেন (দ্র ডিনিন (১৯৬৭), লায়নস (১৯৬৮))। 'লিংগুইস্টিকস'—তাঁদের সংজ্ঞানুসারে—'ভাষার বৈজ্ঞানিক বিদ্যা।' ওই বিদ্যার প্রতি নির্দেশ করার জন্যে বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় দুটি সমার্থক শব্দ: 'ভাষাতত্ত্ব' ও 'ভাষাবিজ্ঞান'। 'ভাষাতত্ত্ব' শব্দটি, সম্ভবত, রচিত হয়েছিলো 'ফিলোলোজি'র প্রতিশব্দরূপে, এবং পরে 'ভাষাবিজ্ঞান' শব্দটি রচনা করা হয়, যখন পাশ্চাত্যে 'ফিলোলোজি' অভিধাটি পরিত্যক্ত হয়, এবং আবিষ্কার করা হয় নতুন কালের অভিধা 'লিংগুইস্টিকস'। যদিও প্রচুর ব্যতিক্রম মিলবে, তবু সাধারণত 'তত্ত্ব'-কে 'লোজি'-র সমান্তরাল, এবং 'বিজ্ঞান'-কে 'টিকস'-এর সমান্তরাল ব'লে অসচেতনভাবে মনে করা হয়। বিজ্ঞান বর্তমান বিশ্বের স্পর্শমণি: এর ছোঁয়ায় আবর্জনা সোনা হ'য়ে ওঠে; অশ্রদ্ধেয় প'রে নেয় শ্রদ্ধেয়র মুখোশ। তাই 'বিজ্ঞান' শব্দটির প্রতি সমকালীন মানুষের ও বিজ্ঞানরিক্ত বাঙালির মোহ রয়েছে। 'ভাষাতত্ত্ব' ও 'ভাষাবিজ্ঞান' সম্পূর্ণরূপে সমার্থক, তবু আমি, সাধারণত, বিশ শতকপূর্ব ভাষাবিদ্যার প্রতি নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহার করবো 'ভাষাতত্ত্ব' শব্দটি, এবং বিশ শতকী ভাষাবিদ্যার প্রতি নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহার করবো 'ভাষাবিজ্ঞান'—কেননা এ-শব্দটি থেকে সমকালীন তাপ সদাই বিকিরিত হচ্ছে।

'ভাষাবিজ্ঞান' শব্দটি আত্মবিশ্লেষণাত্মক, আর এর সংজ্ঞাটি—'ভাষার বৈজ্ঞানিক বিদ্যা'—আভিধানিক। 'ভাষাবিজ্ঞান হচ্ছে ভাষার বৈজ্ঞানিক বিদ্যা'—এ-কথা বললে বিষয়টি সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছ ধারণা জন্মে না, এবং বিষয়টির বৈজ্ঞানিকতাও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে না। বিশেষণরূপে 'বৈজ্ঞানিক' শব্দটি কি নির্দেশ করে? শব্দটি নির্দেশ করে যে ভাষাবিজ্ঞানে গবেষণা চালানো হয় সুনিয়ন্ত্রিত এবং তথ্য-যাচাই-সম্ভব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে; এবং গবেষণার সময় ব্যবহার করা হয় ভাষাসংগঠন সম্পর্কিত কোনো তত্ত্ব। পাণিনি থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত রচিত ভাষাবিষয়ক বহু রচনা কোনো-না-কোনো অংশে বৈজ্ঞানিক: তাতে বর্ণনা করা হয়েছে পর্যবেক্ষণসম্ভব উপাত্ত, এবং উপাত্ত বর্ণনার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে নানা প্রণালিপদ্ধতি। কিন্তু উনিশ শতকের ভাষা-বিজ্ঞানীরাই প্রথম তাঁদের শাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিক ব'লে দাবি করেন। তাঁদের দাবি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে গ্রন্থনামে,—হুইটনি-র দুটি বইয়ের নাম: (ক) ''ল্যাংগুয়েজ এ্যাণ্ড দি স্টাডি অফ ল্যাংগুয়েজ: টুয়েলভ লেকচারস অন দি প্রিনসিপলস অফ লিংগুইস্টিক সায়েন্স'' (১৮৬৭), (খ) ''লাইফ এ্যাণ্ড গ্রোথ অফ ল্যাংগুয়েজ: এ্যান আউটলাইন অফ লিংগুইস্টিক সায়েন্স'' (১৮৭৫)। কিন্তু ভাষাবিদ্যাকে সর্বাংশে ভাষাবিজ্ঞান ক'রে তোলার চেষ্টা করেন বিশ শতকী সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা। তাঁরা উপাত্ত সংগ্রহ ও বর্ণনার এমন সব প্রণালিপদ্ধতি উদ্ভাবন করেন যে তার যান্ত্রিকতা, নিয়ন্ত্রণ, বস্তুপ্রিয়তা ও তথ্যনিষ্ঠাকে অবৈজ্ঞানিক বলা কঠিন। ফ্রিজ (১৯৬১), যিনি সাংগঠনিক ভাষা-বিজ্ঞানের একজন প্রধান পুরুষ, মনে করেন যে বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিকতা ও সংকলনধর্মিতা। নৈর্ব্যক্তিক বলতে তিনি বোঝাতে চান যে ভাষাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত

প্রণালিপদ্ধতি এমন সাধারণসূত্র নির্ণয় করবে, যা যাচাই করতে পারবেন যে-কোনো যোগ্যলোক। সংকলনধর্মিতা বলতে তিনি বোঝান যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, প্রাক্তন আবিষ্কারের ভিত্তির ওপরই ঘটে সমস্ত নতুন আবিষ্কার। ফ্রিজ-এর (১৯৬১, ৩৮-৩৯) মতে: 'ভাষাবিজ্ঞান হচ্ছে ভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান ও বোধ, যা গ'ড়ে ওঠে ব্যাপক ও বিচিত্র মানব ভাষার সংগঠন, প্রয়োগ ও ইতিহাসের তথ্য ভিত্তি ক'রে। এতে ব্যবহার করা হয় এমন সব প্রণালিপদ্ধতি, যা ভাষিক ব্যাপারসমূহের সম্পর্ক সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণসম্ভব সাধারণসূত্র নির্ণয়ে সর্বাধিক সফল ব'লে প্রমাণিত।'

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিকতার ওপর অতি-গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁরা ভাষা বিশ্লেষণবর্ণনার জন্যে এমন সব প্রণালিপদ্ধতি প্রক্রিয়াকৌশল আবিষ্কার করেছিলেন, যা সীমাবদ্ধ থেকেছে ভাষার বাহ্যরূপের বিশ্লেষণে ও বর্ণনায়। সর্বসাধারণের কাছে ভাষার শ্রুতির দিকটিই প্রধান: তাঁদের নিকট ভাষা হচ্ছে অবিরাম উচ্চারিত ধ্বনিপুঞ্জ। সাংগঠনিকদের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মুখর ধ্বনিপুঞ্জই জাগিয়েছে প্রথম-প্রধান আবেদন, এবং দ্বিতীয় আবেদন জাগিয়েছে রূপমূলপুঞ্জ—অর্থাৎ সার্থ ক্ষুদ্রতম ধ্বনি-এককরাশি। অর্থ, যা ভাষার প্রাণ, তাকে অবহেলা করতে পারেন নি সাংগঠনিকেরা, তবে অবৈজ্ঞানিক ব'লে অবজ্ঞা করেছেন। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা এমন মনোভাব পোষণ করতেন যেনো শরীর থেকে অবাস্তব আত্মাটিকে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করতে পারলেই অস্থিমাংসমজ্জার জমাট বস্তুপিণ্ড বিজ্ঞানসম্মত হ'য়ে ওঠে। ১৯৪২-এ হকেট মন্তব্য করেছিলেন (দ্র সারল (১৯৭২)): 'ভাষাবিজ্ঞান হচ্ছে শ্রেণীকরণী বিজ্ঞান।' ১৯৫৭-পূর্ব অধিকাংশ মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানীই মনে করতেন যে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের শ্রেণীকরণই তাঁদের শাস্ত্রের ধ্রুবলক্ষ্য। তাই চমস্কি সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানকে দেন নতুন নাম—শ্রেণীকরণী ভাষাবিজ্ঞান।

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের ভাষাবর্ণনার প্রণালি নিম্নরূপ: বিজ্ঞানী সবার আগে মনোযোগ দেবেন তাঁর বর্ণিতব্য উপাত্ত সংগ্রহে। ঘর থেকে তিনি অভিযাত্রীর মতো বেরিয়ে পড়বেন, উপস্থিত হবেন তাঁর উদ্দিষ্ট ভাষা-অঞ্চলে, এবং টেপরেকর্ডারে বা ধ্বনিলিপিতে বন্দী ক'রে নিয়ে আসবেন বিপুল পরিমাণ উক্তি, যাকে তিনি বলেন 'উপাত্ত'। এ-উপাত্ত হচ্ছে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। তারপর তিনি উপাত্তের বস্তুরাশিকে বিন্যস্ত করবেন বিভিন্ন স্তরে: প্রথমে তিনি শনাক্ত ও শ্রেণীকরণ করবেন তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ধ্বনি-এককরাশিকে, অর্থাৎ ধ্বনিমূলসমূহকে। পরবর্তী স্তরে তিনি মনোযোগ দেবেন ধ্বনিমূল সমবায়ে গঠিত ক্ষুদ্রতম সার্থ এককরাশির প্রতি, অর্থাৎ তিনি শনাক্ত ও শ্রেণীকরণ করবেন উপাত্তের অন্তর্গত রূপমূলরাশি; এবং পরবর্তীস্তরে তিনি মনোনিবেশ করবেন রূপমূলের বিচিত্র বিন্যাসে গ'ড়ে ওঠা শব্দ ও শব্দ-শ্রেণীতে। সর্বোচ্চ স্তরে তাঁর গবেষণার বিষয় হচ্ছে শব্দ-শ্রেণীর পরম্পরা: এ-স্তরে তিনি সন্ধান করবেন সম্ভাব্য বাক্য ও বাক্য-শ্রেণী। সাংগঠনিক ভাষিক তত্ত্বের লক্ষ্য ছিলো ভাষাবিজ্ঞানীকে এমন কিছু যান্ত্রিক প্রণালিপদ্ধতি উপহার দেয়া, যার সাহায্যে তিনি উপাত্ত থেকে অনায়াসে আবিষ্কার করতে পারেন ধ্বনিমূল, রূপমূল, সহরূপমূল, শব্দ-শ্রেণী ইত্যাদি। তাঁরা আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন ভাষাবর্ণনার যান্ত্রিক প্রণালিপুঞ্জ, আর তাঁরা সর্বদাই সীমাবদ্ধ থেকেছেন ভাষার বাহ্যস্তরের বর্ণনা, বিবরণ ও শ্রেণীকরণে। কিন্তু বর্ণনা-বিবরণ-তথ্য-উপাত্ত-প্রণালি-পদ্ধতি-কৌশল মেটায় বিজ্ঞানের প্রাথমিক চাহিদা—প্রচুর উপাত্ত সংগ্রহ ও শ্রেণীকরণ বিজ্ঞান নয়, তা বিজ্ঞানের আদিস্তর। তাই সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানকে বলা যায় বিজ্ঞানপ্রবণ: সাংগঠনিকেরা বিজ্ঞানের আদিস্তর আয়ত্ত করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের শাস্ত্রকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে পরিণত করতে পারেন নি।

কোনো তত্ত্ব কখন বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানসম্মত হ'য়ে ওঠে? তথ্য সংগ্রহ ও শ্রেণী-করণ কি বিজ্ঞান? সুনিশ্চিতি ও আপাদশির বস্তুময়তাকেই সাধারণ মানুষ বিজ্ঞান ব'লে মনে করে। এ-ধারণা লৌকিক, এবং ভ্রান্তি-ও বিভ্রান্তি-পূর্ণ (দ্র কুহ্ন (১৯৬২), পপার (১৯৬৩), বুশ (১৯৭৩))। এমন ধারণাও অনেকে পোষণ করেন যে বিপুল শ্রমে সাধনায় পুঞ্জিভূত উপাত্ত থেকে বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন তত্ত্ব, যা চিরসত্য। এ-ধারণাও ভ্রান্ত। তথ্য এমন কোনো যাদুকাঠি নয় যে তাকে গবেষণাগারে নাড়াচাড়া করলেই একটি চমৎকার ধ্রুব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হ'য়ে যাবে। বিজ্ঞান দেবতা বা বিধাতা নয়। গবেষণাগারে পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে যা মূল্যবান, তা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি। পরীক্ষা ও ত্রুটির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়াই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বিজ্ঞানী কখনোই বিশ্বাস করেন না যে তাঁর উদ্ভাবিত সাধারণ সূত্রাবলি সর্বাংশে ত্রুটিহীন—তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকেন কোনো একটি তত্ত্ব বা সূত্রকে পরিত্যাগ ক'রে উৎকৃষ্টতর তত্ত্ব বা সূত্র গ্রহণের জন্যে। কোনো একটি বিশেষ পর্যবেক্ষণ কি-ভাবে মূল্যবান ব'লে গৃহীত হয়, তা বিবেচনা করা যাক। বিজ্ঞান তথ্যস্তূপের চেয়ে অনেক বড়ো,—তাকে মনে করা যেতে পারে সংগ্রাহকের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সংকলিত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সংগ্রহ ব'লে (দ্র পপার (১৯৬৩))। মানস ধারণারাশি যখন মনোগবেষণাগারে নিরীক্ষিত ও কেলাসিত হয়, তখনই তা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বরূপে গৃহীত হ'তে পারে। বিজ্ঞানীর মনে বিরাজ করে একটি তত্ত্ব, এবং তিনি অসংখ্য সম্ভাব্য পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষার মধ্য থেকে সে-টুকুই বেছে নেন, যা ওই মানস তত্ত্বের নিকট মূল্যবান। কিন্তু শুধুমাত্র তত্ত্বানুকূল তথ্যকে স্বীকার করলে বিজ্ঞানীর চলে না, তাঁকে সদাপ্রস্তুত থাকতে হয় এমন পরীক্ষার জন্যে, যা তাঁর তত্ত্বের ত্রুটি ধরিয়ে দেবে। তিনি প্রস্তুত থাকেন তত্ত্ব সংশোধন করতে, এবং উৎকৃষ্টতর তত্ত্বের জন্যে প্রাক্তন প্রিয় তত্ত্ব বিসর্জন দিতে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রণালি ও শিল্পকলার সৃষ্টিপ্রণালি মর্মমূলে অভিন্ন। হঠাৎ আলোর ঝলকানির দরকার উভয় ক্ষেত্রেই, আর উভয় এলাকায়ই দেখা যায় যে স্রষ্টা গ্রহণ করেন সে-বস্তুরাশিকেই, যা চিত্তে নন্দনতাত্ত্বিক আবেদন জাগায় ও ঔৎসুক্যকে প্রাণিত করে।

জ্ঞানার্জন সম্পর্কে দুটি তত্ত্ব রয়েছে: একটিকে বলা যাক 'অভিজ্ঞতাবাদ' (বা উপাত্ত-বাদ), এবং অন্যটিকে 'বোধিবাদ' (বা চৈতন্যবাদ)। অভিজ্ঞতাবাদীদের ধারণা জ্ঞান আমাদের মধ্যে ঢোকে ইন্দ্রিয়ের বিচিত্র রাস্তা দিয়ে। সুতরাং, যাতে জ্ঞানের প্রবেশে বিঘ্ন না ঘটে, আমাদের থাকা উচিত নিষ্ক্রিয় ও গ্রহণশীলরূপে। বোধিবাদীদের মতে অভিজ্ঞতা বা উপাত্ত জ্ঞানের জনক নয়,—জ্ঞান মনোজ। মনোজ জ্ঞান দ্বারা আমরা বিশ্ব দর্শন করি, ব্যাখ্যা করি। উপাত্ত আমাদের নিকট ততোটুকু মূল্যবান, যতোটুকু তা আমাদের সাহায্য করে উপাত্তের আভ্যন্তর সূত্র উদঘাটন করতে। অভিজ্ঞতাবাদীরা মানুষকে অধ্যয়ন করতে চায় তার আচরণরাশির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, আর বোধিবাদীরা মনে করে যে ওই পর্যবেক্ষণ ততোখানিই মূল্যবান, তা যতোখানি তুলে ধরতে পারে মানবাচরণের আভ্যন্তর, সংগুপ্ত ও রহস্যময় সূত্র। যদি তা না পারে, তবে মানবাচরণ পর্যবেক্ষণ মূল্যহীন। চমস্কি ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান সংগোপন, অদৃশ্য ও রহস্যমণ্ডিত আন্তর সূত্রের সন্ধানী। উপাত্তের বর্ণনা বিজ্ঞান নয়, উপাত্তের অন্তরে অবস্থিত সূত্রের উদঘাটনই বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের কোনো যৌক্তিক ও যান্ত্রিক উপায় নেই, অভিজ্ঞতাকে সহানুভূতির সাথে বোধ ক'রে বোধি ও প্রজ্ঞার সাহায্যেই শুধু তা লাভ করা যায়। এ সম্পর্কে আইনস্টাইন্-এর দুটি উক্তি স্মরণ্য (দ্র বুশ (১৯৭৩)): (ক) 'গাণিতিক সূত্র যে-পরিমাণে বাস্তবকে নির্দেশ করে, সে-পরিমাণে তা অনিশ্চিত, আর যে-পরিমাণে তা নিশ্চিত, সে-পরিমাণে তা বাস্তববিচ্ছিন্ন।', (খ) 'শুধু অনুমান ও প্রকল্পনার সাহায্যে বাস্তব বিশ্ব আমাদের

বোধগম্য হয়। তত্ত্ব কখনো অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত হয় না, তা পাওয়ার জন্যে কেবল অভিজ্ঞতানির্ভর হ'লে চলবে না। দেখা গেছে অনেক তত্ত্ব, যা বৈজ্ঞানিক ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, জন্মেছে উপকথা, স্বপ্ন ও মগ্নতা থেকে।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উৎস ও উৎসারণ সম্পর্কে নানা রকম ধারণা বিদ্যমান। এসব ধারণার সারবাণী হচ্ছে যে তত্ত্ব জন্মলাভ করতে পারে কল্পনারঞ্জিত অনুপ্রাণিত মুহূর্তে, অবরোহী পদ্ধতিতে, বা নিছক অনুমান থেকে। কেবল বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে নির্বিশেষ তত্ত্বের উৎসারণ ঘটে না। স্বপ্ন ও সাদৃশ্যীকরণও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের জনক হ'তে পারে, এবং হয়। কল্পনাপ্রতিভাদীপ্ত সাদৃশ্যীকরণ, যাতে বিশেষ এক ক্ষেত্রের ভাবনাকে স্থানান্তরিত করা হয় অন্য ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠা করতে পারে সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এর উদাহরণ ডারউইন-এর প্রবালপ্রাচীর ও প্রবাল দ্বীপ গঠনতত্ত্ব, যা আজো বৈজ্ঞানিক ব'লে গৃহীত। প্রবাল দ্বীপ ও প্রাচীর দেখার অনেক আগে ডারউইন রচনা করেছিলেন এ-তত্ত্ব। স্বপ্নলব্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ধ্রুপদী উদাহরণ ক্যাকুলে-এর (১৮৬৫) বেনজিনচক্রতত্ত্ব। এসব তত্ত্ব বোধিজাত হ'লেও বাস্তব উপাত্তপ্রমাণকে অবহেলা করা হয় নি এতে, বরং ব্যাপক নিরীক্ষার সাহায্যে নানাভাবে সংশোধন করা হয়েছে এদের। তথ্য আমাদের সাহায্য করে, তবে আন্তর সূত্র আবিষ্কার করে আমাদেরই বোধিদীপ্ত চিত্ত।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের চারটি বৈশিষ্ট্য : (ক) তত্ত্বের ব্যবহৃত শব্দ ও প্রতীকসমূহ সুস্পষ্ট, নিরাবেগ ও নৈর্ব্যক্তিক ; (খ) সরল তত্ত্বই সর্বাধিক তৃপ্তিকর (যদিও তা বিমূর্ত গাণিতিক হ'তে পারে) ; (গ) প্রতিটি তত্ত্ব সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করে, এবং বিজ্ঞানী যথাযথ পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে লক্ষ্য করেন তাঁর প্রস্তাবিত তত্ত্ব ক্রমবর্ধমান উপাত্ত ব্যাখ্যা করতে পারে কি-না (অর্থাৎ প্রতিটি তত্ত্বই মর্মে বাতিল হওয়ার বীজ বহন করে) ; এবং (ঘ) বিজ্ঞানী সদাপ্রস্তুত থাকবেন সমালোচনার মুখোমুখি দাঁড়াতে, তাঁর তত্ত্ব সংশোধন করতে, এবং উৎকৃষ্টতর কোনো তত্ত্বের জন্যে আপন তত্ত্ব ত্যাগ করতে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কি 'সত্য'? শুধুমাত্র বিশুদ্ধ যুক্তিবিদ্যায় ও সরল গাণিতিক সূত্রে কোনো একটি বক্তব্য অনন্য ও নিরপেক্ষ সত্য হ'য়ে উঠতে পারে। বিজ্ঞানের সূত্র বা নিয়মরাশি সরল নিরীক্ষিত তত্ত্ব, যে-কোনো সময় তাদের খণ্ডনযোগ্য উপাত্ত পাওয়া যেতে পারে। তাই কোনো তত্ত্বই চিরন্তন নয়।

চমস্কিপূর্ব কয়েক দশক ব্যাপী সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের যুগে (১৯৩৩-১৯৫৭) ভাষাবিজ্ঞানীরা, ও সহযাত্রী সমাজবিজ্ঞানীরা, ভাষাবিজ্ঞানকে অগ্রসর, সুশৃঙ্খল, যথাযথ ও শক্তিমান শাস্ত্র ব'লে মনে করেছেন। ভাষাবিজ্ঞানীরা যে-ভাবে সুস্থির ব্যাকরণিক সূত্র রচনা করেছেন, গবেষণাগারে নিরীক্ষা ক'রে যথাযথ ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে ঈর্ষা বোধ করেছেন সমাজবিজ্ঞানীরা, এবং আপন শাস্ত্রকে অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত ভেবে গর্ব বোধ করেছেন ভাষাবিজ্ঞানীরা। পশ্চিমে বিজ্ঞানচর্চার অষ্টপ্রাহরিক সঙ্গী হচ্ছে যথাযথ পরিমাপ, জটিল যন্ত্রপাতি, পরীক্ষানিরীক্ষা, উপাত্তের পরিসংখ্যান। কিন্তু এসব বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞান হচ্ছে তত্ত্বনির্মাণ ও তত্ত্ববৈধকরণ। তাৎপর্যপূর্ণ উপাত্ত-সংগ্রহ ও শ্রেণীকরণের প্রাকবৈজ্ঞানিক স্তর অতিক্রম করার পর শুরু হয় প্রকৃত বৈজ্ঞানিক স্তর—নির্মাণ করতে হয় তত্ত্ব, এবং পরখ করতে হয় তার ভবিষ্যদ্বাণীর শক্তি। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে হ'তে হয় স্ববিরোধমুক্ত, জ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে সামঞ্জস্য-পূর্ণ, জানা উপাত্ত ব্যাখ্যায় সমর্থ ও সরল-সুন্দর-সৌষ্ঠবমণ্ডিত। স্ববিরোধমুক্ত হওয়া দরকার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োজনে,—স্ববিরোধপূর্ণ বিবৃতি থেকে যে-কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায়। জ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হ'তে হয় যাতে উভয়ের সাধারণ ও

ওভারল্যাপিং উপাত্ত ব্যাখ্যায় বিরোধ না বাধে। প্রতিটি তত্ত্ব উপাত্তকে চূড়ান্ত পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে—বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কাজই হলো সাধারণীকরণের মাধ্যমে বিশেষ ঘটনা-রাশি ও তাদের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা। সৌন্দর্যের প্রয়োজনে চাই সারল্য ও সৌষ্ঠব। যখন কোনো বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের প্রাক্‌বৈজ্ঞানিক বোধিজাত ধারণা থেকে স'রে যায়, তখন বুঝতে হবে যে তত্ত্বটি ত্রুটিপূর্ণ, বা আমাদের ধারণাই ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু যদি ভবিষ্যদ্বাণী ও সাধারণ ধারণা মিলে যায়, তখন তত্ত্বটি শক্তিমান হ'য়ে ওঠে।

উল্লিখিত মানদণ্ড অনুসারে চমস্কিপূর্ব ভাষাবিজ্ঞান কতোখানি বৈজ্ঞানিক ? সাংগঠনিকেরা উপাত্ত শ্রেণীকরণ ও বিন্যাসে মনোযোগী ছিলেন। একটি আধুনিক বর্ণনামূলক ব্যাকরণের সাথে একটি প্রচলিত আনুশাসনিক ব্যাকরণের তুলনা করলে দ্বিতীয়টিকে অনেকেই অবৈজ্ঞানিক ব'লে বাতিল ক'রে দেবেন, কেননা এমন ব্যাকরণে গ্রীক-ল্যাটিন-সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণগত পদরাশিকে চাপিয়ে দেয়া হয় অন্যান্য ভাষার ওপর। কিন্তু বর্ণনামূলক ব্যাকরণরাশিও উৎকৃষ্টতর নয়, এগুলোতে পাওয়া যায় উপাত্তের নব ও ভিন্ন বিন্যাস, এবং পাওয়া যায় নতুননতুন পদের বাকবাকে বিবরণ। এসব ব্যাকরণে, কোনো গভীর কারণ ছাড়াই, এবং ভাষাসংগঠন ও ব্যবহার সম্পর্কে কোনো তত্ত্ব ব্যবহার না ক'রেই, উপাত্তকে ধ্বনিমূল, রূপমূল, শব্দনির্মাণ, বিশেষ্য, ক্রিয়া, নির্দেশক, এবং কখনোকখনো বাক্যতত্ত্ব ইত্যাদি পরিচ্ছেদে সাজানো হয়। কিন্তু এসব ব্যাকরণ ভাষা সম্পর্কে কোনো গভীর বোধ সঞ্চার করে না। আপাতদৃশ্যমানতায় মগ্ন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান তাই বিজ্ঞানের প্রাথমিক স্তরেই সীমাবদ্ধ। বলা যেতে পারে, ভাষাবিজ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞান হ'য়ে ওঠে ১৯৫৭ অব্দে, ''সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচারস''-এর প্রকাশের সাথে। ভাষিক তত্ত্ব গঠনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয় এ-গ্রন্থে, এবং তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয় সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক রীতিতে। এটিতে কেবল উপাত্তকে নতুনভাবে বিন্যাস করার কৌশল পেশ করা হয় নি, বরং দেয়া হয়েছে ভাষা সম্পর্কে আমাদের বোধির এক কঠোর শৃঙ্খলানিষ্ঠ বিবরণ। চমস্কি তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে—কুহ্‌ন (১৯৬২)-কথিত প্রণালিতে। তিনি সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানকে বাতিল ক'রে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন নতুন তত্ত্ব। তত্ত্ব পরখের প্রণালি হচ্ছে তত্ত্বের সামনে প্রশ্ন-সংকুল উপাত্ত তুলে ধরা, চমস্কি তাই করেছেন। গৃহীত-প্রচলিত মডেল বা প্যারাডাইমের সামনে চমস্কি তুলে ধরেন একরাশ বিরক্তিকর উপাত্ত, যা ব্যাখ্যায় ব্যর্থ হয় সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান। তাই তিনি পুরোনো মডেল পরিত্যাগ ক'রে সৃষ্টি করেন নতুন মডেল বা তত্ত্ব, যা মান্য করে বিজ্ঞানের সমস্ত বিধিনিষেধ। আগে ভাষাবিজ্ঞান ছিলো ভাষার উদ্ভিদবিদ্যামাত্র, যার লক্ষ্য শ্রেণীকরণ; চমস্কি-উত্তর ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো ভাষাসৃষ্টির আন্তর সূত্র উদঘাটন। বিষয়ের আয়তন বাড়লো বহুবহু গুণে, এবং বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণপ্রণালিও হ'য়ে উঠলো বৈজ্ঞানিক (দ্র Φ১.২—Φ১.২.৯)।

১.২ স্বায়ত্তশাসিত বাক্যতত্ত্ব : রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ

১.২.০ চমস্কীয় বিপ্লব

ভাষাবিজ্ঞানের সমগ্র ইতিহাসে চমস্কীয় ভাষিক তত্ত্ব সবচেয়ে অভিনব ও বৈপ্লবিক (দ্র লায়নস (১৯৭০), সারল (১৯৭২)); প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাষাশাস্ত্রে এর কোনো তুলনা পাওয়া যায় না। ভাষাবিজ্ঞানের জগতকে তীব্রভাবে আলোড়িত ক'রে আবির্ভূত হয় চমস্কীয় রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ, এবং ভাষাবিজ্ঞানের সীমানাকে সম্প্রসারিত ক'রে দেয় অভাবিতভাবে। এ-জন্যে রূপান্তর ব্যাকরণের আবির্ভাবকে অভিহিত করা হয় 'চমস্কীয় বিপ্লব' নামে। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের রুদ্ধ সংকীর্ণ এলাকাকে

রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ শুধু মুক্ত আলোবাতাসে ভ'রে দেয় নি, সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের ছদ্মবৈজ্ঞানিকতাকে অপসারিত ক'রে ভাষাবিজ্ঞানকে ক'রে তুলেছে বিশুদ্ধভাবে বিজ্ঞানসম্মত। চমস্কীয় বিপ্লব বাকিক বিপ্লব, যা সৃষ্টি করেছে ভাষা সম্পর্কে নতুন গভীর ও ব্যাপক বোধ, এবং এ-বিপ্লবের অমোঘ প্রভাব পড়েছে মানববিদ্যার অন্যান্য শাখার ওপর। সংকীর্ণ উপাত্তবর্ণনার বিমর্ষতা থেকে চমস্কি উদ্ধার করেছেন ভাষাবিজ্ঞানকে, এবং মানুষ সম্পর্কে পুনরায় জন্ম দিয়েছেন ব্যাপক-গভীর বোধ। দৃশ্যমানতার বর্ণনায় তৃপ্ত নন চমস্কি, দৃশ্যের অভ্যন্তরে গুপ্ত সূত্র ও সত্য আবিষ্কার তাঁর লক্ষ্য। আচরণবাদী দৃষ্টিতে মানুষ পরিণত হয়েছিলো কুকুর-গিনিপিগের সমতুল্য উদ্দীপক ও সাড়া-নিয়ন্ত্রিত প্রাণীতে, কিন্তু চমস্কি দেখান যে মানুষ ভিন্ন, কেননা মানুষের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিশীলতা। তবে চমস্কির তত্ত্ব মানুষকে পশু, বা যন্ত্ররূপে বিবেচনার প্রতিবাদে মানবতাবাদীর মর্মবিদারী আর্ত চিৎকার নয়। তিনি তাঁর তত্ত্ব পেশ করেছেন সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক রীতিতে। তাঁর রচনা মূল্যবান এ-জন্যে যে (ক) আচরণবাদী মনস্তত্ত্বের মানুষসম্পর্কিত ধারণার বিরুদ্ধে তাঁর তত্ত্ব এক শাণিত ও শক্তিমান আক্রমণ, এবং (খ) তিনি তাত্ত্বিক আক্রমণ চালিয়েছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। যে-বিজ্ঞানমনস্কতা, বা বৈজ্ঞানিকতা আচরণবাদীদের আরাধ্য, সে-বৈজ্ঞানিক যথাযথতার সাথে তিনি দেখান যে আচরণবাদী তত্ত্ব মানবভাষায় প্রয়োগ করলে যে-ফল পাওয়া যায়, তা শোচনীয়রূপে তুচ্ছ (দ্র চমস্কি (১৯৫৯))। তিনি দেখিয়েছেন যে আচরণবাদীরা অনুকরণ করেছেন বিজ্ঞানের বহিরঙ্গের, তাই তাঁরা যে-সব সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, তার কোনো মূল্যবান অন্তঃসার নেই।

চমস্কি উৎসাহী মানুষ, ও ভাষার আপাতদৃশ্যমানতার অভ্যন্তরে ও অন্তরালে সংগুপ্ত আন্তর সূত্র ও শৃঙ্খলা আবিষ্কারে। 'ভাষাপ্রয়োগ', চমস্কির কাছে, মানুষের 'ভাষাবোধ'-এর বিচূর্ণ প্রকাশমাত্র, তাই ভাষাপ্রয়োগ নয়, মানুষের ভাষাবোধের সূত্র উদঘাটনই লক্ষ্য হওয়া উচিত ভাষাবিজ্ঞানের। দৃশ্যমান বস্তুর মধ্যে গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ। তাঁর তত্ত্ব আকর্ষণীয়, কেননা তিনি পর্যবেক্ষণসম্ভব উপাত্তের সাহায্যে আবিষ্কার করতে চান ওই উপাত্তের আভ্যন্তর সূত্র। তিনি ভাষাবিজ্ঞানের জগতের একটি দ্বন্দ্বকে নিয়ে গেছেন চূড়ান্তে, এবং মানবমন বা চৈতন্য সম্পর্কে উপস্থিত করেছেন এমন সব তথ্য ও তত্ত্ব, যা আচরণবাদী ও পর্যবেক্ষণবাদী ধারণাকে বিপর্যস্ত ক'রে দিয়েছে। তাঁর বিপ্লব ঘটেছে কুহ্ন-কথিত (দ্র কুহ্ন (১৯৬২)) বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের রীতি অবলম্বন করেই। যখন কোনো গৃহীত 'মডেল', বা 'প্যারাডাইম', বা 'তত্ত্ব' নতুন উপাত্তকে ব্যাখ্যা করতে পারে না, তখন দরকার হয় নতুন তত্ত্বের। চমস্কি তাঁর সময়ে প্রচলিত সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের সামনে উপস্থিত করেন এমন উপাত্ত, যা ব্যাখ্যার শক্তি সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের ছিলো না। তাই চমস্কি পুরোনো মডেল, বা তত্ত্ব ত্যাগ ক'রে রচনা করেন নতুন মডেল, বা তত্ত্ব। প্রাক-১৯৫৭ সালে মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে ভাষাবস্তুরাশির শ্রেণীকরণই ভাষাবিজ্ঞানের পরম লক্ষ্য। চমস্কি দেখালেন যে এ-লক্ষ্য থেকে যে-ফল পাওয়া যায়, তা মূল্যবান নয়। পেনসিলভানিয়ায় ছাত্রাবস্থায় সাংগঠনিক প্রণালিপদ্ধতি তিনি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন বাক্যের ওপর, এবং লক্ষ্য করেন যে-সব প্রণালি ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বে মোটামুটিভাবে সাফল্য আয় করে, তা বিফল হয় বাক্যবর্ণনার সময়। প্রত্যেক ভাষায়ই ধ্বনিমূল, ও রূপমূলের সংখ্যা সসীম, কিন্তু বাক্যের পরিমাণ অসীম। সম্ভাব্য নতুন বাক্যের কোনো সীমাপরিসীমা নেই। সাংগঠনিক প্রণালিতে ভাষার অসংখ্য বাক্য বর্ণনা করার কোনো উপায় নেই। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানী ব্যগ্র ভাষার সামান্য খণ্ডাংশের বর্ণনায়। সাংগঠনিকদের কাছে ভাষা 'সৃষ্টিশীল' নয়, কিন্তু চমস্কির কাছে সৃষ্টিশীলতাই ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সাংগঠনিক প্রণালিতে ভাষার সৃষ্টিশীলতা ব্যাখ্যার কোনো উপায় নেই, তাই চমস্কি (দ্র চমস্কি (১৯৫৭)) জন্ম দেন নতুন তত্ত্ব, এবং সৃষ্টি করেন ভাষার সৃষ্টিশীলতা ব্যাখ্যার উপযোগী ব্যাকরণ, যা রূপান্তরমূলক এবং সৃষ্টিশীল। চমস্কির কাছে বাক্যই ভাষার মূলবস্তু, তাই রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের কাজ হচ্ছে ভাষার 'সমস্ত শুদ্ধ, এবং কেবল শুদ্ধ' বাক্য সৃষ্টি করা (দ্র চমস্কি (১৯৫৭, ১৩), ϕ ১·২·৩))। রূপান্তর ব্যাকরণ প্রণালিপদ্ধতি নিয়ে এলো না, এলো একটি ব্যাপক শক্তিমান বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান ছিলো তত্ত্বহীন, ও প্রণালিসর্বস্ব, কিন্তু রূপান্তর ব্যাকরণে তত্ত্বই প্রধান, প্রণালিপদ্ধতি তার সহায়ক সামগ্রী। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান প্রণালি-পদ্ধতির যান্ত্রিক প্রয়োগের সাহায্যে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলো সত্য, কিন্তু রূপান্তর ব্যাকরণ বিশ্বাস করে যে শুধু প্রণালিপদ্ধতি দ্বারা নয়, চিত্তের হঠাৎ আলোর ঝলকানিও আবিষ্কার করতে পারে সত্যকে। শক্তিমান তত্ত্বের সাথে তিনি রূপান্তর ব্যাকরণে যুক্ত করেন এমন সব প্রণালিপদ্ধতি, যার সাহায্যে ভাষার মূল্যবান বৈশিষ্ট্য-রাশিকে গাণিতিক যাথার্থ্যের সাথে প্রকাশ করা সম্ভব। শিশুদের ভাষা-অর্জনপ্রক্রিয়া স্মরণ্য এ-প্রসঙ্গে: শিশুরা তাদের ভাষার শৃঙ্খলা, অর্থাৎ সূত্ররাজি শেখে তাদের সহ-বাসীদের থেকে, এবং সে-সূত্রের সাহায্যে এমন অভিনব বাক্য সৃষ্টি করে, যা তারা কখনো শোনে নি। চমস্কি মনে করেন যে পৃথিবীর সব ভাষার সূত্রই কমবেশি 'সাধারণ', বা সন্নিকট, আর ভাষাসংগঠনের আভ্যন্তর নীতিমালা যেনো জৈবিকভাবে স্থির-কৃত, যা বংশানুক্রমিকভাবে ভাষাভাষীদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। চমস্কি দাবি করেন যে মানবভাষার এ-প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ। এ-কারণে রূপান্তর ব্যাকরণে জ্ঞান লাভ দার্শনিক, মনস্তত্ত্ববিদ, ও শরীরবিজ্ঞানীর জন্যে অপরিহার্য।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে বের হয় তাঁর সাড়াজাগানো, সরল, অপ্রাকরণিক বই ''সিনট্যাক-টিক স্ট্রাকচারস'' (সংক্ষেপে: ''সিস্ট্রা'')। এ-বইতেই প্রকাশিত হয় চমস্কীয় বিপ্লবের মৌল ইশতেহাররাশি। চমস্কির পরবর্তী রচনাসমূহ (দ্র চমস্কি (১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৫৯খ, ১৯৬৪, ১৯৬৫)) তাঁর তত্ত্বকে ও ব্যাকরণের প্রণালিসমূহকে বিস্তৃত করেছে, এবং সুষ্ঠুতা দিয়েছে। ''সিস্ট্রা'' অবশ্য আজ আর ভাষাবর্ণনায় ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু এ-গ্রন্থে ব্যক্ত মৌলতত্ত্বের আবেদন হ্রাস পাবে না। ১৯৫৭-এর পর দ্রুত বিস্তৃত হ'তে থাকে চমস্কীয় বিপ্লববন্যা। আমেরিকার তরুণ সম্প্রদায় হ'য়ে ওঠে রূপান্তরবাদী, এবং ইউরোপ ও অন্যত্রও দেখা দেয় তাঁর অনুসারী। প্রাচীন ভাষাবিজ্ঞানীরা তাঁদের শেখা-শাস্ত্রেই নিবিষ্ট থাকেন, কিন্তু চমস্কি জয় ক'রে নেন বিশ্বে যা সবচেয়ে শক্তিমান, সে-তরুণ সম্প্রদায়কে। আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক থেকে যান সাংগঠনিক, কিন্তু তাঁর ছাত্র হ'য়ে ওঠে রূপান্তরবাদী। চমস্কীয় বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে চমস্কি পান দু'জন তীব্র, ও একজন বিজ্ঞ অনুসারী: রবার্ট লিজ, ও পল পোস্টাল আমেরিকায়, এবং জন লায়নস, যুক্তরাজ্যে। লিজ ও পোস্টালের মতো তীব্র প্রবক্তা, এবং লায়নসের মতো গভীর ভাষ্যকার রূপান্তরবাদী বিপ্লবকে ছড়িয়ে দেন দেশদেশান্তরে। প্রথম পর্যায়ে দেখা দিয়েছিলো রূপান্তরবাদবৈরিতা, এমন কি দু'দশক পরে আজো তা দেখা যায়: বৃদ্ধ বিজ্ঞানীদের অনেকে আজো রুষ্ট রূপান্তরবাদীদের ওপর। তাঁদের কাছে চমস্কি ও তাঁর অনুসারীরা ভাষাবিজ্ঞানের সুস্থ সুশীল সৌষ্ঠবমণ্ডিত জগতে আচমকা ঢুকে-পড়া বর্বরদল। দু'দশক পরে অবশ্য পরিবর্তন ঘটেছে রূপান্তরবাদী বিশ্বেও: দেখা দিয়েছে বিপ্লবের ভেতরে বিপ্লব—অন্তর্বিপ্লব। চমস্কির প্রথম পর্যায়ের অনেক অনুসারী (যেমন: পোস্টাল) যোগ দিয়েছেন চমস্কিবিরোধী শিবিরে। চমস্কির প্রতিভাবান অনুসারীরা তাঁরই তত্ত্বকে চূড়ান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত ক'রে সৃষ্টি করেছেন এমন এক রূপান্তর ব্যাকরণ, যার নাম তাঁরা দিয়েছেন 'জেনারেটিভ সিম্যানটিকস', বা 'সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব' (দ্র ল্যাকফ ১৯৭০ক,

১৯৭১খ), পোস্টাল (১৯৭০গ), ম্যাককলি (১৯৭০ক), *দ্র* ১'৭))। শিবিরের অন্তর্দ্রোহে কিছুটা আনন্দ পাচ্ছেন সাংগঠনিকেরা। চমস্কি, ও তাঁর অনুসারীদের বর্তমানে বলা হয় 'লেকসিক্যালিস্ট', বা 'শব্দবাদী', এবং তাঁর বিরোধীদের বলা হয় 'ট্র্যানসফরমেশনালিস্ট', বা 'রূপান্তরবাদী'। এঁদের দ্বন্দ্বে যে-গোত্রেরই জয় হোক-না-কেনো, তাতে সাংগঠনিকদের লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই, তাঁদের ক্ষতিই শুধু বাড়বে। তাঁদের পুনরুত্থানের কোনো সম্ভাবনা নেই। যে-বিপ্লবের স্রষ্টা চমস্কি, তিনি তাকে চূড়ান্তে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন না, তিনি থেমে যেতে চান মধ্যপথে। তাঁর পথ অনুসরণ ক'রে এগোচ্ছিলেন যে-তরুণেরা, তাঁরা বিপ্লবকে নিয়ে যেতে চান চূড়ান্তে। কলহ এখানেই : আদি বিপ্লবীই সর্বাধিক বিপ্লবী নন।

১'২'১ ভাষিক তত্ত্বের লক্ষ্য

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য ছিলো ভাষাবস্তু শনাক্তকরণ ও শ্রেণীকরণ, অর্থাৎ উপাত্তবর্ণনাই ছিলো তাঁদের লক্ষ্য। তত্ত্ব নয়, তাঁদের সহায়ক ছিলো কিছু প্রণালি-পদ্ধতি, যার সাহায্যে তাঁরা যান্ত্রিকভাবে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন পর্যবেক্ষণসম্ভব উপাত্তের ব্যাকরণ। তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো সীমাবদ্ধ উপাত্তে। চমস্কি ভাষাবিজ্ঞানকে মুক্তি দেন উপাত্ত ও প্রণালির পাংশু সংকীর্ণতা থেকে। "সিন্ট্যা"-এ অবশ্য সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের অনেক বোধ তিনি মেনে নিয়েছেন, কিন্তু যে-সব বোধ তিনি মানেন নি, তা তাঁকে সুদূরে নিয়ে গেছে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান থেকে। পরবর্তী রচনাপুঞ্জে তিনি বহুদূর চ'লে যান সাংগঠনিকদের থেকে, যদিও তাঁর অন্তরচনায়ও অস্পষ্টভাবে সাংগঠনিকদের ছোঁয়া বোধ করা যায় (আদি ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে এড়ানো অসম্ভব ব'লেই সম্ভবত)। "সিন্ট্যা" সম্পূর্ণরূপে দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নমুক্ত। বর্তমানে চমস্কি ও চৈতন্যবাদ যেমন অচ্ছেদ্য, "সিন্ট্যা"-এ তা নয় ; তাঁর প্রথম গ্রন্থে যে-চমস্কিকে পাওয়া যায়, তিনি সাংগঠনিক রূপান্তরবাদী।

চমস্কির কাছে ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য 'সৃষ্টিশীলতা'। তাই তিনি মনে করেন যে-কোনো ভাষিক তত্ত্বের লক্ষ্য হওয়া উচিত ভাষার সৃষ্টিশীলতাকে প্রকাশ করা। কোনো ভাষীই ভাষার সমস্ত বাক্য মুখস্থ ক'রে রাখেন না, কেননা তা অসম্ভব। প্রত্যেক ভাষায়ই বাক্য অসংখ্য। কিন্তু ভাষাভাষীরা ধারণ করে সে-শক্তি, যার সাহায্যে তারা অশ্রুত ও অভিনব বাক্য সৃষ্টি করতে পারে, ও বুঝতে পারে। তাই ভাষাভাষীর সৃষ্টিশীলতাকে সুস্পষ্ট ক'রে তোলাই হওয়া উচিত ভাষিক তত্ত্বের লক্ষ্য। ভাষার সৃষ্টিশীলতার প্রতি চোখ ছিলো প্রচলিত ব্যাকরণবিদদের, কিন্তু সাংগঠনিকেরা অবহেলা করেছেন ভাষার সৃষ্টিশীলতাকে। চমস্কি "সিন্ট্যা"-এ ইতিহাস অনুসন্ধান করেন নি, কিন্তু পরবর্তী রচনায় পোর রয়াইআল পণ্ডিতদের ব্যাকরণে, এবং হুমবোল্‌ড্‌ট্ ও সোস্যুর-এর রচনায় লক্ষ্য করেছেন ভাষার সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ (দ্র চমস্কি (১৯৬৪, ৭-২৭ ; ১৯৬৫, ৫-৭))। চমস্কির কাছে কোনো ভাষা—"ভ"—এর ব্যাকরণ হচ্ছে ওই ভাষা—"ভ"—এর তত্ত্ব। যে-কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গ'ড়ে ওঠে কিছুসংখ্যক পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি ক'রে। ওই তত্ত্ব দৃশ্যমান উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ক'রে রচনা করে এমন 'সাধারণসূত্র', যা অদৃশ্য উপাত্ত সম্পর্কে করতে পারে 'ভবিষ্যদ্বাণী'। তেমনি, যে-কোনো ভাষার ব্যাকরণও গ'ড়ে ওঠে কিছু পরিমাণ দৃশ্যমান উপাত্তের ওপর ভিত্তি ক'রে, এবং রচনা করে এমন সাধারণসূত্র, যা শুধু দৃশ্যমান উপাত্তকেই নয়, অদৃশ্য উপাত্তকেও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। ব্যাকরণের সূত্ররাশি উপাত্তের অন্তর্গত বাক্যের সাংগঠনিক সম্পর্ক নির্দেশ করে, এবং সে-সাথে নির্দেশ করে উপাত্ত-বহির্ভূত অসংখ্য বাক্যসংগঠনের মধ্যে সম্পর্ক। তাই, চমস্কির মতে, ভাষিক তত্ত্বের লক্ষ্য হওয়া উচিত ভাষার জন্যে সঠিক তত্ত্ব, বা ব্যাকরণ প্রণয়ন।

প্রতিটি ব্যাকরণকে পূরণ করতে হয় কতিপয় 'উপযুক্ততার শর্ত', বা 'যোগ্যতার শর্ত' (দ্র চমস্কি (১৯৫৭. ৪৯-৬০ : ১৯৬৪. ২৮-৩০))। একটি শর্তের নাম দিয়েছেন চমস্কি 'উপযুক্ততার বহিঃশর্ত'। ব্যাকরণের 'উপযুক্ততার বহিঃশর্ত' বলতে তিনি বোঝান যে ব্যাকরণের সৃষ্ট সমস্ত বাক্য ওই ভাষাভাষীদের বিবেচনায় শুদ্ধ ব'লে গৃহীত হবে। অর্থাৎ ব্যাকরণ এমন কোনো বাক্য সৃষ্টি করতে পারবে না, যা ওই ভাষাভাষীদের বিবেচনায় গ্রহণঅযোগ্য, বা অশুদ্ধ। এমন বেশ কিছু 'বহিঃশর্ত' মেটাতে হবে ব্যাকরণকে। এ-ছাড়া আরো একটি শর্ত মেটাতে হবে ব্যাকরণকে—চমস্কি (দ্র চমস্কি (১৯৫৭. ৪৯-৫১)) এ-শর্তটির নাম দিয়েছেন 'সাধারণত্ব শর্ত'। এটি কঠিনতর শর্ত। এ-শর্তানুসারে কোনো বিশেষ ভাষার ব্যাকরণে ব্যবহৃত ক্যাটেগরিসমূহ (যেমন : ধ্বনিমূল, রূপমূল, পদ, বাক্য প্রভৃতি) গৃহীত হবে এমন এক নির্বিশেষ ভাষিক তত্ত্ব থেকে, যে-তত্ত্ব সমস্ত ভাষায় প্রয়োগ করা সম্ভব। কোনো বিশেষ ভাষার ক্যাটেগরিরাশি শুধু ওই ভাষানির্ভর হ'তে পারবে না, তা গৃহীত হ'তে হবে সর্বজনীন ভাষিক তত্ত্ব থেকে। উল্লিখিত শর্ত দুটি অত্যন্ত মূল্যবান, কেননা এ-শর্তের সাহায্যে অসংখ্য প্রতিযোগী ব্যাকরণের মধ্যে উপযুক্ত ব্যাকরণসমূহকে বের ক'রে নেয়া সম্ভব।

'সাধারণত্ব শর্ত' প্রসঙ্গে, ওপরে, নির্বিশেষ ভাষিক তত্ত্ব, এবং ওই তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত বিশেষ ভাষার ব্যাকরণের কথা বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে : নির্বিশেষ ভাষিক তত্ত্ব ও বিশেষ ব্যাকরণের মধ্যে সম্পর্ক কি? অন্যভাবে বলা যায়, কি অর্থে একটি বিশেষ ব্যাকরণ একটি নির্বিশেষ ভাষিক তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত? কোনো নির্বিশেষ তত্ত্ব থেকে কোনো বিশেষ ব্যাকরণের উদ্ভবের রীতিকে চমস্কি ভাগ করেছেন তিনটি 'প্রণালি'তে। প্রণালি তিনটি হচ্ছে : (ক) 'আবিষ্কার প্রণালি', (খ) 'সিদ্ধান্ত প্রণালি', এবং (গ) 'মূল্যায়ন প্রণালি'। কোনো ভাষিক তত্ত্বের কাছে আমাদের উল্লিখিত ত্রিবিধ প্রত্যাশা থাকতে পারে :

[ক] **আবিষ্কার প্রণালি** : কোনো ভাষিক তত্ত্বের কাছে আমরা আশা করতে পারি যে উপাত্ত সরবরাহের সাথেসাথে ওই তত্ত্ব যান্ত্রিকভাবে উপাত্তের ব্যাকরণ রচনাকৌশল ব'লে দেবে। এ-তত্ত্বটি এতো শক্তিমান হবে যে তা যান্ত্রিকভাবে কোনো বিশেষ উপাত্তের ব্যাকরণ রচনাকৌশল নির্দেশ করবে। অর্থাৎ এ-তত্ত্ব সরবরাহ করে ব্যাকরণ 'আবিষ্কার প্রণালি'।

[খ] **সিদ্ধান্ত প্রণালি** : কোনো ভাষিক তত্ত্বের কাছে আমরা আশা করতে পারি যে ওই তত্ত্বটি আমাদের এমন প্রণালি উপহার দেবে, যার সাহায্যে বিশেষ উপাত্ত ভিত্তি ক'রে রচিত বহু প্রতিযোগী ব্যাকরণের মধ্যে কোনটি সর্বোৎকৃষ্ট, তা যান্ত্রিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে। কি-ভাবে ব্যাকরণ রচিত হয়েছে, সে-সম্পর্কে এ-তত্ত্ব কিছু বলবে না ; কিন্তু তা সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণটি নির্দেশ করবে। অর্থাৎ এ-তত্ত্ব আমাদের দেয় 'সিদ্ধান্ত প্রণালি'।

[গ] **মূল্যায়ন প্রণালি** : কোনো ভাষিক তত্ত্বের কাছে আমরা আশা করতে পারি যে ওই তত্ত্ব আমাদের এমন প্রণালি দেবে, যার সাহায্যে প্রতিযোগী ব্যাকরণরাশির মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট, কোনটি অনুৎকৃষ্ট, তা নির্ণয় করা যাবে। মনে করা যাক, কোনো উপাত্ত ভিত্তি ক'রে রচিত হয়েছে দুটি ব্যাকরণ : 'ব্যাকরণ-১', এবং 'ব্যাকরণ-২'। তত্ত্বের কাজ হবে এ-ব্যাকরণ দুটির মধ্যে কোনটি উন্নততর, তা নির্দেশ করা। অর্থাৎ এখানে তত্ত্ব উপহার দিচ্ছে 'মূল্যায়ন প্রণালি'।

কোনো তত্ত্বের কাছে 'আবিষ্কার প্রণালি' কামনা করা হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ আশা, ও দুরাশা। এর চেয়ে পরিমিত, ও বাস্তব প্রত্যাশা হচ্ছে 'সিদ্ধান্ত প্রণালি' কামনা, এবং সবচেয়ে পরিমিত, ও বাস্তব প্রত্যাশা হচ্ছে 'মূল্যায়ন প্রণালি' কামনা। চমস্কির মতে, কোনো ভাষিক তত্ত্বের কাছে মূল্যায়ন প্রণালির চেয়ে শক্তিমান কোনো প্রণালি কামনা করতে পারি না। তাই উল্লিখিত প্রণালি তিনটির মধ্যে চমস্কি গ্রহণ করেছেন দুর্বলতম মূল্যায়ন প্রণালি, এবং পরিত্যাগ করেছেন আবিষ্কার ও সিদ্ধান্ত প্রণালি। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য ছিলো আবিষ্কার প্রণালি প্রণয়ন, কিন্তু এ দুরভিলাষ পূর্ণ হওয়ার নয়। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও দেখা যায় যে উপাত্ত ব্যাখ্যার কোনো যান্ত্রিক প্রণালি নেই, আর এমন কোনো প্রণালিও নেই, যার সাহায্যে বিভিন্ন প্রতিযোগী ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটি সর্বোৎকৃষ্ট, তা ব'লে দেয়া সম্ভব। চমস্কিপূর্ব মার্কিন ভাষাবিজ্ঞান ছিলো প্রণালিসর্বস্ব। তাঁদের ধারণা ছিলো যে বিভিন্ন প্রণালিপদ্ধতি যে-কোনো ভাষা-উপাত্তের ওপর প্রয়োগ করলে ওই উপাত্তের একখানি চমৎকার ব্যাকরণ যান্ত্রিকভাবে রচিত হ'য়ে যাবে। এমন মনোভাবকে চমস্কি বিভ্রান্তিকর ও অপকারী ব'লে মনে করেন। তত্ত্ব ও প্রণালির সমীকরণ করা অনুচিত। প্রণালিপদ্ধতি যান্ত্রিক প্রয়োগে ব্যাকরণ রচিত হয় না : ভাষাবিজ্ঞানী ভাষাবিশ্লেষণের সময় কাজে লাগাতে পারেন ভাষা সম্পর্কে তাঁর পূর্বধারণা, অভিজ্ঞতা, অনুমান, এবং কখনো এ-প্রণালি, কখনো সে-প্রণালি। এমন কি হঠাৎ অনুপ্রাণিত মুহূর্তের বোধিও তাঁকে সাহায্য করতে পারে। মূল্যবান যা, তা হচ্ছে ফলাফল : কি-প্রণালিতে ব্যাকরণটি রচিত হয়েছে, তা মূল্যবান নয়, রচিত ব্যাকরণটি কেমন হয়েছে, তাই মূল্যবান। প্রণালিপদ্ধতির যে দরকার নেই, তা নয় ; তবে প্রণালিপদ্ধতিই প্রধান হ'য়ে উঠবে না। যান্ত্রিকভাবে প্রণালি প্রয়োগে উপাত্তের ব্যাকরণ আবিষ্কৃত হ'তে পারে না, বা কোনো তত্ত্ব এমন শক্তিমানও হ'তে পারে না, যার সাহায্যে তা বিভিন্ন প্রতিযোগী ব্যাকরণের মধ্যে উৎকৃষ্টতম ব্যাকরণটিকে যান্ত্রিকভাবে নির্দেশ করতে পারে। কোনো একটি ভাষিক তত্ত্ব যা করতে পারে, তা হচ্ছে মূল্যায়ন প্রণালি রচনা অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিযোগী ব্যাকরণের মধ্যে তুলনা ক'রে কোন ব্যাকরণটি ভালো, কোনটি ভালো নয়, একটি ভাষিক তত্ত্ব তা নির্দেশ করতে পারে। অন্যান্য বিজ্ঞানেও অনুরূপ ব্যাপার লক্ষণীয়। সেখানেও এমন কোনো উপায় নেই, যার সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে উপাত্তের উৎকৃষ্টতম তত্ত্ব, এবং বিভিন্ন প্রতিযোগী তত্ত্বের মধ্যে কোনটি সর্বোৎকৃষ্ট, তা নির্ণয়েরও কোনো প্রণালি নেই। যেমন : আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বকে তাঁর বর্ণিত উপাত্তের শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যা ব'লে কেউ মনে করে না, শুধু মনে করা হয় যে আপেক্ষিক তত্ত্ব নিউটনীয় তত্ত্বের চেয়ে উৎকৃষ্ট। অর্থাৎ অন্যান্য বিজ্ঞানেও কোনো একটি তত্ত্বের কাছে মূল্যায়ন প্রণালির চেয়ে শক্তিমান কিছু কামনা করা হয় না। ভাষাবিজ্ঞানেরও অন্যান্য বিজ্ঞানের চেয়ে অধিক উচ্চাভিলাষী হওয়ার কোনো বিজ্ঞানসম্মত কারণ থাকতে পারে না।

ব্লুমফিল্ডীয় ভাষাবিজ্ঞানের উচ্চাভিলাষ ত্যাগ ক'রে সীমিত অভিলাষী মূল্যায়ন প্রণালি গ্রহণ করায় কেউকেউ মনে করতে পারেন যে চমস্কি ভাষাবিজ্ঞানের মহৎ লক্ষ্যকে সীমাবদ্ধ করেছেন। একদিকে তিনি ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্যকে সীমিত করলেও মূল দিকে ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্যকে অভাবিতরূপে প্রসারিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে সাংগঠনিকেরা আবিষ্কার প্রণালি কামনা করলেও মূল্যায়ন প্রণালির চেয়ে মূল্যবান কিছু আয়ত্ত করতে পারেন নি। চমস্কি ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্যকে প্রসারিত করেছেন এ-ভাবে : আগে সীমাবদ্ধ ভাষা-উপাত্তের বর্ণনা দেয়াই ছিলো ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য, কিন্তু চমস্কীয় ভাষিক তত্ত্বের লক্ষ্য হলো ভাষার সংখ্যাহীন বাক্য সৃষ্টি করা, ও তার সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়া। ভাষার সৃষ্টিশীলতা, ও ভাষাভাষীদের সৃষ্টিশীলতার আন্তর সূত্র উদঘাটন করাই হলো রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের লক্ষ্য। সাংগঠনিক

ভাষাবিজ্ঞান স্বপ্নেও এমন লক্ষ্যের কথা ভাবে নি। আবিষ্কার প্রণালি ও সিদ্ধান্ত প্রণালি পরিত্যাগ ক'রে চমস্কি সাংগঠনিক দুরাশাকে দূর করেছেন, এবং ভাষার সৃষ্টিশীলতার সূত্র উদঘাটন করতে চেয়ে ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্যকে মহান ক'রে তুলেছেন।

১'২'২ ভাষার সৃষ্টিশীলতা ও বাক্যের অনন্ততা

ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিশীলতা। বিপুল পরিমাণ উপাত্তের মধ্যেও দেখা যাবে যে পুনরাবৃত্ত বাক্যের সংখ্যা খুবই কম। ভাষাভাষীদের দৈনন্দিন ভাষাব্যবহার লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তারা নিত্য নতুন, অভিনব, ও অশ্রুতপূর্ব বাক্য ব্যবহার করে। যে-সমস্ত বাক্য দৈনন্দিন জীবনে পুনরাবৃত্ত হয়, তার এক বড়ো অংশ হচ্ছে 'সামাজিকতার বাক্য', : 'কেমন আছেন ?', 'ভালো আছি', 'আবার দেখা হবে', 'শরীরটা ভালো নেই', 'শুভেচ্ছা রইলো' জাতীয় সীমিত সংখ্যক বাক্য বাদ দিলে দেখা যায় যে ভাষাভাষীরা নিত্যনিয়ত নতুন বাক্য সৃষ্টি করে। মানুষ যেমন নতুন ও অভিনব বাক্য সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি পারে অন্যের সৃষ্ট নতুন ও অভিনব বাক্য বুঝতে। অর্থাৎ ভাষা ও ভাষাভাষীরা সৃষ্টিশীল। এমন নয় যে আমরা সমস্ত বাক্য রচনা ক'রে, বা শিখে ওই বাক্যরাশিকে মজুত ক'রে রেখে দিই মস্তিষ্কে, এবং ব্যবহার করি সুযোগ-সুবিধা ও সময়-মতো। ভাষার সীমিত সংখ্যক ধ্বনির সাহায্যে মানুষ রচনা করতে পারে বিপুল পরিমাণ শব্দ, এবং সীমিত সংখ্যক শব্দ ও সূত্রের সাহায্যে সৃষ্টি করতে পারে 'অসংখ্য' বাক্য। উল্লিখিত পর্যবেক্ষণ থেকে পৌঁছোনো সম্ভব নিম্নের সিদ্ধান্তে :

[ক] মনে করা যাক যে পৃথিবী আরো বহু দিন টিকে থাকবে, তাহলে কোনো ভাষা—''ভ''—এর বাক্যরাশির প্রধান অংশ গঠন করবে সে-সমস্ত বাক্য, যা আজো উচ্চারিত হয় নি, সম্ভবত কোনোদিন উচ্চারিত হবে না। আর ওই ভাষার বাক্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশটি গঠন করে সে-সমস্ত বাক্য, যা উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু লিপিবদ্ধ হয় নি। তাই কোনো ভাষার কোনো বিশেষ উপাত্ত ওই ভাষার এক ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ মাত্র। যদি মনে করি যে একজন ব্যাকরণবিদ বাঙলা ভাষা বর্ণনার সময় গ্রহণ করেছেন পৃথিবীর সমস্ত পাঠাগারে সংরক্ষিত সমস্ত পুস্তকের সমস্ত বাক্য, তাহলে তাঁর উপাত্তকে পরিমাণে বিপুল ব'লে মেনে নিতেই হয়। কিন্তু ওই বিপুল উপাত্তও সমগ্র বাঙলা বাক্যের (উচ্চারিত এবং লিপিবদ্ধ বাক্য, উচ্চারিত এবং অলিপিবদ্ধ বাক্য, এবং ভবিষ্যতে যে-সমস্ত বাক্য উচ্চারিত হ'তে পারে, এবং যে-সমস্ত বাক্য কোনোদিনই উচ্চারিত হবে না) তুলনায় অতিশয় তুচ্ছ।

[খ] ''ক' বাঙলা বলে' বাক্যটির প্রধান অর্থ হচ্ছে যে 'ক' যে-কোনো সময় নতুন ও অভিনব বাক্য সৃষ্টি করতে পারে, এবং অন্যের সৃষ্ট বাঙলা বাক্য বুঝতে পারে। এর মানে হচ্ছে 'ক' বাঙলা ভাষাকে 'সৃষ্টিশীলতা'র সাথে ব্যবহার করে। প্রত্যেক ভাষাভাষী ভাষাকে সৃষ্টিশীলরূপে ব্যবহার করতে পারে : প্রত্যেক ভাষাভাষী বহন করে বাক্য সৃষ্টির ও বোঝার অসচেতন শক্তি।

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার সৃষ্টিশীলতা মূল্য পায় নি, কিন্তু রূপান্তরমূলক ব্যাকরণের লক্ষ্যই হচ্ছে ভাষা, ও ভাষাভাষীর সৃষ্টিশীলতা সুস্পষ্টভাবে উদঘাটন করা।

যে-কোনো ভাষার সম্ভাব্য বাক্য সংখ্যায় অনন্ত। ওপরে বলা হয়েছে : যে-কোনো ভাষার বাক্যের প্রধান অংশ আজো উচ্চারিত হয় নি, এবং, সম্ভবত, কোনোদিন

উচ্চারিত হবে না। তাই কোনো ভাষা সীমিত সংখ্যক বাক্যের সমষ্টি, না অসংখ্য বাক্যের সমষ্টি, তা বাস্তব, উপাত্তনির্ভর প্রমাণের সাহায্যে স্থির করা অসম্ভব। কিন্তু সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানীরা যখন দাবি করেন যে-কোনো ভাষায় বাক্য সংখ্যায় অনন্ত, তখন তাঁরা তাঁদের দাবির সপক্ষে কি যুক্তি দেন? বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্যে একটি উদাহরণের সাহায্য নেয়া যাক :

(১) যে-মেয়েটি এসেছে, সে যে-ছেলেটিকে ভালোবাসে, তার ছোটো বোন যে বেড়ালটি পোষে, সেটি যার থেকে উপহার পেয়েছে, সে যে-ছেলেটিকে পছন্দ করতো,...

(১)-বাক্যটি বিচার করতে যেয়ে প্রথমেই বোঝা উচিত যে বাক্যের দৈর্ঘ ও সাংগঠনিক বৈচিত্র্য এককথা নয়। (১)-বাক্যটিতে আছে একটি প্রধান বাক্য, এবং এক-রাশ সম্বন্ধাত্মক খণ্ডবাক্য। একই সূত্রের পৌনপুনিক প্রয়োগে গ'ড়ে উঠেছে (১)-বাক্যটি। অর্থাৎ (১)-বাক্যটি সৃষ্টির জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাকরণের 'পৌন-পুনিক শক্তি'। তত্ত্বগতভাবে (১)-বাক্যে অসংখ্য সম্বন্ধাত্মক বাক্য গ্রথিত করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের সময় এক জায়গায় সম্বন্ধাত্মক বাক্য গ্রন্থনে সীমা আমাদের টানতেই হয়। না টানলে বাক্য গ্রহণযোগ্যতা হারাতে পারে : যেমন (১)-বাক্যটি সামান্য কয়েকটি সম্বন্ধাত্মক বাক্যের চাপেই গ্রহণযোগ্যতা হারাতে বসেছে। কিন্তু এ-সীমা ব্যাকরণের সূত্রগত নয়, অর্থাৎ ব্যাকরণগত কারণে এখানে সীমা টানা হচ্ছে না, সীমা টানা হচ্ছে স্মৃতিভ্রংশতা, সময়সীমা প্রভৃতি অভাষিক কারণে। যে-কোনো ভাষার ব্যাকরণ হচ্ছে ওই ভাষার, অর্থাৎ ওই ভাষার বাক্যসমূহের, তত্ত্ব। বাঙলা ব্যাকরণ বাঙলা ভাষার তত্ত্ব, তাই বাঙলা ব্যাকরণে (১)-বাক্যের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অবশ্যই নির্দেশ করতে হবে। এ-বাক্যটির সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যার জন্যে বাঙলা ব্যাকরণে গ্রহণ করতে হবে 'পৌনপুনিকতা নীতি/তত্ত্ব'। যেহেতু (১)-এ অসংখ্য সম্বন্ধাত্মক বাক্য গেঁথে দেয়া সম্ভব, তাই ব্যাকরণ ধারণ করে সীমাহীন 'পৌনপুনিকতা শক্তি'। এ-শক্তির সাহায্যে ব্যাকরণ নির্দেশ করে যে (১), এবং বাঙলা ভাষার অন্যান্য বাক্য, মর্মমূলে অসীম : ইচ্ছে করলেই যে-কোনো বাক্যকে দীর্ঘতর করা যায়। যেহেতু ভাষার প্রতিটি বাক্যই অসীম, তাই ব্যাকরণ নির্দেশ করে যে যে-কোনো ভাষায় বাক্য সংখ্যায় অনন্ত।

১'২'৩ 'রূপান্তরমূলক' এবং 'সৃষ্টিশীল'

'সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ' বিশেষ একরকম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যাকরণ, আর 'রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ' হচ্ছে বিশেষ একরকম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ। ব্যাকরণ মাত্রই যে সৃষ্টিশীল হবে, তা নয় ; আবার সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ মাত্রই যে রূপান্তরমূলক হবে, তাও নয় ; এবং রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ মাত্রই যে সৃষ্টিশীল হবে, তাও নয়। যে-ব্যাকরণ যুগপৎ 'রূপান্তরমূলক' এবং 'সৃষ্টিশীল', তাই রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ। রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ চমস্কিপ্রস্তাবিত ব্যাকরণিক 'রূপান্তর'-এ বিশ্বাসী (দ্র চমস্কি (১৯৫৭, ১৯৫৮), Φ১'৫'১'২)। 'সৃষ্টিশীল'—'জেনারেটিভ'—শব্দটি চমস্কি গ্রহণ করেছেন গণিত থেকে। ভাষাবিজ্ঞানে এ-শব্দটি নির্দেশ করে 'সুস্পষ্টতা', ও 'ভবিষ্যদ্বাণীসক্ষমতা'। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ হচ্ছে সুস্পষ্ট সূত্রসমষ্টি, এবং এ-সূত্রসমূহ বৈজ্ঞানিক-অর্থে 'ভবিষ্যদ্বাণী' করতে পারে —অর্থাৎ এ-ব্যাকরণ উপাত্তকে অতিক্রম ক'রে যায়। চমস্কির মতে (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৮)) 'সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ' হচ্ছে 'সূত্রপ্রণালি, যা সুস্পষ্ট ও সুষ্ঠুরূপে সৃষ্ট-বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়।' বাক্যসৃষ্টি প্রসঙ্গে চমস্কি সাধারণত ব্যবহার করেন 'সৃষ্টি' ('জেনারেট') শব্দটি, এবং খুব কম পরিমাণে ব্যবহার করেছেন 'উৎপাদন'—'প্রোডিউস'—শব্দটি।

সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ বাক্য সৃষ্টি করে, উৎপাদন করে না। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ প্রতিটি বাক্যের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে, পাঠকের বোধির ওপর কিছুই ছেড়ে দেয় না। এ-ব্যাকরণের সুস্পষ্টতা সম্পর্কে চমস্কি ও হাল-এর (দ্র চমস্কি ও হাল (১৯৬৮, ৬০)) বক্তব্য : 'এ-ব্যাকরণের সূত্ররাশি যান্ত্রিকভাবে প্রযুক্ত হয়। এ-সূত্ররাশিকে গ্রহণ করা যেতে পারে আপন বিবেচনা ও প্রকল্পনাশূন্য নির্বোধ রোবোটের উদ্দেশ্যে দেয়া নির্দেশসমষ্টিরূপেও। সূত্রে থাকবে না কোনো অস্পষ্টতা, ও দ্ব্যর্থতা : কেননা এ-ব্যাকরণে নির্দেশপ্রাপককে বিবেচনা করা হয় আপন বিচারবিবেচনা ব্যবহারে অক্ষম ব'লে, বা অশুদ্ধকে শুদ্ধ করতে অক্ষম ব'লে।' চমস্কি-হালের এমন মন্তব্য অনেককে বিভ্রান্ত করেছে, এবং তাঁরা সৃষ্টিশীল ব্যাকরণকে বাস্তব অর্থে যন্ত্র, যেমন : কম্পিউটার, ভাবতে চান। কিন্তু সৃষ্টিশীল ব্যাকরণকে বাস্তব অর্থে যন্ত্র ভাবা ঠিক নয়, একে কল্পনা করা যেতে পারে বিমূর্ত যন্ত্ররূপে। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা ভাষাভাষীর বোধির ওপর নির্ভরশীল নয়, এ-কথাই বোঝাতে চান চমস্কি ও হাল ওপরের উদ্ধৃতিতে।

নিচে সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের কতিপয় মৌল ধারণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হচ্ছে।

'সমস্ত, এবং কেবল শুদ্ধ' : সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ ভাষার সমস্ত শুদ্ধ, এবং কেবল শুদ্ধ বাক্য সৃষ্টি করে। মনে করা যাক, বাঙলা ভাষার একটি সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ বিপুল পরিমাণ বাঙলা বাক্য সৃষ্টি করেছে। ওই বাক্যরাশির প্রচুর বাক্য বাঙলাভাষী কর্তৃক শুদ্ধ ব'লে গৃহীত। কিন্তু এমনও দেখা যেতে পারে যে ওই ব্যাকরণ এমন কিছু বাক্য সৃষ্টি করেছে, যা বাঙলাভাষীদের বিবেচনায় 'অশুদ্ধ'। এ-অশুদ্ধ বাক্যরাশিকে পরিহার করার জন্যে বলা হয় যে সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ ভাষার 'সমস্ত, এবং কেবল শুদ্ধ' বাক্য সৃষ্টি করবে; এমন বাক্য সৃষ্টি করতে পারবে না যা 'শুদ্ধ' নয়।

'ভবিষ্যদ্বাণীসক্ষমতা' : সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ ভবিষ্যদ্বাণীর শক্তিসম্পন্ন, অর্থাৎ এ-ব্যাকরণ এমন শুদ্ধ বাক্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, যা আগে আর দেখা যায় নি। যে-উপাত্ত ভিত্তি ক'রে রচিত হবে এ-ব্যাকরণ, সে-উপাত্তের বাইরের অসংখ্য শুদ্ধ বাক্য সৃষ্টি করতে হবে এ-ব্যাকরণের। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ উপাত্ত অতিক্রম ক'রে যাবে : তা শুধু বর্ণনা করবে না, বাক্য সৃষ্টি করবে। যদি উপাত্তকে অতিক্রম ক'রে যেতে না পারে, তবে ব্যাকরণ সৃষ্টিশীল হবে না।

'সুস্পষ্টতা' : সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের সূত্ররাশি সুস্পষ্ট : বাক্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া এতো স্পষ্ট ও অনুপুঙ্খভাবে নির্দেশ করতে হবে যে তার সাহায্যে যেনো যে-কেউ নির্ভুল বাক্য গঠন করতে পারে। ব্যবহারকারীর বোধির ওপর কিছুই ছেড়ে দেয়া যাবে না।

'সাংগঠনিক বর্ণনা' : সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ কেবল বাক্য সৃষ্টি ক'রেই ক্ষান্ত হবে না; এ-ব্যাকরণ সৃষ্ট প্রতিটি বাক্যের স্বয়ংক্রিয় সাংগঠনিক বর্ণনা দেবে। সাংগঠনিক বর্ণনা হচ্ছে বাক্যের সংগঠনসংক্রান্ত বিবরণ। সাংগঠনিক ব্যাকরণে বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়া হয় না, কিন্তু সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে অত্যাবশ্যকভাবে দেয়া হয় প্রতিটি বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনা।

'ব্যাকরণ সসীম' : সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ ভাষাভাষীর ভাষাবোধকে প্রতিফলিত করে। মানুষের স্মৃতিশক্তি যদিও অমিত, তবুও তা সীমিত; তাই ব্যাকরণ ভাষার অসংখ্য বাক্যের তালিকা হ'তে পারে না। ভাষার সমস্ত বাক্য পৃথকপৃথকভাবে ধারণ করার শক্তি মস্তিষ্কের নেই। মানুষ সীমিত সূত্রের সাহায্যে সংখ্যাহীন বাক্য সৃষ্টি করে।

বর্ণনা পরিহার্য, যা আপাতদৃষ্টিতে সরল ও সফল ; যদি তা ভাষার সমস্ত এলাকা সরল ও সফলভাবে বর্ণনা করতে না পারে, তবে তা পরিহার্য।

১'২'৫ **দুর্বল ও শক্তিমান : ব্যাকরণ মূল্যায়নপ্রণালি**

কোনো ব্যাকরণ 'দুর্বল'ভাবে সৃষ্টি করে একরাশ বাক্য, আর বাক্যগুলোর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করার জন্যে 'শক্তিমান'ভাবে সৃষ্টি করে ওই বাক্যরাশির 'সাংগঠনিক বর্ণনা'। ব্যাকরণের বাক্য সৃষ্টির শক্তিকে চমস্কি বলেন ব্যাকরণের 'দুর্বল সৃষ্টিশক্তি'; এবং বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনা দানের শক্তিকে বলেন ব্যাকরণের 'শক্তিমান সৃষ্টিশক্তি'। দুটি ব্যাকরণ যদি একরাশ অভিন্ন বাক্য সৃষ্টি করে, তবে ওই ব্যাকরণ দুটিকে বলা হয় 'দুর্বল-ভাবে সমতুল্য'। যদি দুটি 'দুর্বলভাবে সমতুল্য' ব্যাকরণ তাদের সৃষ্ট বাক্যরাশির অভিন্ন সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়, তবে ওই ব্যাকরণ দুটিকে বলা হয় 'শক্তিমানভাবে সমতুল্য'। মনে করা যাক, দুটি ব্যাকরণ রচিত হয়েছে, এবং ওই ব্যাকরণ দুটি অভিন্ন বাক্যরাশি সৃষ্টি করে। তাই এ-ব্যাকরণ দুটি 'দুর্বলভাবে সমতুল্য'। এ-দুটির মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্টতর? ব্যাকরণ দুটিকে মূল্যায়ন করতে ব'সে যদি দেখা যায় যে যদিও উভয়েই সৃষ্টি করে একই রকম বাক্য ; কিন্তু একটি ব্যাকরণ দিয়েছে তার সৃষ্ট বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনা, কিন্তু অন্যটি কোনো সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়নি ; তবে যে-ব্যাকরণটি সাংগঠনিক বর্ণনা দিয়েছে, সে-টিকেই উৎকৃষ্টতর ব'লে বিবেচনা করতে হবে।

সমস্ত শুদ্ধ, এবং কেবল শুদ্ধ বাক্য সৃষ্টির ক্ষমতা হচ্ছে ব্যাকরণের 'দুর্বল সৃষ্টিশক্তি'। যে-ব্যাকরণ শুধুমাত্র শুদ্ধ বাক্য সৃষ্টি করে, এবং এর বেশি কিছু করে না, সে-ব্যাকরণ 'দুর্বল'। কেননা এ-ব্যাকরণ দৃশ্যমান উপাত্ত বর্ণনা ক'রে অর্জন করে নিম্নতম পর্যায়ের সাফল্য—পর্যবেক্ষণাত্মক যোগ্যতা (দ্র Φ ১'২'৪)। তবে এ-নিম্নতম সাফল্য অর্জনেও ব্যাকরণ ব্যর্থ হ'তে পারে দু'ভাবে : প্রথমত, ব্যাকরণটি এমনভাবে রচিত হ'তে পারে যে ওটিকে বাস্তব উপাত্ত দ্বারা পরখ করা অসম্ভব হ'তে পারে। প্রচলিত ব্যাকরণ ব্যর্থ হয় এমনভাবে—এর সূত্ররাশি সুস্পষ্ট নয়, তাই তা পরখ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, ব্যাকরণটি বিপুল পরিমাণ শুদ্ধ বাক্যের সাথে সৃষ্টি করতে পারে একরাশ অশুদ্ধ বাক্য। যেহেতু ব্যাকরণটি দৃশ্যমান উপাত্তকেও বর্ণনা করতে পারলো না, তাই এ-টি ব্যর্থ হলো পর্যবেক্ষণাত্মক যোগ্যতা অর্জনে। কিন্তু যদি কোনো ব্যাকরণ পর্যবেক্ষণাত্মক যোগ্যতা আয়ত্ত করে, তবুও তা মূল্যবান হ'য়ে ওঠে না, কেননা তা দীনভাবে উপাত্ত বর্ণনা করে শুধু। ব্যাকরণ মূল্যবান হ'য়ে ওঠে যোগ্যতার দ্বিতীয় স্তরে : বর্ণনাত্মক যোগ্যতার স্তরে। যে-ব্যাকরণ উপাত্ত যথাযথ সৃষ্টি করে, এবং সৃষ্টি করে উপাত্তবহির্ভূত বাক্য, এবং প্রতিটি বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়, সে-ব্যাকরণই বর্ণনাত্মক যোগ্যতাসম্পন্ন। যে-ব্যাকরণ বর্ণনাত্মক যোগ্যতাসম্পন্ন, এবং সর্বজনীন ভাষিক তত্ত্বজাত, তাই সর্বোত্তম ব্যাকরণ।

১'২'৬ **(ভাষা)বোধ ও (ভাষা)প্রয়োগ**

সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বোধ হচ্ছে (ভাষা)বোধ, ও (ভাষা)-প্রয়োগ। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের লক্ষ্য হচ্ছে আদর্শ বক্তাশ্রোতার ভাষাবোধের আন্তর সূত্র উদঘাটন : বাস্তবে তিনি কি-ভাবে ভাষাপ্রয়োগ করছেন, তার বর্ণনা দেয়া সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের উদ্দেশ্য নয়। চমস্কির মতে (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৪)) ভাষাবোধ হচ্ছে 'বক্তা-শ্রোতার ভাষাজ্ঞান', আর ভাষাপ্রয়োগ হচ্ছে 'বাস্তব পরিস্থিতিতে ভাষাব্যবহার'। 'বক্তা শ্রোতা' শব্দটি নির্দেশ করছে যে একজন ভাষাভাষী তাঁর ভাষাজ্ঞানকে দু'ভাবে ব্যবহার

করতে পারেন : তিনি বাক্য সৃষ্টি করতে পারেন, এবং অন্যের সৃষ্ট বাক্য অনুধাবন করতে পারেন। কোনো ভাষাভাষী তাঁর ভাষা, বা ভাষার শৃঙ্খলা সম্পর্কে অসচেতনভাবে যা জানেন, তাই তাঁর ভাষাবোধ। ভাষাবোধ সচেতন ব্যাপার নয়, তা অসচেতন। সমস্ত ভাষার অধিকাংশ ভাষীই ভাষা আয়ত্ত করেন অসচেতনভাবে। বাস্তব পরিস্থিতিতে যে-ভাবে কোনো ভাষাভাষী ভাষা ব্যবহার করেন, তাই তাঁর ভাষা-প্রয়োগ। ভাষার বাস্তবপ্রয়োগ ভাষাভাষীর আন্তর ভাষাবোধের প্রত্যক্ষ প্রকাশ, বা প্রতিফলন নয়। কোনো ব্যক্তির ভাষাপ্রয়োগকে তাঁর ভাষাবোধের বহিঃপ্রকাশ ব'লে মনে করা ঠিক নয়। বাস্তব ভাষাপ্রয়োগ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বহু বক্তা বাক্য শুরু করেন একভাবে, কয়েক শব্দের পরেই পাল্টে দেন বাক্যের ধরন, বা ভাষার নিয়ম থেকে স'রে যান বেশ দূরে, এবং তাঁর উক্তির শেষে তাঁর বক্তব্য যদিও বুঝি আমরা, তবু তাঁর গঠিত বাক্যকে সুষ্ঠু ব'লে গ্রহণ করতে পারি না। তাঁর এ-ত্রুটি প্রয়োগের ত্রুটি, বোধের নয়। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের লক্ষ্য বাস্তব, অসুষ্ঠু ভাষাপ্রয়োগের অভ্যন্তরে গুপ্ত ভাষাভাষীর ভাষাবোধ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। ভাষাভাষীর ভাষাবোধের আন্তর সূত্রের সমষ্টি হচ্ছে সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ।

ভাষাবোধের সাহায্যে ভাষাভাষী নিত্যনিয়ত নতুন, অভিনব, অশ্রুতপূর্ব বাক্য সৃষ্টি করতে পারেন, এবং অন্যের সৃষ্ট বাক্য বুঝতে পারেন। চমস্কির মতে, সৃষ্টিশীল ব্যাক-রণের কাম্য হচ্ছে 'আদর্শ পরিস্থিতি'তে 'আদর্শ বক্তাশ্রোতা'র ভাষাবোধ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। সে-আদর্শ পরিস্থিতিতে এমন কিছু থাকবে না, যা বক্তাশ্রোতাকে বাধা দিতে পারে বাক্যসৃষ্টিতে, ও অনুধাবনে। সৃষ্টিতে, ও অনুধাবনে যদি কোনো মানস, শারীর, বা অন্য কোনো ব্যাঘাত ভাষাভাষীকে বাধা না দেয়, তবে ওই বাস্তব পরিস্থি-তিতে তাঁর সৃষ্ট বাক্যকে গ্রহণ করা সম্ভব তাঁর ভাষাবোধের বহিঃপ্রকাশ ব'লে। কিন্তু বাস্তবে উল্লিখিত আদর্শ পরিস্থিতি দুর্লভ। ভাষাপ্রয়োগে বিঘ্ন ঘটায় মানস, শারীর, ও ও নানাবিধ বাস্তব ব্যাপার ; তাই ভাষাপ্রয়োগকে ভাষাবোধের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ব'লে গ্রহণ করা যায় না। যদি দৃষ্টি দিই ভাষার বাস্তব প্রয়োগে, তাহলে দেখি নিত্যনিয়ত এমন সব বাক্য গঠিত হচ্ছে, যাদের ব্যাকরণসম্মত ব'লে গ্রহণ করা অসম্ভব। (২)-এর উদাহরণ লক্ষণীয় :

(২) ক আমি আশা করি আপনি ··· আচ্ছা, সে-দিন কি আপনি এসেছিলেন ?

খ দিনকাল এমন পড়েছে ··· হে হে ··· নিধিরাম শেপাইদের ··· শালায় টেকাই কককঠি ··· কি যেনো বলছিলাম ··· আপনি নিজেই দেখছেন ··· চুপ মেরে আছি সবাই ··· আমি একটা উপন্যাস লেখার কথা ভাবছি, কেননা চমৎকার বিষয় পেয়ে গেছি ··· আমি ঘুমোতে পারি না।

এক রকম বাক্যসংগঠন থেকে মধ্যপথে অন্য রকম বাক্যসংগঠনে চ'লে যাওয়ার নিদর্শন হচ্ছে (২ ক)। (২ খ)-বাক্যটিকে আপাদশির দখল ক'রে আছে বাক্যবিপর্যয়, স্মৃতিভ্রংশতা, মনোযোগস্খলন, ভীতি, পুনরাবৃত্তি প্রভৃতি অভাষিক ব্যাপার। বলা যেতে পারে (২ক, খ) সৃষ্ট হয়েছে ভাষাসৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় ব্যাঘাতবশত। তবে (২ ক, খ) বক্তব্য-শূন্য নয়; এমন নয় যে শ্রোতা এদের মধ্যে থেকে কোনো মর্ম উদ্ধার করতে পারবেন না। উভয়ের বক্তব্যই বেশ ভালোভাবে সঞ্চারিত হবে শ্রোতার চিত্তে। (২ ক, খ) শ্রোতার কাছে গ্রাহ্য হবে শ্রোতার ভাষাবোধের সহায়তায়। তবে (২ ক, খ)-র সাহায্যে বক্তার ভাষাবোধ সম্পর্কে কোনো ধারণা করা কঠিন : (২ ক, খ)-র বক্তার ভাষাবোধ অবশ্যই গভীর, কিন্তু তাঁর ভাষাপ্রয়োগ বিপর্যস্ত হচ্ছে সম্ভবত মানস, শারীর, ও পরিস্থিতিক

কারণে। 'ভাষাবোধ', ও 'ভাষাপ্রয়োগ'-এর সাথে যুক্ত যথাক্রমে 'ব্যাকরণসম্মতি', ও 'গ্রহণযোগ্যতা' বোধ দুটি (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ১০))। ভাষাবোধের অন্তর্গত বোধ হচ্ছে 'ব্যাকরণসম্মতি', আর ভাষাপ্রয়োগের অন্তর্ভুক্ত ধারণা হচ্ছে 'গ্রহণযোগ্যতা'। কোনো বাক্য তখনি ব্যাকরণসম্মত, যখন তা গঠিত ব্যাকরণের সূত্রানুসারে; আর সে-বাক্যই গ্রহণযোগ্য বাক্য, যা ব্যাকরণের সূত্রবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও শ্রোতার চিত্তে ভাবসঞ্চার করে, এবং বাক্যের আন্তর সংগঠন সম্পর্কে আমাদের কিছুটা আভাস দেয়। ব্যাকরণগত দিক দিয়ে চমৎকার সুচারু বাক্যও অর্থাৎ ব্যাকরণসম্মত বাক্যও, বাস্তব প্রয়োগের সময়, গ্রহণঅযোগ্য ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে: আবার ব্যাকরণবিরুদ্ধ বাক্যও চমৎকারভাবে গ্রহণযোগ্য ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে বাস্তব প্রয়োগের সময়। কি-রকম বাক্য বাস্তবে গ্রহণযোগ্য, আর কি-রকম বাক্য বাস্তবে গ্রহণঅযোগ্য, তা স্থির করা কঠিন। বাক্যের গ্রহণযোগ্যতা ও গ্রহণঅযোগ্যতা সম্পর্কে প্রায় দু'দশক আগে ইংগ্‌ভ (দ্র ইংগ্‌ভ (১৯৬১)) পেশ করেছিলেন তাঁর 'গভীরতাতত্ত্ব'। তাঁর তত্ত্ব আজ আর গ্রহণযোগ্য ব'লে বিবেচিত হয় না, তবে তাঁর তত্ত্বে মনোযোগ দেয়ার মতো বস্তু রয়েছে। (৩)-এর 'পৌনপুনিক সূত্র'-সম্বলিত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণটি লক্ষণীয়:

(৩) ক ক → খ গ

খ খ → (খ) গ

গ খ → ঙ + (খ)

ঘ খ → চ + (খ) + চ

(৩ খ, গ, ঘ) সূত্র তিনটি পৌনপুনিক সূত্র। তবে এদের পৌনপুনিকতায় পার্থক্য রয়েছে। (৩ খ) সূত্রটি বাঁ-দিকে শাখায়নের নিদর্শন: এটি বাম-পৌনপুনিক সূত্র; আর (৩ গ) সূত্রটি ডান দিকে শাখায়নের নিদর্শন: এটি ডান-পৌনপুনিক সূত্র। (৩ ঘ) সূত্রটি কেন্দ্রে শাখায়নের নিদর্শন: এটি মধ্য-পৌনপুনিক বা স্বগ্রথিত সূত্র। ইংগ্‌ভ-এর মত হচ্ছে যে বাম-পৌনপুনিক সূত্র মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বাড়ায়, অর্থাৎ 'গভীরতা' সঞ্চার করে। এমন সূত্রের সাহায্যে গঠিত বাক্য, তাঁর মতে, স্মৃতিশক্তির ওপর চাপ সৃষ্টি করে, এবং এ-চাপ যতোই বাড়ে, বাক্য ততোই অবোধ্য হ'য়ে ওঠে। তাঁর তত্ত্ব বিভ্রান্তিকর এ-জন্যে যে তাঁর ধারণা যেনো মানবমস্তিষ্ক কম্পিউটরতুল্য: যা বুঝতে কম্পিউটরের বেশি কষ্ট হয়, তা বুঝতে মানুষেরও অধিক কষ্ট হবে, এমন তাঁর ধারণা। অনেক ভাষায় দেখা যায় বাঁ-দিকে শাখায়িত বাক্যের আধিক্য (যেমন: বাঙলা, তুর্কি ও জাপানিতে), কিন্তু তাতে ওই ভাষাভাষীদের অসুবিধা হয় না। (৩খ) সূত্রটি অর্থাৎ বাম-পৌনপুনিক সূত্র সৃষ্টি করে (৪ক) ধরনের সংগঠন; (৩গ) সূত্রটি, অর্থাৎ ডান-পৌনপুনিক সূত্র সৃষ্টি করে (৪খ) ধরনের সংগঠন: এবং (৩ঘ) সূত্রটি, অর্থাৎ স্বগ্রথিত সূত্র সৃষ্টি করে (৪গ) ধরনের সংগঠন:

(৪) ক

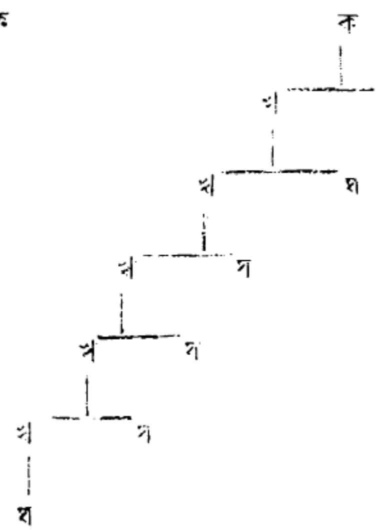

খ

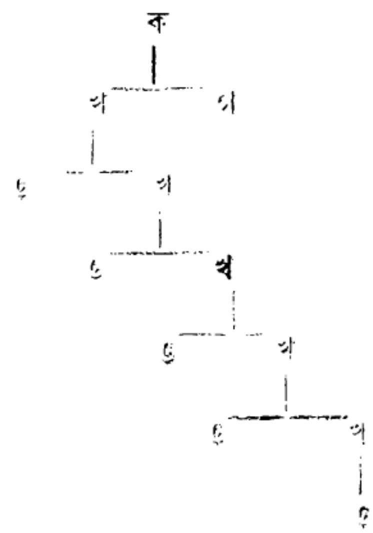

গ

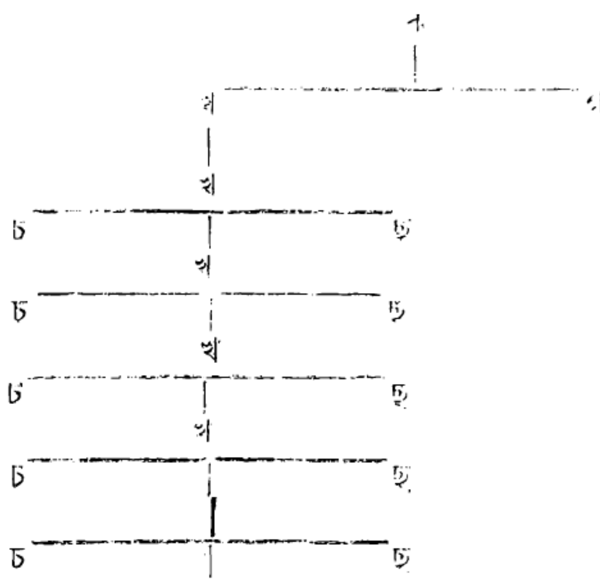

উল্লিখিত তিন রকম সংগঠনের মধ্যে কোন রকম সংগঠন অবোধ্য, কোন রকম সংগঠন দুরূহ, এবং কোন রকম সংগঠন সরল, তা বলা বেশ কঠিন। বাঙলায় বাম-পৌনপুনিক, ও ডান-পৌনপুনিক বাক্যসংগঠন পাওয়া যায়, তবে স্বগ্রথিত বাক্যের উদাহরণ দুর্লভ। (৫)-এর উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৫) ক হাসানের বোনের স্বামীর মামীর ভাইয়ের বান্ধবীর বেড়ালের ডাক গানের মতো।

খ যে-মেয়েটি নাচছে, সে যে-ছেলেটিকে চিঠি লিখেছে, সে-ছেলেটি যাকে একটি গোলাপ উপহার দিয়েছে, সে যে-অধ্যাপককে বাঙলাদেশের সেরা কবি মনে করে, তিনি যাকে ···

গ সে-গোলাপটি, যা আপনি আমি দেখেছিলেন তুলেছিলাম, চমৎকার।

(৫)-এর বাক্যগুলো পৌনপুনিক সূত্রের সাহায্যে গঠিত : এ-সব বাক্যে বিশেষ এক ধরনের বাক্যসংগঠনকে একই ধরনের বাক্যসংগঠনের ওপর পৌনপুনিকভাবে আরোপ

করা হয়েছে। (৫ক) বাম-পৌনপুনিকতার নিদর্শন: এ-বাক্যে প্রধান বিশেষ্যপদের আগে সৃষ্টি করা হয়েছে সমসাংগঠনিক সম্বন্ধপদ। বাক্যটি আপাতবোধ্য। সম্বন্ধপদের পরিমাণ আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দিলে এ-আপাতবোধ্যতাও তিরোহিত হতো। (৫খ) ডান-পৌনপুনিকতার নিদর্শন: এ-বাক্যে সম্বন্ধাত্মক খণ্ডবাক্যের ডানমুখি জাল বিস্তার করা হয়েছে। (৫গ) স্বগ্রথিততার নিদর্শন: এতে একটি মূল বাক্যের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে দুটি সম্বন্ধাত্মক খণ্ডবাক্য। (৫)-এর বাক্য তিনটির মধ্যে এটি কিম্ভূততম: বাস্তবে বাঙলা ভাষায় এমন বাক্য পাওয়া যাবে না। কিন্তু ওপরের তিনটি বাক্যই ব্যাকরণসম্মত, যদিও এরা সবাই সমপরিমাণে গ্রহণযোগ্য নয়।

বাক্যকে গ্রহণযোগ্য ক'রে তোলার জন্যে বাঙলা ভাষায় বেশ কয়েকটি চমৎকার কৌশল অবলম্বন করা হয়। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয়:

(৬) ক আমি যে তুমি আসবে জানতাম।
খ আমি জানতাম যে তুমি আসবে।
(৭) ক মেয়েটি, যে এসেছে, রূপসী।
খ যে-মেয়েটি এসেছে, সে রূপসী।

(৬ক)-বাক্যটি, যদিও নিখুঁতভাবে ব্যাকরণসম্মত, নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়। এ বাক্যটির মধ্যে ঢুকে আছে একটি পরিপূর্ণ 'সম্পূরক বাক্য' ('তুমি আসবে')। বাঙলা ভাষায় কর্ম-বিশেষ্যপদ, সাধারণত, ক্রিয়াপদের অব্যবহিত পূর্বস্থানে বসে: যেমন—'সে বই পড়ে'। (৬ক) বাক্যে 'তুমি আসবে' বাক্যটি 'জানতাম' ক্রিয়াপদের কর্ম; তাই এটির বসা উচিত ক্রিয়াপদের অব্যবহিত পূর্বস্থানে, অর্থাৎ (৬ক) বাক্যে এটি যে-জায়গায় বসেছে, সে-জায়গায়। কিন্তু একটি সম্পূর্ণ বাক্যের এমন অবস্থানে ব্যবহারিক অসুবিধা সৃষ্টি হয়, তাই বাঙলা ভাষায় এমন সম্পূরক বাক্যকে স্থানান্তরিত করা হয়, এবং স্থাপন করা হয় ক্রিয়াপদের ডান পাশে। (৬খ)-তে সম্পূরক বাক্যটিকে স্থাপন করা হয়েছে ক্রিয়াপদের ডানে, এবং রচিত হয়েছে চমৎকার গ্রহণযোগ্য একটি বাক্য। (৬ক, খ)-র মধ্যে কোনোটিই ব্যাকরণবিরোধী নয়, তবে বাস্তবে একটি অন্যটির চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বা অযোগ্য। (৭ক) একটি 'সম্বন্ধাত্মক বাক্য': এ-বাক্যে একটি বিশেষ্যপদের গায়ে গেঁথে দেয়া হয়েছে একটি সম্বন্ধাত্মক খণ্ডবাক্য ('যে এসেছে')। কিন্তু এটি ব্যাকরণ সম্মত হওয়া সত্ত্বেও এটির চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হচ্ছে এরই রূপান্তর (৭খ)। বাঙলায় বাক্যের অভ্যন্তরে সম্বন্ধাত্মক খণ্ডবাক্য লালন করা হয় না ব্যবহারিক অসুবিধার জন্যে, এবং এমন খণ্ডবাক্যকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় মূল বাক্যের বাঁ-পাশে। (৭খ)-তে সম্বন্ধাত্মক খণ্ডবাক্যটিকে মূল বাক্যের বাঁয়ে স্থাপন করা হয়েছে, এবং এর ফলে বাক্যটির রূপ অনেকটা বদলে গেছে। বাস্তবে যদিও (৭খ)ই অধিকতর গ্রহণযোগ্য, তবু (৭ক, খ)-র সৃষ্টিপ্রক্রিয়া উদঘাটন ক'রে দেখানো যায় যে (৭ক)ই হচ্ছে মৌল বাক্য, যার থেকে, রূপান্তরের মাধ্যমে, উদ্ভূত হয়েছে (৭খ) বাক্যটি।

সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের লক্ষ্য ভাষাভাষীর ভাষাবোধ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা; ভাষা-প্রয়োগের প্রণালিবর্ণনা এ-ব্যাকরণের লক্ষ্য নয়। ভাষাবোধের বহিঃপ্রকাশ যেহেতু বিঘ্নিত হয় নানা রকম অভাষিক কারণে, তাই ভাষাভাষীর ভাষাবোধের আন্তর শৃঙ্খলা উদ্ঘাটনের জন্যে ভাষাবিজ্ঞানীকে গ্রহণ করতে হয় আদর্শায়িত উপাত্ত, যা অভাষিক বিঘ্ন দ্বারা পীড়িত নয়। আদর্শ উপাত্ত সম্পর্কে চমস্কির বক্তব্য (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৩)): 'ভাষিক তত্ত্বের বিষয় হচ্ছেন একজন আদর্শ বক্তাশ্রোতা, যিনি বসবাস করেন সুষম ভাষাসমাজে, এবং নিজের ভাষা জানেন সুচারুরূপে। তিনি তাঁর ভাষাজ্ঞানকে

বাস্তবে প্রয়োগের সময় স্মৃতিভ্রংশতা, বিচলন, মনোযোগস্খলন, ভুলভ্রান্তি প্রভৃতি অ-ব্যাকরণিক ব্যাপার দ্বারা প্রভাবিত হন না।' ভাষাবোধের সূত্র উদ্‌ঘাটনের জন্যেই দরকার হয় আদর্শায়িত উপাত্ত।

১.২.৭. চৈতন্যবাদ

মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান উপাত্ত- ও আচরণ-বাদী, এবং চৈতন্যবাদবিরোধী ; অন্যদিকে রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ চৈতন্যবাদী, এবং উপাত্ত-ও আচরণ-বাদ-বিরোধী। চৈতন্যবাদ ও উপাত্তবাদের (অভিজ্ঞতাবাদ) দ্বন্দ্ব পাশ্চাত্যে চ'লে আসছে বহু দিন ধ'রে। চৈতন্যবাদের প্রধানপুরুষ হচ্ছেন দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০) ও লাইবনিৎস (১৬৪৬-১৭১৬); আর অভিজ্ঞতাবাদের প্রধানপুরুষ হচ্ছেন লক (১৬৩২-১৭০৪) ও হিউম (১৭১১-১৭৭৬)। অভিজ্ঞতাবাদের একরকম পরিণতি হচ্ছে আচরণবাদ, যা বিশ শতকী মার্কিন মনস্তত্ত্বশাস্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'য়ে ওঠে। মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানও গ্রহণ করে আচরণবাদ। চমস্কীয় ভাষাবিজ্ঞান আচরণবাদের বিরুদ্ধে এক বিশাল, ও সফল বিদ্রোহ। চমস্কি, প্রথম পর্যায়ের রচনায় (যেমন: "সিন্‌ট্যা"-এ), দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নমুক্ত; কিন্তু ক্রমশ তিনি এগোন দর্শন ও মনস্তত্ত্বের অভিমুখে। তাঁর যাত্রা শুরু হয় 'স্বায়ত্তশাসিত ভাষাবিজ্ঞান' রীতি অবলম্বন ক'রে, এবং তাঁর পরিণত রচনায়ও ছোঁয়া বোধ করা যায় স্বায়ত্তশাসিত ভাষাবিজ্ঞানের ; কিন্তু তিনি যাত্রা শুরুর স্বল্প পরেই স'রে যান স্বায়ত্তশাসিত ভাষাবিজ্ঞান থেকে, এবং ভাষাবিজ্ঞান, দর্শন ও মনস্তত্ত্বকে গ্রহণ করেন পরস্পর-লগ্ন ও নির্ভর বিদ্যারূপে। ভাষাবিজ্ঞান তাঁর কাছে মূল্যবান এ-জন্যে নয় যে এর কৌশলসমূহ চমৎকারভাবে মানুষকে ভাষা আয়ত্তে সাহায্য করতে পারে ; ভাষাবিজ্ঞান চমস্কির কাছে মূল্যবান, কেননা এ-শাস্ত্র মানবমন ও মস্তিষ্ক সম্পর্কে মূল্যবান অলোকসম্পাত করতে পারে। চমস্কি, তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের রচনাবলিতে (দ্র চমস্কি (১৯৬৬ক, ১৯৬৮)), মানবমন-উদ্‌ভাসী আলোক-রশ্মিরূপেই গ্রহণ করেছেন ভাষাবিজ্ঞানকে। চমস্কির মতে চৈতন্যবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য, সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে, বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের সাহায্যে, সহায়তা করতে পারে ভাষাবিজ্ঞান। চরম চৈতন্যবাদীদের মতে মানব মন, বা চৈতন্যই সমস্ত জ্ঞানের উৎস ; আর অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের জননী। ইউরোপে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে মন, ও বাহ্যিক জগত সম্পর্কে বিস্তর বিতর্ক হয়, এবং এ-বিতর্ক সম্প্রসারিত হয় বিশ শতক পর্যন্ত। লক-হিউম প্রমুখের মতে মানব মন হচ্ছে 'শূন্য পৃষ্ঠা'—'তাবুলা রাসা'—, যা এক সময় অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানে ভরাট হ'য়ে ওঠে। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, অভিজ্ঞতার আগে মানুষ নির্জ্ঞান ; জ্ঞানশূন্য প্রাণীরূপে বিশ্বে জন্ম নেয় মানবসন্তান। দেকার্ত-লাইবনিৎস-এর মতে, মানুষ জন্মগ্রহণ করে কতিপয় সহজাত বোধ নিয়ে ; আর ওই সহজাত আন্তর বোধরাশিই সমস্ত জ্ঞানের উৎস। অভিজ্ঞতা, তাঁদের মতে, জ্ঞানের জননী নয়। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্যার উৎপত্তির মূলে আছে অভিজ্ঞতাবাদ। অভিজ্ঞতাবাদ 'শারীরবাদ' ও 'নিয়ন্ত্রণবাদ'-এর সাথে যুক্ত হ'য়ে এমন ধারণা সৃষ্টি করেছে যে মানুষের জ্ঞান ও আচরণ সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেশনিয়ন্ত্রিত ; আর এ-ব্যাপারে মানুষ, পশু ও যন্ত্রের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই।[৩] মানুষ সম্পর্কে চমস্কির ধারণা অভিজ্ঞতাবাদী

---

৩. শারীরবাদ : এ-তত্ত্বের বক্তব্য হচ্ছে যে মানুষের শারীর-অবস্থা ও আচরণ-সূত্রের সাহায্যে, পদার্থবিদ্যার সূত্রের মতো, বর্ণনা করা যায় মানুষের তথাকথিত আবেগঅনুভূতিচিন্তাকে।

নিয়ন্ত্রণবাদ : এ-তত্ত্বের মতে মানুষের 'স্বাধীন ইচ্ছা' একটি উপকথামাত্র। মানুষ, অন্য যে-কোনো প্রাকৃতিক ব্যাপারের মতো, প্রাক্তন ঘটনা ও ব্যাপার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ; এবং ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াসূত্র দ্বারা চালিত। তাই মানুষের নির্বাচন-স্বাধীনতা সর্বাংশে প্রতিভাসমাত্র।

ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত: তাঁর মতে মানুষ সমৃদ্ধ কতিপয় সহজাত ও আন্তর বৈশিষ্ট্যে, যা জ্ঞানার্জনে পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ-আন্তর বৈশিষ্ট্যরাজি মানুষকে সাহায্য করে মুক্ত, স্বাধীন, ও অনিয়ন্ত্রিত আচরণ করতে। মানব মন, ও মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চমস্কি ব্যাপক ও গভীর আলোচনা করেছেন "কার্টেজিয়ান লিংগুইস্টিকস" (১৯৬৬), ও "ল্যাংগুয়েজ এ্যাণ্ড মাইণ্ড" (১৯৬৮) গ্রন্থে। তিনি মানুষকে মুক্ত করেন আচরণবাদী মনস্তত্ত্বের 'উদ্দীপক' ও 'সাড়া'র শেকল থেকে।

চৈতন্যবাদ ও আচরণবাদী দ্বন্দ্বের দুটি পৃথক ও পরস্পরলগ্ন দিক আছে: এর একটি দার্শনিক, অন্যটি প্রণালিগত।

দার্শনিক দিক: ব্লুমফিল্ডীয় ভাষাবিজ্ঞানের কোনো তাত্ত্বিক উৎসাহ ছিলো না। মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিলো যে ভাষাবর্ণনাই ভাষাবিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। ভাষাবিজ্ঞান তাঁদের কাছে মূল্যবান ছিলো, কেননা তাঁরা মনে করতেন যে ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রণালির সহায়তায় ভাষাভাষীরা সহজভাবে ভাষা শিখতে পারে। কিন্তু স্যাপির ব্যতীত আর কারো মনে এ-ধারণা জাগে নি যে ভাষাবিদ্যা মূল্যবান, যেহেতু ভাষা মানুষের অনন্য সম্পদ, যা চিন্তার জন্যে অপরিহার্য। ব্লুমফিল্ড "ল্যাংগুয়েজ" (১৯৩৩) গ্রন্থ সংশোধনের সময় পরিণত হয়েছিলেন চরম আচরণ-বাদীতে। জ্যাক ও জিলের গল্পের (দ্র ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩,৩২)) ভাষ্যদানের সময় তিনি ভাষা সম্পর্কে দুটি তত্ত্বের কথা বলেছেন: একটি 'চৈতন্যবাদ', অন্যটি 'যন্ত্রবাদ'। চৈতন্যবাদ ও যন্ত্রবাদের যে-বিবরণ ব্লুমফিল্ড (দ্র ১৯৩৩, ৩২) দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ: 'চৈতন্যবাদী তত্ত্ব, যা প্রাচীনতর, এবং বিদ্যমান আজো জনপ্রিয় লোকবিশ্বাসে ও বিজ্ঞানীমণ্ডলে, মনে করে যে মানবাচরণ-বৈচিত্র্যের মূলে আছে 'চেতনা', বা 'ঈপ্সা', বা 'মন' নামী এক অ-শারীর বস্তু, যা বিদ্যমান প্রত্যেক মানুষের মধ্যে। চেতনা, চৈতন্যবাদী তত্ত্বানুসারে, বাস্তব পদার্থপুঞ্জ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা; সুতরাং তা মেনে চলে অন্য রকম কোনো কার্যকারণশৃঙ্খলা, বা তা কোনো রকম কার্যকারণশৃঙ্খলারই অধীন নয়। জিল কোনো কথা আদৌ বলবে কি-না, বা বললে কি বলবে, তা নির্ভর করে তার মন, বা চেতনার ওপর; আর এ-মন বা চেতনা যেহেতু জাগতিক কার্যকারণশৃঙ্খলার অধীন নয়, তাই আমরা তার আচরণ সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না। জড়বাদী (বা যন্ত্রবাদী) তত্ত্ব মনে করে যে ভাষাসহ সমস্ত মনবাচরণ-বৈচিত্র্যের মূলে আছে মানবশরীর, যা এক অতিশয় জটিল তন্ত্র। মনবাচরণ, যন্ত্রবাদী তত্ত্বানুসারে, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে যেমন কার্যকারণশৃঙ্খলা দেখা যায়, ঠিক তেমন শৃঙ্খলারই অধীন।' ব্লুমফিল্ড আক্রমণ চালিয়েছিলেন প্রচলিত চৈতন্যবাদের বিরুদ্ধে: কেননা তা এমন সব উপাত্ত নিয়ে কারবার করে যা বস্তুগতভাবে পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব। ব্লুমফিল্ড মানুষের প্রত্যেকটি কর্মের মূলে দেখতে চান বস্তুগতভাবে পর্যবেক্ষণসম্ভব কোনো-না-কোনো কারণ, আর তা নির্ণয় করতে চান যান্ত্রিকভাবে। এ-তত্ত্ব ভাষায় প্রয়োগ করতে গেলে ধ'রে নিতে হবে যে মানুষের প্রতিটি উক্তির পেছনে রয়েছে ভাষাবহির্ভূত কোনো কারণ। যদি জানা যায় ওই কারণটি, বা কারণরাশি, তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে কে কি উক্তি করবে, তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা সম্ভব। এর অর্থ হচ্ছে আচরণবাদ ভাষাসম্পর্কে পোষণ করে নিয়ন্ত্রণবাদী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। এ-দর্শনে ভাষার সাহায্যে যোগাযোগ রচনায় মানুষের কোনো স্বাধীন শক্তির স্থান নেই। মানুষের ভাষাব্যবহারও বাস্তব কারণচালিত। এ-তত্ত্ব ভাষার, ও ভাষাভাষীর সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। কিন্তু যে-তত্ত্ব বিশ্বাসী ভাষার সৃষ্টিশীলতায়, সে-তত্ত্ব অবশ্যই ভাষা, ও ভাষাভাষীর সম্পর্ক দেখবে ভিন্নভাবে। মানুষের ভাষাবোধ সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, আর এ-ব্যাকরণের লক্ষ্য

হচ্ছে ভাষাভাষীর ভাষাবোধের সুস্পষ্ট সূত্র রচনা। চমস্কি মনে করেন যে মানুষের ভাষাবোধ কোনো বাহ্যিক কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তা স্বাধীন। তাই চমস্কির প্রস্তাবিত তত্ত্ব চৈতন্যবাদী। কিন্তু এ-চৈতন্যবাদে প্রচলিত চৈতন্যবাদের ঈশিতা, ও আত্মার কোনো স্থান নেই। চমস্কীয় চৈতন্যবাদ আচরণবাদবিরোধী হ'লেও তা শারীরবাদের শত্রু নয়। দেকার্ত ও অন্যান্য চৈতন্যবাদীর মতো চমস্কিও মনে করেন যে মানবাচরণ, অংশত হ'লেও, বাহ্য উদ্দীপক, ও দেহাভ্যন্তর শাসন থেকে মুক্ত।

পদ্ধতিগত/প্রণালিগত দিক : কোনো ভাষার ব্যাকরণ হচ্ছে ওই ভাষা, অর্থাৎ ওই ভাষার বাক্যরাশি সম্পর্কে তত্ত্ব। সাংগঠনিকেরা মনে করেছিলেন কতিপয় প্রণালি-পদ্ধতির সাহায্যে যে-কোনো ভাষার ব্যাকরণ যান্ত্রিকভাবে রচনা করা সম্ভব (দ্রঃ ১.২.২ ; ১.২.৪)। ব্যাকরণ রচনায় তাঁরা উপাত্তনির্ভর : উপাত্তের ওপর, 'আরোহী' প্রথায়, বিভিন্ন প্রণালি প্রয়োগ ক'রে তাঁরা রচনা করতে চেয়েছিলেন ব্যাকরণ। অর্থাৎ ভাষাবর্ণনায় তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন 'অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি'। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ ভিন্ন রকম। এ-ব্যাকরণের লক্ষ্য ভাষাভাষীর আন্তর, অসচেতন ভাষাবোধ সুস্পষ্টভাবে উদ্ঘাটন করা। সৃষ্টিশীল ভাষাবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপাত্তনির্ভর নয়। এ-তত্ত্ব 'অবরোহী' : ডিডাকটিভ ক্যালকুলাস-এ যেমন একটি 'অ্যাকসইঅ্যাম' থেকে উৎসারিত হয় অসংখ্য 'থিঅ্যারাম', সৃষ্টিশীল ব্যাকরণেও তাই ঘটে। একটি অ্যাকসইঅ্যাম থেকে সূত্র প্রয়োগের সাহায্যে এ-ব্যাকরণে সৃষ্টি করা হয় অগণিত থিঅ্যারাম (বাক্য)। কোনো ভাষার ব্যাকরণ উদ্ভূত হয় ওই ভাষার বাক্যসম্পর্কে ব্যাকরণ-রচয়িতার তত্ত্ব থেকে। উপাত্তের অজস্র ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে জন্ম নেয় না তত্ত্ব, হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ঝলমল করা ভাষাবিজ্ঞানীর চিত্তে আকস্মিকভাবে জ্ব'লে উঠতে পারে তত্ত্ব। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে উপাত্তের ওপর প্রণালির পর প্রণালি প্রয়োগ ক'রে বিভিন্ন ভাষাবস্তু আবিষ্কার করা হয়, কিন্তু সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে প্রণালির প্রচণ্ড প্রয়োগে কোনো কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয় না। উপাত্ত-ভাষা সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীর থাকতে পারে পূর্বধারণা, তিনি স্খলন-পতন-সংশোধনের মাধ্যমে হাজির হ'তে পারেন তাঁর সিদ্ধান্তে বা আকস্মিক প্রেরণায়ও পেতে পারেন কাম্য সত্যকে। তত্ত্ব তিনি কি-ভাবে পেয়েছেন তা মূল্যবান নয়; মূল্যবান হচ্ছে তাঁর তত্ত্ব বাস্তব উপাত্তের পরখ সহ্য করতে পারে কি-না। তিনি সূত্র প্রয়োগ ক'রে সৃষ্টি করবেন যে-সব থিঅ্যারাম, তাদের অবশ্যই উত্তীর্ণ হ'তে হবে বাস্তব উপাত্তের পরীক্ষা। তাঁর সূত্ররাশিকে হ'তে হবে ভবিষ্যদ্বাণী-সক্ষম। যদি তাঁর সৃষ্ট সমস্ত বাক্য ভাষাভাষী কর্তৃক শুদ্ধ বলে গৃহীত হয়, তবেই তিনি সার্থক : কি-ভাবে তিনি শুদ্ধ বাক্যসৃষ্টির সূত্র আবিষ্কার করেছেন, তা বিবেচ্য নয়।

সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানী তাঁর ব্যাকরণে ভাষাভাষীর ভাষাবোধ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে উৎসাহী। ব্যাকরণ রচনার সময় তিনি কাজে লাগান উপাত্ত-ভাষার বাক্যসম্পর্কে তাঁর নিজের, ও ওই ভাষাভাষীর বিচারবিবেচনা। বিভিন্ন বাক্যের ব্যাকরণসম্মতি ও অসম্মতি সম্পর্কে ভাষাভাষীর বোধ, বা ধারণা তাঁকে সাহায্য করে নানাভাবে। তবে তিনি ব্যাকরণ রচনায় ভাষাভাষীর বিশ্লেষণকে গ্রহণ করেন না, কেননা ভাষাভাষীরা ভাষার বাক্যসম্পর্কে চমৎকার অসচেতন বোধসম্পন্ন হ'লেও তাঁরা যে বাক্যবিশ্লেষণদক্ষ হবেন, এমন নয়। যা দরকার, তা হলো ভাষাভাষীর বাক্যবোধ। ভাষার বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে থাকতে পারে নানারকম সম্পর্ক,—কোনো বাক্য হ'তে পারে শুদ্ধ, বা অশুদ্ধ, কোনোকোনো বাক্য হ'তে পারে দ্ব্যর্থ, বা নানার্থ : এ সম্পর্কে ভাষাভাষীরা লালন করে অসচেতন বোধ (তবে সব ভাষীর বোধ সহায়তা নাও করতে পারে)। বিভিন্ন বাক্য সম্পর্কে ভাষাভাষীর বোধ গভীরভাবে উদ্ঘাটন করাই ভাষাবিজ্ঞানীর লক্ষ্য; ভাষাভাষীরা কি-ভাবে বিভিন্ন বাক্য বিশ্লেষণ করবে, সে-দিকে তাঁর দৃষ্টি দেয়ার দরকার

নেই (ভাষাভাষী মাত্রই ভাষাবিজ্ঞানী নয়)। ভাষার অনেক বাক্য আপাতবিভ্রান্তিকর ; ভাষাবিজ্ঞানী সে-সমস্ত বাক্যের আন্তর গঠনপ্রক্রিয়া আবিষ্কার ক'রে ভাষাভাষীর অসচেতন বোধকে শাণিত, ও সচেতন ক'রে তুলতে পারেন। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৮) ক হাসান নদী ভালোবাসে।
খ হাসান কি নদী ভালোবাসে ?
গ হাসান নদী ভালোবাসে না।
ঘ হাসান কি ভালোবাসে ?
ঙ কে নদী ভালোবাসে ?
চ হাসান নদী ভালোবাসে, তাই না ?
ছ হাসান নদী ভালোবাসে না, তাই নয় কি ?

(৯) ক আমি এ-কথা মনে করি যে আজ বৃষ্টি হবে না।
খ আমি মনে করি যে আজ বৃষ্টি হবে না।
গ আমি মনে করি আজ বৃষ্টি হবে না।
ঘ আমি মনে করি না যে আজ বৃষ্টি হবে।
ঙ ? আমি যে আজ বৃষ্টি হবে না মনে করি।

(৮)-এর বাক্যসমূহ পরস্পরের সাথে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পর্কিত, এ-কথা বাঙলাভাষীদের মনে হওয়া স্বাভাবিক ; তবে এ-সম্পর্ক কোথায়, তা সম্ভবত অধিকাংশ বাঙলাভাষীর কাছে অস্পষ্ট। এ-বাক্যগুলোতে সাংগঠনিক, ও আর্থ সম্পর্ক বিদ্যমান। (৮)-এর বেশ সহজ সরল বাক্যগুলো বাঙলাভাষীরা যেমন বুঝতে পারে, তেমনি যে-কোনো জটিল বাক্যও তাঁরা বুঝতে সক্ষম। যদি বলি : 'যে-মেয়েটি নাচছে, তার গ্রীবার লাল তিলটির পাশের হলদে দাগটি নিয়ে যে-মহাকবি পঞ্চাশ সর্গের একটি মহাকাব্য রচনা করতে পারতেন, তিনি আজো তরুণী মাতার গর্ভে ঘুম যাচেছন'—তবে এটিও বোধগম্য হবে। বাক্য বোঝার জন্যে কাউকেই বসতে হয় না কাগজকলম নিয়ে। বাঙলাভাষীরা (৮, ৯)-এর বাক্যগুলো সম্পর্কে যে-জ্ঞান ধারণ করে, তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যে ভাষাবিজ্ঞানীকে সাহায্য নিতে হবে বেশ কিছু ভাষিক বোধের : এর মধ্যে আছে 'সরল সংগঠন / বাক্য', 'প্রশ্নবোধক', 'নঞর্থক', 'প্রশ্নবোধক সর্বনাম', 'সংযুক্ত প্রশ্ন', 'সম্পূরকীকরণ' প্রভৃতি। (৮)-এর বাক্যগুলোর সাংগঠনিক সম্পর্ক কি-ভাবে সুস্পষ্ট সুশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ করা সম্ভব ? (৮ক) একটি সরল বিবৃতিধর্মী হ্যাঁ-সূচক সংগঠন ; এবং (৮খ) একটি প্রশ্নবোধক বাক্যসংগঠন। (৮ঘ)ও প্রশ্নবোধক, তবে (৮খ)-এর সাথে পার্থক্য রয়েছে প্রশ্নের প্রকৃতিতে। (৮ঘ)-কে দ্ব্যর্থবোধক ব'লেও মনে করা যেতে পারে : এক ভাষ্যে এ-বাক্যের 'কি'-কে বিবেচনা করা যেতে পারে 'প্রশ্ননির্দেশক' রূপে, আবার এটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে প্রশ্নবোধক সর্বনাম ব'লে (এ-দ্ব্যর্থতা মোচনের জন্যে প্রশ্নবোধক সর্বনামের বানান লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—'কী')। (৮ঙ) বাক্যটিও প্রশ্নবোধক, এবং এর সাথে মিল আছে (৮ঘ)-র : উভয় বাক্যেই ব্যবহার করা হয়েছে প্রশ্নবোধক সর্বনাম। তবে পার্থক্যও আছে : দুটি বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে দু'রকম সর্বনাম। (৮ চ, ছ) বাক্য দুটির প্রশ্নকে বলতে পারি 'সংযুক্ত প্রশ্ন'। এ-সংগঠন দুটির মধ্যে রয়েছে চমৎকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য। (৮চ)-র প্রথমাংশ ('হাসান নদী ভালোবাসে') একটি সরল বিবৃতিধর্মী-হ্যাঁ-সূচক সংগঠন, আর তার সাথে যুক্ত করা হয়েছে প্রশ্ন ('তাই না ?')। (৮ ছ)-এর প্রথমাংশ ('হাসান নদী ভালোবাসে না') একটি বিবৃতিধর্মী-না-সূচক সংগঠন, আর তার সাথে যোগ করা হয়েছে প্রশ্ন ('তাই নয় কি ?')। (৯)-এর বাক্যগুলোও পরস্পরসম্পর্কিত। (৯)-এ সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে গঠন করা হয়েছে জটিল

বাক্য। (৯ক) বাক্যটি বেশ বিস্তৃত: বাক্যটি গঠিত হয়েছে সম্পূরক বাক্য গঠনের জন্যে যে-সমস্ত ভাষাবস্তু দরকার, তার কোনোটিকে পরিত্যাগ না ক'রে (বাস্তব প্রয়োগে 'এ-কথা', ও 'যে' সাধারণত পরিত্যক্ত হয়)। (৯ক) বাক্যটির প্রধান অংশ দুটি: একটিকে বলা যাক 'মৌল সংগঠন' ('আমি মনে করি'), এবং অন্যটিকে বলা যাক 'সহায়ক সংগঠন' ('আজ বৃষ্টি হবে না')। এ-বাক্যে মৌল সংগঠনের শরীরে গেঁথে দেয়া হয়েছে সহায়ক সংগঠনটিকে। বাক্যটিতে মৌল, ও সহায়ক সংগঠন দুটিকে যুক্ত ক'রে রাখা হয়েছে সম্পূরক-চিহ্ন 'যে'-র সাহায্যে। বাক্যটির মৌল অংশ হ্যাঁ-সূচক, আর সহায়ক অংশ না-সূচক। (৯খ, গ)-তে পরিত্যাগ করা হয়েছে দুটি ভাষাবস্তু ('এ-কথা', ও 'যে'); কিন্তু তাতে বাক্যে কোনো অর্থবদল ঘটেনি। (৯ঘ)-তে দেখতে পাই চমৎকার সাংগঠনিক রূপান্তর; কিন্তু তাতে বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হয় নি (৯ ক-ঘ সমার্থক)। (৯ ক, খ, গ)-তে সংগঠনের প্রথমাংশ হ্যাঁ-সূচক এবং দ্বিতীয়াংশ না-সূচক; কিন্তু (৯ঘ)-তে দেখা যাচ্ছে যে সংগঠনটির প্রথমাংশ না-সূচক ('আমি মনে করি না'), আর দ্বিতীয়াংশ হ্যাঁ-সূচক ('আজ বৃষ্টি হবে')। সাংগঠনিক এমন পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও (৯ ক, খ, গ) এবং (৯ ঘ) সমার্থক। এ-বাক্যসমূহের গভীর বর্ণনার সময় দেখানো সম্ভব যে এরা উৎসারিত হয়েছে এক অভিন্ন বাক্যসংগঠন থেকে, এবং আরো দেখানো যায় যে অনেক ক্ষেত্রে সহায়ক বাক্যের 'না'-কে স্থানান্তরিত ক'রে দেয়া সম্ভব মৌল বাক্যসংগঠনে। (৯ঙ) বাক্যটি অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো যায় যে (৯ঙ)ই হচ্ছে 'গভীর' বাক্যসংগঠন, যার থেকে উৎসারিত হয়েছে (৯)-এর অন্যান্য বাক্য। (৯ঙ) বাক্যে লক্ষণীয় যে এটি একটি সরল কর্তা-কর্ম-ক্রিয়াপদসম্বলিত বাক্যের সমতুল্য। এ-বাক্যে একটি সম্পূর্ণ বাক্য ('আজ বৃষ্টি হবে না') ব্যবহৃত হয়েছে কর্মরূপে।

ওপরে (৮, ৯)-এর বাক্যগুলোর যে-অসম্পূর্ণ বর্ণনা দেয় হলো, তার সাথে সাংগঠনিক ব্যাকরণের বর্ণনার দুস্তর পার্থক্য রয়েছে। সাংগঠনিক ব্যাকরণ উপাত্তের ওপর কিছু প্রণালিপদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে আবিষ্কার করতে চায় উপাত্তের বাহ্যশৃঙ্খলা। কিন্তু ওপরের বর্ণনা প্রণালিনির্ভর নয়, তা অন্তর্দৃষ্টিনির্ভর। এ-অন্তর্দৃষ্টি আসতে পারে ভাষা সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীর পূর্বধারণা থেকে, বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্য থেকে, বা উপাত্তের ওপর কিছু প্রণালি প্রয়োগের ফলে। সাংগঠনিক ভাষাদর্শনের পরিণতি হচ্ছে প্রণালিপদ্ধতি, আর সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানের আরাধ্য হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি। তবে এ-অন্তর্দৃষ্টি ঐশী নয়, বাস্তব উপাত্ত থেকে জন্ম পায় এ-দৃষ্টি। সাংগঠনিক ভাষা-বিজ্ঞানের কামনার ধন ছিলো প্রণালিপদ্ধতি, কিন্তু রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে তা ব্যবহার করা হয় অন্তর্দৃষ্টিকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশের জন্যে। রূপান্তর ব্যাকরণেও ব্যবহৃত হয় নানাবিধ প্রণালিপদ্ধতি, কিন্তু সে-সব সাফল্যের সিঁড়ি মাত্র, সাফল্য নয়। গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যাকরণ রচনাই সৃষ্টিশীল তত্ত্বের লক্ষ্য।

১.২.৮　ভাষা-অর্জন ও ভাষিক তত্ত্ব

চমস্কি ভাষাবিজ্ঞানকে নিয়ে এসেছেন এমন স্তরে, যাতে তা হ'য়ে উঠেছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমতুল্য। বর্তমানে ব্যাকরণ, অর্থাৎ ভাষিক তত্ত্ব, অনেকাংশে পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বের তুল্য: উভয় শাস্ত্রেই অ্যাকসইঅ্যাম থেকে, সূত্রের সাহায্যে, আহরণ করা হয় অসংখ্য থিঅ্যারেম; এবং উভয় তত্ত্বেই থিঅ্যারেমকে যাচাই ক'রে নিতে হয় পর্যবেক্ষণসম্ভব উপাত্তের দ্বারা। তবে ভাষাবিজ্ঞান ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। এ-পার্থক্যের মূলে আছে উপাত্তের ভিন্নতা। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপাত্ত সাধারণত স্থানকালের উর্দ্ধে—দেশ-কাল-প্রতিবেশের প্রভাবে

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপাত্ত ভিন্নতা পায় না। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের উপাত্ত বিচিত্র : স্থান-কালবশত এ-উপাত্ত এতো, আপাতদৃষ্টিতে, স্বতন্ত্র হ'তে পারে যে ওই উপাত্তের (ভাষা) মধ্যে কোনো রকম সাদৃশ্য অনেকের চোখে নাও পড়তে পারে। পৃথিবীতে তিন হাজারেরও বেশি ভাষা রয়েছে, আর তাদের বৈচিত্র্যও কম নয়। ভাষাভাষীরা জন্মসূত্রে ভাষাবোধ সম্পন্ন হ'য়ে জন্মায় না, তাদের আয়ত্ত করতে হয় ভাষাবোধ। কোনো একটি বিশেষ ভাষার ব্যাকরণ হচ্ছে ওই ভাষার পরিণত ভাষাভাষীদের ভাষাবোধের তত্ত্ব : আর একটি সর্বজনীন ভাষিক তত্ত্ব হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাকরণ সম্পর্কিত তত্ত্ব, অর্থাৎ তত্ত্বের তত্ত্ব ('মেটাথিওরি')। তাই ভাষাভাষীরা বিভিন্ন ভাষার মুখোমুখি হ'য়ে কি-ভাবে ভাষাবোধ অর্জন করে, তা ব্যাখ্যার দায়িত্ব পড়ে সর্বজনীন ভাষিক তত্ত্বের ওপর।

চমস্কি মনে করেন যে ভাষাবিজ্ঞান উজ্জ্বল আলো ফেলতে পারে মানবমনের গঠন, ও প্রকৃতির ওপর। কি-ভাবে ভাষাবিজ্ঞান এ-আলো ফেলতে পারে, তা নির্দেশ করার জন্যে তিনি পেশ করেছেন শিশুদের ভাষা-অর্জনপ্রক্রিয়া সম্পর্কিত তত্ত্ব। শিশুরা বেশ দ্রুত ভাষা আয়ত্ত করে। ছ-সাত বছরের মধ্যে প্রতিটি শিশু শিখে ফেলে তার ভাষার প্রায়-সমস্ত শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুন। ভাষার বিপুল জটিলতাকে শিশুরা কি-ভাবে এতো অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত ক'রে ফেলে, তা পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। কোনো শিশু ছ-সাত বছরের মধ্যে যতো বাক্যসংগঠন সৃষ্টি করতে পারে, তা যদি কোনো ভাষাবিজ্ঞানী পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে চান, তবে তাঁর সারাজীবন, সম্ভবত, কেটে যাবে। যা বিশ্লেষণে দরকার হয় একজন জ্ঞানী ব্যক্তির সমগ্র জীবন, তা কি ক'রে এতো অল্প সময়ে আয়ত্ত করে একটি নির্জ্ঞান শিশু? শিশুদের ভাষা-অর্জন সম্পর্কে পেশ করা যেতে পারে তিনটি তত্ত্ব :

[ক] কোনো একটি বিশেষ ভাষার ব্যাকরণ জন্মসূত্রে পুরুষপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়।

[খ] শিশু ভাষা-অর্জনের বিশেষ শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

[গ] শিশু ভাষাগতভাবে 'শূন্যপৃষ্ঠা'—'তাবুলা রাসা'—রূপে অর্থাৎ ভাষা-অর্জনের বিশেষ কোনো শক্তি না নিয়ে আবির্ভূত হয়, এবং উপাত্তের মুখোমুখি হ'য়ে ক্রমশ আবিষ্কার করে উপাত্তের ব্যাকরণ : নিয়মকানুনশৃঙ্খলা।

প্রথম তত্ত্বটিকে ভ্রান্ত ব'লে সহজেই প্রমাণ করা সম্ভব। এ-তত্ত্বানুসারে শিশু জন্মেনের একটি বিশেষ ভাষা উত্তরাধিকারসূত্রে আয়ত্ত করার ক্ষমতা নিয়ে; তার পক্ষে পৈতৃক ভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা আয়ত্ত করা অসম্ভব। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় শিশু সে-ভাষাই আয়ত্ত করে, যে-ভাষাপ্রতিবেশে সে যাপন করে তার জীবনের প্রথম বছরগুলো। বাঙালি শিশু যদি গ্রিনল্যাণ্ডে বড়ো হয়, তবে সে আয়ত্ত করবে ওই অঞ্চলেরই ভাষা। তৃতীয় তত্ত্বটিও গ্রহণযোগ্য নয়। শিশু যদি ভাষা-অর্জনের বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে না জন্মাতো, তবে ভাষার বিপুল জটিলতাকে বশে আনতে কেটে যেতো তার জন্মজন্মান্তর। বাঙলা ভাষার ধ্বনি-শব্দ-বাক্য-গঠনের এতো বিপুল পরিমাণ সূত্র রয়েছে যে তা যদি কাউকে সচেতনভাবে বিশ্লেষণ ক'রে আয়ত্ত করতে হতো, তবে তার পক্ষে বাঙলা ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব হতো না। কিন্তু ভাষা-অর্জন কোনো কঠিন ব্যাপার নয় : যে-কোনো নির্বোধ ভাষা আয়ত্ত করতে পারে। প্রত্যেকটি মানুষকে যদি সচেতনভাবে আয়ত্ত ও আবিষ্কার করতে হতো তার ভাষার শৃঙ্খলা, অর্থাৎ ব্যাকরণ, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই থাকতো ভাষাহীন। অন্যভাবে বলা যায়, ভাষা তবে হ'য়ে উঠতো ব্যবহারঅযোগ্য, অর্থাৎ পৃথিবীতে ভাষার অস্তিত্বই থাকতো না সম্ভবত। তাই ভাষা-অর্জন সম্পর্কিত তৃতীয় তত্ত্বটিও গ্রহণঅযোগ্য।

চমস্কি গ্রহণ করেছেন দ্বিতীয় তত্ত্বটি : শিশু ভাষা-অর্জনের বিশেষ শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয় ; এবং এ-তত্ত্বটিই সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে গৃহীত। প্রতিটি মানুষ ভাষা-অর্জনের বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ভাষা-অর্জনের ওই 'বিশেষ ক্ষমতা', বা 'শক্তি' কি ? ভাষা-অর্জনের উল্লিখিত বিশেষ ক্ষমতা বা শক্তিকে মনে করা যেতে পারে এক সর্বজনীন ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্ব বা কাঠামো, যা উপাত্তকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করার প্রণালি উপহার দিতে পারে, এবং পারে তার উপাত্তের (ভাষার) সম্ভাব্য সংগঠন সম্পর্কে একরাশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। মানুষের ভাষা-অর্জনের এ-শক্তিকে, চমস্কির অনুসরণে, আমরা বলতে পারি 'ভাষা-অর্জন কল' (দ্র চমস্কি (১৯৬৪, ২৬ ; ১৯৬৫, ৩০))। শিশুর ব্যাকরণনির্মাণ প্রক্রিয়াকে দেখানো সম্ভব নিচের চিত্রের সাহায্যে :

(১০) | কোনো ভাষার উপাত্ত | → | ভাষা-অর্জন কল | → | ওই ভাষার ব্যাকরণ |

(১০)-এর চিত্রটি জানাচ্ছে যে কোনো ভাষার উপাত্ত যখন শিশুর সামনে পড়ে, তখন সে তার আন্তর ভাষা-অর্জন শক্তির ('ভাষা-অর্জন কল') সাহায্যে সহজেই ওই ভাষার ব্যাকরণ রচনা ক'রে নেয়। কিন্তু সে ওই ভাষার সম্পূর্ণ-ব্যাপক-অনুপুঙ্খ ব্যাকরণ শেখে না ;—সে শুধু ওই ভাষার সে-সমস্ত সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যই আয়ত্ত করে, যে-সব বৈশিষ্ট্য ভাষাটিকে পৃথক ক'রে রেখেছে অন্যান্য ভাষা থেকে। ভাষার যে-সব বৈশিষ্ট্য সমস্ত মানবভাষাতেই উপস্থিত, তাদের বলা হয় 'সর্বজনীন ভাষিক বৈশিষ্ট্য' (দ্র ৫ ১'২'৯)। শিশুরা সর্বজনীন ভাষিক বৈশিষ্ট্যরাশি পৃথকভাবে আয়ত্ত করে না ; কেননা ওই সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যরাশি জন্মসূত্রেই খচিত হ'য়ে আছে তার ভাষা-অর্জন কলে, বা শক্তিতে। কি কি বৈশিষ্ট্য সমস্ত মানবভাষাতেই পাওয়া যাবে, তা শিশু জন্মসূত্রেই জানে। ভাষা-অর্জনের এ-তত্ত্বকে বলা হয় 'চৈতন্যবাদী তত্ত্ব'। এ-মতের পক্ষে উপস্থিত করা যায় প্রচুর সাক্ষ্য। অন্যান্য জ্ঞান অর্জনে যেমন দরকার হয় মেধা ও বুদ্ধি, ভাষা-অর্জনের বেলায় তেমন মেধা ও চাতুর্যের দরকার হয় না ; বেশ নির্বোধ শিশুরাও ভাষা-অর্জন করে। ভাষা-অর্জনে প্রতিভা দরকার পড়ে না। তবে ভাষা বিশেষ প্রজাতির দখলে ; একমাত্র মানব-প্রজাতিই ভাষাধিকারী। মানুষের বেশ সন্নিকট প্রাণী শিম্পাঞ্জি অনেক সময় চমৎকারভাবে অনুকরণ করতে পারে মানুষের ক্রিয়াকর্ম ; কিন্তু ভাষা-অর্জনে তারা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। প্রতিটি মানবভাষাই বিপুল জটিলতার সমষ্টি। রূপান্তরবাদী সৃষ্টিশীল ব্যাকরণবিদেরা যদিও ইচ্ছা পোষণ করেন প্রতিটি ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকরণ রচনার, তবু আজো পৃথিবীর কোনো ভাষাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত হয়নি। কোনো ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার স্বপ্ন হয়তো কোনোদিনই বাস্তবায়িত হবে না। তবু প্রতিটি শিশু, জীবনের প্রথম ছ-সাত বছরের মধ্যে, তার ভাষা সম্পর্কে এতো কিছু শেখে, যা বর্ণনা করতে হ'লে প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানীদেরও কয়েক জন্ম অতিবাহিত হয়ে যাবে। তাই বিশ্বাস করতে হয় যে শিশু জন্মসূত্রেই ভাষা-অর্জন শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়।

'বিশেষ ভাষার ব্যাকরণ' (বা 'ভাষা "ভ"-র ব্যাকরণ'), এবং 'সর্বজনীন ভাষিক তত্ত্ব' কথা দুটি সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানে সাধারণত সুশৃঙ্খল দ্ব্যর্থবোধকভাবে ব্যবহার করা হয় (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ২৫))। 'বিশেষ ভাষার ব্যাকরণ', বা 'ভাষা "ভ"-র ব্যাকরণ' বলতে বোঝানো হয় ইং : (ক) "ভ" সম্পর্কে পরিণত ভাষাভাষীর আন্তর 'তত্ত্ব', এবং (খ) ভাষাবিজ্ঞানী কর্তৃক ওই তত্ত্বের উপস্থাপন। 'সর্বজনীন ভাষিক তত্ত্ব' বলতে

বোঝানো হয়. (ক) সমস্ত ভাষা সম্পর্কে শিশুর সহজাত 'তত্ত্ব'; এবং (খ) ভাষাবিজ্ঞানী কর্তৃক ওই তত্ত্বের উপস্থাপন। তাই সর্বজনীন ভাষিক তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা ভাষা-অর্জনের পেছনে ক্রিয়াশীল মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপকৌশলের আলোচনাও বটে। তবে ভাষা-অর্জনকৌশল 'মনোভাষাবিজ্ঞান'-এর অন্তর্গত ব'লে এখানে সে-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই (দ্র গ্রিন (১৯৭২))।

সর্বজনীন ভাষিক তত্ত্বের কাঠামোর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপে নির্দেশ করা সম্ভব:

[ক] এ-তত্ত্ব ভাষার ধ্বনিরাশির ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপ নির্দেশ করবে। অর্থাৎ এ-তত্ত্বে একটি সাধারণ ধ্বনিতাত্ত্বিক তত্ত্ব থাকবে, যা মানবভাষার সম্ভাব্য বাক্য-সমূহ নির্দেশ করবে।

[খ] এ-তত্ত্বকে অবশ্যই 'সাংগঠনিক বর্ণনা' ধারণাটির সংজ্ঞা দিতে হবে। সাংগঠনিক বর্ণনা ভাষার ধ্বনি ও অর্থের অন্বয়কৌশল সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

[গ] এ-তত্ত্বকে অবশ্যই 'সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ'-এর সংজ্ঞা দিতে হবে; এবং মানব-ভাষার প্রকৃতি অনুসারে সম্ভাব্য সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের সীমা নির্দেশ করতে হবে।

[ঘ] ব্যাকরণ কর্তৃক সৃষ্ট সমস্ত বাক্যের স্বয়ংক্রিয় সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়ার শক্তি এ-তত্ত্বের থাকতে হবে।

[ঙ] এ-তত্ত্বকে মূল্যায়নপ্রণালিসম্পন্ন হ'তে হবে; অর্থাৎ একাধিক প্রতিযোগী ব্যাকরণের মধ্যে কোনটি উন্নততর, তা নির্দেশের শক্তি থাকতে হবে এ-তত্ত্বের।

১'২'৭ **ভাষা-সর্বজনীনতা**

'ব্যাখ্যাত্মক যোগ্যতা'-অভিলাষী (দ্র Φ ১'২'৪) ভাষিক তত্ত্ব 'ভাষিক সর্বজনীনতা'য় আস্থাশীল হ'তে বাধ্য। সৃষ্টিশীল ভাষিক তত্ত্ব ব্যাখ্যাত্মক যোগ্যতাকামী, তাই তা বিশ্বাস করে ভাষিক সর্বজনীনতায়, অর্থাৎ সে-সব বৈশিষ্ট্যে, যা সমস্ত পার্থিব মানবভাষায় উপস্থিত থাকতে বাধ্য। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ বিশ্বাস করে যে শিশুরা মানবভাষার সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সহজাত জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৪৭-৫৯))। শিশু যখন কোনো বিশেষ ভাষার মুখোমুখি হয়, তখন তাকে ওই ভাষা সম্পর্কে সব কিছু সচেতনভাবে শিখতে হয় না। কেননা ভাষার সর্বজনীন চারিত্র্য সম্পর্কে জ্ঞান নিয়েই সে জন্ম নেয়; সুতরাং কোনো একটি বিশেষ ভাষা অর্জনের সময় সে ওই ভাষার সে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যই সচেতনভাবে আয়ত্ত করে, যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি ওই ভাষাটিকে অন্যান্য ভাষা থেকে স্বতন্ত্র ক'রে রেখেছে। যদি ভাষা-আয়ত্তের প্রণালি এমন না হতো, তবে ভাষা-অর্জন অসম্ভব হতো। সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞান এ-তত্ত্বে বিশ্বাসী ব'লে তা বিশ্বের সমস্ত ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারে উৎসাহী। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান মনোযোগ দিয়েছিলো বিভিন্ন ভাষার পর্যবেক্ষণসম্ভব উপাত্তে, তাই সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন বিশ্বের ভাষারাশির অপার বৈচিত্র্য ও বৈসাদৃশ্য। বোয়াস-ব্লুমফিল্ড ও অন্যান্য সাংগঠনিক বৈসাদৃশ্যই পার্থিব ভাষাসমূহের একমাত্র সাদৃশ্য—এমন ধারণা পোষণ করতেন। ভাষার বহিরঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যে

তাঁরা লক্ষ্য করেছেন বিভিন্ন ভাষার ধ্বনিসংগঠনে বৈসাদৃশ্য। ইংরেজির সাথে মিল নেই বাঙলার, বাঙলার সাথে মিল নেই জাপানির ইত্যাদি। সাংগঠনিকদের বলা যায় ভেদবাদী ও স্বাতন্ত্র্যবাদী ; বাহ্যিক শাদা-কালো দ্বারা তাঁরা এতো সম্মোহিত ও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন যে সর্বজনীন আভ্যন্তর লাল রঙটি তাঁদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিলো। সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্যবাদ ও ভেদবাদের পর সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানীরা পেশ করেন সম্মিলন ও সর্বজনীনতার তত্ত্ব। তাঁরা ভাষার আপাতবৈষম্যরাশিকে অতিক্রম ক'রে সমস্ত ভাষার আভ্যন্তর ও আন্তর সাদৃশ্য আবিষ্কারে অভিলাষী।

মানবভাষায় সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। চমস্কি (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ২৭-৩০)) ভাষার দু'রকম সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন : (ক) 'বিষয়গত সর্বজনীনতা' ('সাবস্টেনটিভ ইউনিভ্যারসাল') ; এবং (খ) 'রূপগত, বা সূত্রগত সর্বজনীনতা' ('ফর্মাল ইউনিভ্যারসাল')। বিষয়গত, ও রূপগত সর্বজনীনতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

[ক] **বিষয়গত সর্বজনীনতা :** প্রত্যেক মানবভাষায় রয়েছে কিছু পরিমাণে ধ্বনি, শব্দ এবং প্রত্যেক ভাষায়ই, সম্ভবত, পাওয়া যাবে বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিশেষণ প্রভৃতি পদ। সমস্ত ভাষায় বিবৃতি দেয়ার, এবং প্রশ্ন ও আদেশ করার উপায় রয়েছে। ভাষার বিষয়গত সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যরাশি 'বিষয়গত সর্বজনীনতা'র অন্তর্গত। শিশু এ-সব বিষয়ের জ্ঞান জন্মসূত্রেই লাভ করে। সে যখন কোনো বিশেষ ভাষা আয়ত্ত করতে চায়, তখন সে শুধু শিখে নেয় ওই বিশেষ ভাষার একান্ত আপন বৈশিষ্ট্যপুঞ্জ। 'বিষয়গত সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য'-তত্ত্বানুসারে বিশেষবিশেষ ভাষা এক সর্বজনীন ভাণ্ডার থেকে গ্রহণ করে তার ভাষাবস্তুরাশি। ব্যাপারটি, ধ্বনিতত্ত্বের উদাহরণের সাহায্যে, ব্যাখ্যা করা যাক। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান পৃথিবীর সব ভাষায় নিজস্ব ধ্বনিমূলের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তবে এক ভাষার ধ্বনিমূলের সাথে অন্য ভাষার ধ্বনিমূলের সাদৃশ্যকে প্রায় অস্বীকার করে। কিন্তু পৃথিবীর ভাষাসমূহ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কোটিকোটি ধ্বনিমূল নেই ; সীমিত সংখ্যক ধ্বনিই নানাভাবে বিন্যস্ত হয় বিভিন্ন ভাষায়। মানবভাষার যতো ধ্বনি(মূল) আছে, তার সবগুলো একত্রে কোনো ভাষাই ব্যবহার করে না। কিছু পরিমাণে ধ্বনি ব্যবহৃত হয় বিশেষ কোনো ভাষায়, আবার বিশেষ কিছু ধ্বনি ব্যবহৃত হয় অন্য ভাষায়। রোমান ইয়াকবসন ধ্বনিমূল ভেঙে আবিষ্কার করেন ধ্বনির 'স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য'। তাঁর 'স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য'কে বিবেচনা করা যেতে পারে ভাষার বিষয়গত সর্বজনীনতার নিদর্শন ব'লে। সমস্ত মানবভাষায় যতো ধ্বনি-(মূল) ব্যবহৃত হয়, তাদের 'স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য' খুব বেশি নয়। কুড়িটির মতো স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন বিন্যাসে গ'ড়ে উঠেছে মানবভাষার ধ্বনি (মূল)-পুঞ্জ। এ-বৈশিষ্ট্যসমূহের সবগুলো কোনো ভাষাই ব্যবহার করে না, এবং কোনো ভাষাই সবগুলো বৈশিষ্টকে 'তাৎপর্যপূর্ণ' ব'লে মনে করে না। এ-বৈশিষ্ট্যরাশি সর্বজনীন। উদাহরণস্বরূপ 'ঘোষতা'/'অঘোষতা', ও 'মহাপ্রাণতা' / 'অল্পপ্রাণতা' বৈশিষ্ট্যগুলোকে নেয়া যাক। বাঙলা ভাষায় ঘোষতা-অঘোষতাবশত পৃথক /খ/, ও /ঘ/, এবং মহাপ্রাণতা-অল্পপ্রাণতাবশত পৃথক /ক/ ও /খ/। বাঙলা ভাষায় ঘোষতা ও মহাপ্রাণতা স্বাতন্ত্রিক। ইংরেজিতে /পি/ ও /বি/ ঘোষতার জন্যে পৃথক ধ্বনি ; কিন্তু ইংরেজিতে মহাপ্রাণতা-অল্পপ্রাণতাবশত কোনো স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হয় না। তাই ইংরেজিতে ঘোষতা তাৎপর্যপূর্ণ, ও স্বাতন্ত্রিক; কিন্তু মহাপ্রাণতা তাৎপর্যশূণ্য। তাই মনে করতে পারি যে মানবভাষারাশির জন্যে এক সর্বজনীন স্বাতন্ত্রিক ধ্বনিবৈশিষ্ট্যভাণ্ডার রয়েছে, যা থেকে বিভিন্ন ভাষা

নিজের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ সংগ্রহ করে। স্থূল দৃষ্টিতে সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা অসম্ভব, এর জন্যে চাই গভীর দৃষ্টি। ভাষার বিষয়গত সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যসমূহ কোনো ভাষাতেই একত্রে জড়ো হয় না। যে-সব ভাষা অভিন্ন বৈশিষ্ট্য সংগ্রহ করে, তাদের মধ্যে সাদৃশ্য গভীর, আর যে-সব ভাষা ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সংগ্রহ করে, তাদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

[খ] **রূপগত, বা সূত্রগত সর্বজনীনতা :** বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণে নানারকম সূত্র প্রযুক্ত হয়, এবং একটু মনোযোগ দিলে ওই সূত্রপ্রয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে নানা রকম সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ভাষার জন্যে দরকারী সূত্ররাশির চারিত্র্যগত সর্বজনীনতাকে চমস্কি বলেন 'রূপগত/সূত্রগত সর্বজনীনতা' (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ২৯))। দেখা গেছে যে পৃথিবীর সব ভাষায়ই 'রূপান্তর' ক্রিয়াশীল, এবং সব ভাষায়ই সূত্র প্রয়োগের জন্যে পূরণ করতে হয় কিছু-না-কিছু শর্ত। এ-সব রূপগত সর্বজনীনতার অন্তর্গত। রূপান্তর ব্যাকরণে ব্যবহৃত হয় নানাবিধ প্রতীক। যেমন : তীরচিহ্ন (→) ব্যবহৃত হয় পুনর্লিখন নির্দেশের জন্যে, প্রথম বন্ধনি (( )) ব্যবহৃত হয় ঐচ্ছিকতা নির্দেশের জন্যে (দ্র Φ ১'৩'৩)। এ-সব প্রতীক রূপগত সর্বজনীনতার অন্তর্গত।

ভাষার সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য ভাষার বহিরঙ্গ নির্ভর ক'রে নির্ণয় করা কঠিন। সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানী বিচিত্র ভাষা-উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ক'রে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই শনাক্ত করতে পারেন এ-সব বৈশিষ্ট্য। উপাত্ত নাড়াচাড়া করলেই সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যরাশি চোখের সামনে ঝকমক ক'রে উঠবে না। ভাষার সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যরাশি কি নির্দেশ করে? এর উত্তরে উদ্ধার করছি চমস্কির সিদ্ধান্ত (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৩০)) : 'সুগভীর এসব রূপগত সর্বজনীনতার উপস্থিতি নির্দেশ করে যে সমস্ত ভাষাই সমরূপী বিন্যাসে ন্যস্ত; কিন্তু এতে এ-কথা মনে করা উচিত নয় যে সমস্ত ভাষা অঙ্গেঅঙ্গে সদৃশ, বা সমতুল্য।'

১'৩ রূপান্তর ব্যাকরণের প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য

বাক্যের গঠনপ্রণালি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করার জন্যে, এবং সুস্পষ্ট সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়ার জন্যে রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে নানা রকম চিত্র ও প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এসব ব্যবহৃত হয় গাণিতিক প্রণালিতে, অর্থাৎ এসব ব্যবহারের অবিচল বিধান রয়েছে : ব্যাকরণভেদে এদের তাৎপর্যের ভিন্নতা ঘটে না। রূপান্তর ব্যাকরণ বোঝার জন্যে, এবং রূপান্তর ব্যাকরণ রচনার জন্যে এসব চিত্র ও প্রতীকের ব্যবহার-বিধি নির্ভুলভাবে জেনে নেয়া দরকার। পরবর্তী কয়েকটি পরিচ্ছেদাংশে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো (দ্র Φ ১'৩'১, ১'৩'২; ১.৩.৩)।

১.৩.১ বৃক্ষচিত্র/পদচিত্র

সাংগঠনিক অব্যবহিত-উপাদান প্রণালিতে বাক্যবর্ণনার সময় সমগ্র বাক্যটিকে প্রথমে দ্বিখণ্ডিত করা হয়, এবং পরে খণ্ডিত অংশ দুটিকে পৌনপুনিকভাবে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। খণ্ডনযজ্ঞ শেষ হয় তখনি, যখন আর খণ্ডনের কোনো উপায় থাকে না। মনে করা যাক —'ক' একটি বাক্য; এবং একে প্রথমে 'খ' ও 'গ' দু'খণ্ডে ভাগ করা হলো। পরে 'খ'-কে 'চ' ও 'ছ'; এবং 'গ'-কে 'জ', ও 'ঝ' দু'খণ্ডে ভাগ করা হলো। মনে করা যাক যে এর পরে আর দ্বিখণ্ডন সম্ভব নয়; কেননা 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ' হচ্ছে

অবিভাজ্য শব্দ। আর এ-শব্দগুলো হচ্ছে, যথাক্রমে, 'অ', 'আ', 'ই', 'ঈ'। 'ক'-বাক্যটি খণ্ডনের প্রণালিকে উপস্থাপিত করা যায় (১১)-র 'বৃক্ষচিত্র'-এ, বা 'পদচিত্র'-এ :

(১১)

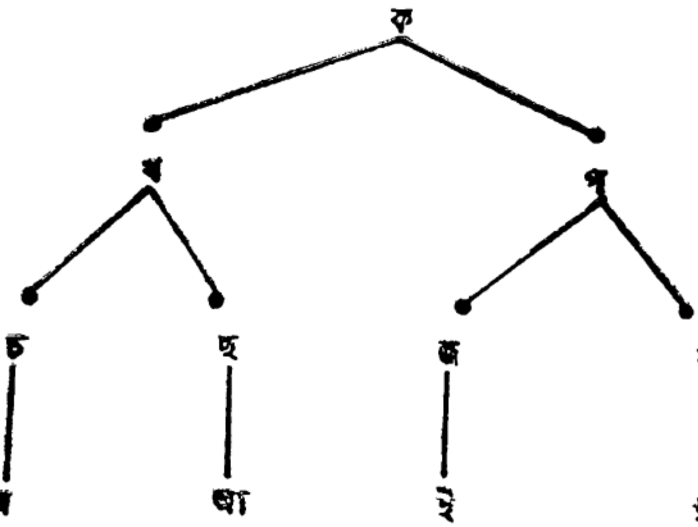

(১১)-র বিন্দুচিহ্নগুলোকে (·) বলা হয় 'বৃন্ত' (নোড'), এবং প্রতিটি বৃন্তের সাথের ব্যঞ্জনবর্ণ হচ্ছে 'বৃন্তনাম' ('নোড লেবেল')। চিত্রের স্বরবর্ণসমূহ নির্দেশ করছে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহকে। চিত্রের উচ্চ ও নিম্ন বৃন্তের মধ্যে 'আধিপত্য'-র সম্পর্ক বিদ্যমান, অর্থাৎ ওপরের বৃন্তটি আধিপত্য করে নিচের বৃন্তটির ওপর, এবং উল্টোভাবে, নিচের বৃন্তটি ওপরের বৃন্তের 'অধীন'। 'আধিপত্য' দু'রকম হতে পারে : তা হ'তে পারে 'প্রত্যক্ষ', বা 'অব্যবহিত'; আবার তা হ'তে পারে 'পরোক্ষ', বা 'অনব্যবহিত'। (১১)-তে 'ক' অব্যবহিতভাবে আধিপত্য করছে 'খ', ও 'গ'-র ওপর : আর পরোক্ষ-ভাবে আধিপত্য করছে অন্যান্য বৃন্তের ওপর। 'খ' ও 'গ' অব্যবহিতভাবে আধিপত্য করছে যথাক্রমে 'চ-ছ', ও 'জ-ঝ'-র ওপর। 'খ' পরোক্ষভাবে আধিপত্য করছে 'অ-আ'-র ওপর; এবং 'গ' পরোক্ষভাবে আধিপত্য করছে 'ই-ঈ'-র ওপর। লক্ষণীয় যে 'খ' ও 'গ'-র মধ্যে কোনো আধিপত্যর সম্পর্ক নেই, তেমনি নেই 'চ-ছ-জ-ঝ', এবং 'অ-আ-ই-ঈ'-র মধ্যে। চিত্রটির নিচ দিকের বৃন্ত থেকে যদি ক্রমশ যাই ওপরের দিকে, তবে দেখি যে নিচের বৃন্তের সাথে ওপরের বৃন্তের 'হচ্ছে'-র সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ 'অ' হচ্ছে 'চ'; আর 'আ' হচ্ছে 'ছ'; এবং 'চ+ছ' হচ্ছে 'খ'। আবার 'ই' হচ্ছে 'জ'; আর 'ঈ' হচ্ছে 'ঝ'; এবং 'জ+ঝ' হচ্ছে 'গ'। 'খ+গ' হচ্ছে 'ক'। এ-ছাড়াও চিত্রটি নির্দেশ করছে 'আগে-পিছে'-র সম্পর্ক : চিত্রের বাঁ-দিকের বস্তুকে ধরা হয় ডান-দিকের বস্তুর আগে অবস্থিত ব'লে, এবং ডান-দিকের বস্তুকে ধরা হয় বাঁ-দিকের বস্তুর পরে/পেছনে অবস্থিত ব'লে। 'খ' অবস্থিত 'গ'-র আগে, 'চ' অবস্থিত 'ছ'-র আগে ইত্যাদি। রূপান্তর ব্যাকরণেই এমন চিত্র প্রথম ব্যবহৃত হয়। (১১)-র চিত্রটির প্রচলিত নাম 'বৃক্ষচিত্র' (কালানুক্রমিক ভাষাতত্ত্বের বংশলতিকাচিত্রের সাথে, এবং সাংগঠনিক ব্যাকরণের অব্যবহিত-উপাদান নির্দেশক চিত্রের সাথে এর পার্থক্য মৌলিক)। চমস্কি এ-চিত্রের নাম দিয়েছেন 'পদচিত্র' ('ফ্রেজ মার্কার'), এবং এ-নামটিই রূপান্তর ব্যাকরণে অধিক ব্যবহার করা হয়। পদচিত্র বাক্যের সাংগঠনিক রূপ সুস্পষ্ট-ভাবে তুলে ধরে। বাক্যের গঠনকৌশল 'ব্যুৎপত্তি'-র (দ্র Φ ১·৪) সাহায্যেও দেখানো হয়। তবে ব্যুৎপত্তিতে বিভিন্ন সূত্রের প্রয়োগ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখানো হয় ব'লে তা বেশ জটিল; এবং এ-জন্যে ব্যুৎপত্তিকে সাধারণত পরিহার করা হয়।

১.৩.২ গ্রন্থি ও সূত্র

গ্রন্থি : এক বা একাধিক শব্দপ্রতীকের সংযুক্ত, গ্রথিত বা শৃঙ্খলিত রূপকে বলা হয় 'গ্রন্থি' (স্ট্রিং)। (১২)-র (ক, খ, গ) গ্রন্থির উদাহরণ (দ্র কৌটসৌডাস (১৯৬৬, ৫-৬)) :

(১২) ক বিশেষ্যপদ + ক্রিয়াপদ

খ আমি + বিশেষ্যপদ + ক্রিয়ারূপ

গ আমি + তোমাকে + চিনি

পদসাংগঠনিক সূত্রের সাহায্যে সৃষ্টি করা হয় গ্রন্থি। পদসাংগঠনিক সূত্রের প্রথম গ্রন্থিটি গঠিত হয় একটি মাত্র শব্দপ্রতীকে : প্রতীকটি হচ্ছে "বা" (বাক্য)। প্রথম গ্রন্থটিকে ('বা') বলা হয় 'আদিগ্রন্থি'। আদিগ্রন্থির দু'পাশে ব্যবহার করা হয় বাক্যের 'সীমাচিহ্ন' (≠)। মনে করা যাক, আদিগ্রন্থি হচ্ছে 'বা', তবে আদিগ্রন্থিটিকে নির্দেশ করা হবে ≠ বা ≠ রূপে। এ-গ্রন্থটি ব্যাকরণের প্রথম সূত্রের আগে উপস্থিত থাকে। বাক্যের সীমাচিহ্নরূপে সাধারণত ব্যবহৃত হয় দ্বৈত-ক্রসচিহ্ন (≠ বা ≠)। সীমাচিহ্ন নির্দেশ করে যে ব্যাকরণের সূত্রসমূহ বাক্যের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রযোজ্য। ব্যাকরণের সমস্ত সূত্র প্রয়োগের ফলে ব্যুৎপত্তির অন্তাংশে যে-গ্রন্থিটি পাওয়া যায়, তার নাম 'অন্তগ্রন্থি'। আদি ও অন্ত গ্রন্থির মধ্যবর্তী গ্রন্থিগুলোকে 'মধ্যগ্রন্থি' বলা হয়।

সূত্র : সূত্র দু'রকমের : (ক) পদসাংগঠনিক সূত্র, ও (খ) রূপান্তর(মূলক) সূত্র। পদসাংগঠনিক সূত্র প্রযুক্ত হয় রূপান্তর ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক কক্ষে, এবং রূপান্তর সূত্র ব্যবহৃত হয় রূপান্তর-কক্ষে। পদসাংগঠনিক সূত্রকে বলা হয় 'পুনর্লিখন সূত্র'।

[ক] **পদসাংগঠনিক সূত্র** : পদসাংগঠনিক সূত্ররাশি পুনর্লিখন সূত্র। পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্র হচ্ছে একরকম নির্দেশ, যা কোনো প্রতীক, বা গ্রন্থিকে অন্য একটি প্রতীক, বা গ্রন্থিরূপে পুনরায় লেখার সংকেত দেয়। যদি আমরা 'ক'-কে মনে করি 'খ'; এবং 'খ'-কে মনে করি 'গ + ঘ', তবে এ-ব্যাপারটিকে (১৩)-র পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারি :

(১৩) ক ক → খ

খ খ → গ + ঘ

(১৩)-তে ব্যবহৃত তীরটি (→) হচ্ছে পুনর্লিখন-প্রতীক; এটি এর বাঁ-দিকের প্রতীক, বা গ্রন্থিকে ডান-দিকের প্রতীক, বা গ্রন্থিরূপে পুনর্লিখনের নির্দেশ দেয়। পুনর্লিখন সূত্র ব্যবহার করা হয় বাক্য, বা যে-কোনো ভাষাবস্তুর আন্তর সংগঠন বর্ণনার জন্যে। যেমন : 'বালকেরা' শব্দের আন্তর সংগঠন (১৪)-র পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারি :

(১৪) ক বিশেষ্যপদ → বিশেষ্য + বহুবচন

খ বিশেষ্য → বালক

গ বহুবচন → এরা

(১৪)-র সূত্র তিনটির ক্রমিক প্রয়োগে সৃষ্ট হবে 'বালকেরা' শব্দটি।

পদসাংগঠনিক সূত্র বাক্যের পদসংগঠন নির্দেশ করে : এ-সূত্র জানিয়ে দেয় বাক্যের গঠন প্রকৃতি কি, কি রকম পদগনবায়ে বাক্যটি গঠিত, এবং বাক্যটি গঠনে কোন শব্দাবলি অংশ নিয়েছে। এ-গুলো সরল গ্রন্থিপরিবর্তনকারী সূত্র : এ-সূত্র একটি গ্রন্থির বদলে আরেকটি গ্রন্থি ব্যবহারের নির্দেশ দেয়, বা একটি গ্রন্থিকে অন্য একটি গ্রন্থিরূপে সম্প্রসারিত করার সংকেত দেয়। এ-সূত্র এমনভাবে রচনা করতে হয়, যাতে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাক্যের 'পদচিত্র' রচনা করতে পারে। পদসাংগঠনিক সূত্র রচনার কতিপয় বিধি রয়েছে। বিধিসমূহের কয়েকটি :

(ক·১) একটি সূত্রের সাহায্যে মাত্র একটি প্রতীককেই সম্প্রসারিত, বা বদল করতে হবে। তাই (ক) ক → খ; ও (খ) ক → খ+গ রকমের সূত্র রচনা করা যাবে, কিন্তু (গ) ক + খ → গ রকমের সূত্র রচনা করা যাবে না। প্রথম সূত্র দুটি গ্রহণযোগ্য সংগঠন সৃষ্টি করে, এবং তৃতীয় সূত্রটি রচনা করে গ্রহণঅযোগ্য সংগঠন। সূত্র তিনটি নিম্নরূপ সংগঠন সৃষ্টি করবে :

(১৫) ক

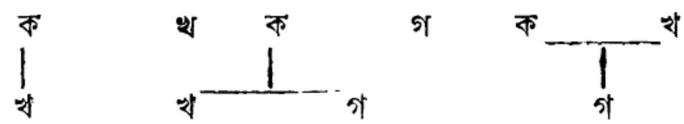

(ক·২) যে-সব প্রতীককেই সম্প্রসারিত করা, বা পুনর্লিখিত করা চলবে, যারা কোনো-না-কোনো সূত্রে তীরের ডান পাশে উপস্থিত (শুধু আদিপ্রতীকটি এর ব্যতিক্রম)। অর্থাৎ পুনর্লিখনের ফলে উদ্ভূত প্রতীকেরই পুনর্লিখন সম্ভব। (১৬)-র সূত্রগুলো লক্ষণীয় :

(১৬) ক ক → খ + গ

খ খ → চ + জ

গ গ → ট + ঠ

ঘ ম → ত + থ

(১৬)-র খণ্ডিত ব্যাকরণটিতে (১৬ ক) সূত্রের 'ক' হচ্ছে আদিপ্রতীক, তাই এটি অন্য কোনো সূত্রপ্রয়োগে উদ্ভূত হয় নি। (১৬ খ, গ) সূত্রে তীরের বাঁ-দিকে যে-সব প্রতীক আছে, সে-গুলো পূর্বে প্রযুক্ত কোনো সূত্রের ফলে সৃষ্ট হয়েছে। এ-দুটি বিধিসম্মত সূত্র। কিন্তু (১৬ ঘ) সূত্রটি বিধিবিরুদ্ধ, কেননা এটিতে এমন একটি প্রতীককে (ম) সম্প্রসারিত করা হয়েছে, যেটি স্বয়ম্ভূ; এটি আগের কোনো সূত্রের প্রয়োগে উদ্ভূত হয় নি। (১৬)-র সূত্রগুলোকে পদচিত্রে উপস্থাপন করতে গেলে (১৬ ঘ) সূত্রে এসে সাংগঠনিক বিপর্যয় দেখা দেবে :

(১৭)

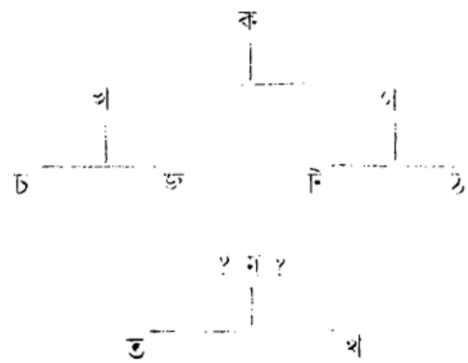

(ক·৩) কোনো 'শূন্য-প্রতীক' দ্বারা কোনো প্রতীককে সম্প্রসারিত করা যাবে না। যেমন : ক → খ সূত্র রচনা করা যাবে না, যদি 'খ' শূন্য হয় (কোনো গ্রন্থি নির্দেশ না করে)। এ-সূত্রটির তাৎপর্য হচ্ছে যে পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে কোনো প্রতীক, বা গ্রন্থি বর্জন করা যাবে না। বর্জনের শক্তি আছে রূপান্তরসূত্রের, পদসাংগঠনিক সূত্রের সে-শক্তি নেই।

(ক·৪) পুনর্লিখিত গ্রন্থি অবশ্যই মূল গ্রন্থি থেকে ভিন্ন হবে। অর্থাৎ ক → ক জাতীয় সূত্র থাকতে পারবে না। এ-বিধিটির রূপান্তর ব্যাকরণের উদ্ভবকালের বিধি। রূপান্তর ব্যাকরণের সম্প্রসারণের সাথেসাথে এ-বিধিটিও সংশোধিত হয়েছে। সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক সূত্র কোনো প্রতীক, বা গ্রন্থিকে অভিন্ন প্রতীক, বা গ্রন্থিরূপে সম্প্রসারিত করতে পারে। ''সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস''-কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণে 'পৌনপুনিক সূত্র' ছিলো না, কিন্তু ''আস্পেক্টস''-কাঠামোর ব্যাকরণে পৌনপুনিক সূত্র গৃহীত হয় এবং এ-বিধিটিকে শিথিল করা হয়। বর্তমানে সীমিত পরিমাণে (ক) ক → ক + খ ; (খ) ক → খ + ক ; এবং (গ) ক → খ + ক + গ জাতীয় পৌনপুনিক সূত্র ব্যবহার করা হয় (দ্র ৫ ১·২·৬)। ওপরের সূত্র তিনটি যথাক্রমে (১৮ ক, খ, গ)রূপী সংগঠন সৃষ্টি করবে :

(১৮)

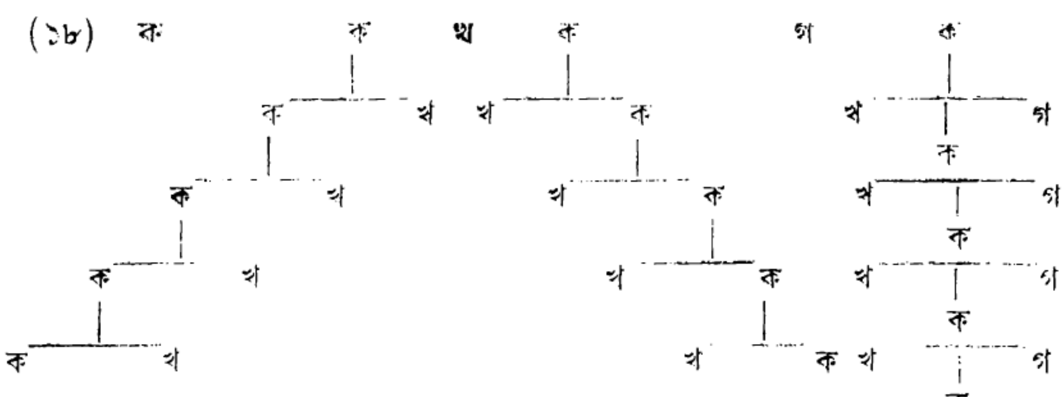

(ক·৫) যদি কোনো সূত্র কোনো প্রতীককে 'খ + গ'-রূপে সম্প্রসারিত করে, তবে পরে এমন কোনো সূত্র থাকতে পারবে না যা 'খ'-কে সম্প্রসারিত করে 'গ'-রূপে, এবং 'গ'-কে সম্প্রসারিত করে 'খ'-রূপে। (১৯)-এর সূত্ররাশি লক্ষণীয় :

(১৯) ক ক → খ + গ
      খ খ → গ
      গ গ → খ

(১৯ক, খ, গ) সূত্রের প্রয়োগে পাওয়া যাবে (২০)-পদচিত্রটি

(২০)

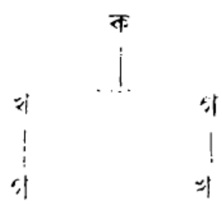

(১৯ খ, গ) সূত্র প্রয়োগের ফলে পদচিত্রের 'খ', ও 'গ' বৃন্ত দুটি পরস্পর স্থান-বদল করে। স্থান বদল করার ক্ষমতা পদসাংগঠনিক সূত্রের নেই; এ-ক্ষমতা আছে শুধু রূপান্তরসূত্রের।

(ক'৬) **'প্রতিবেশমুক্ত' ও 'প্রতিবেশকাতর' পদসাংগঠনিক সূত্র** : পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্র দু'প্রকৃতির হ'তে পারে (দ্র ক ১'৪'১) : (ক) **প্রতিবেশমুক্ত সূত্র**, ও (খ) **প্রতিবেশকাতর সূত্র**। যে-সমস্ত পদসাংগঠনিক সূত্রে কোনো প্রতিবেশগত শর্ত আরোপ করা হয় না, তাদের বলা হয় 'প্রতিবেশমুক্ত সূত্র'; এবং যে-সমস্ত সূত্রে প্রতিবেশগত শর্ত আরোপ করা হয়, তাদের বলা হয় 'প্রতিবেশকাতর সূত্র'। মনে করা যাক যে 'ক' গ্রন্থিটিকে সর্বদাই 'খ'-রূপে সম্প্রসারিত করা সম্ভব; তবে পাওয়া যাবে ক → খ সূত্রটি। এ-সূত্রে প্রতিবেশগত কোনো শর্ত নেই, তাই এটি প্রতিবেশমুক্ত। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে বিশেষ একটি প্রতীককে বিশেষ শর্তসাপেক্ষেই অন্য একটি প্রতীকরূপে সম্প্রসারিত করা যায়। এ-রকম সম্প্রসারণ নির্দেশের জন্যে সূত্রে শর্ত আরোপ করতে হয়। মনে করা যাক যে 'ক'-কে 'খ'-রূপে তখনি সম্প্রসারণ করা সম্ভব, যখন 'ক'-র ডানে 'গ' থাকে। এ-ব্যাপারটি নির্দেশ করা সম্ভব শুধু প্রতিবেশকাতর, বা প্রতিবেশনিয়ন্ত্রিত সূত্রের সাহায্যে।

তিন রকম সমতুল্য প্রণালিতে প্রতিবেশকাতরতা দেখানো সম্ভব। প্রতিটি প্রণালিরই নির্দেশ হচ্ছে : 'ক'-কে নির্দেশিত প্রতিবেশে 'খ'-রূপে সম্প্রসারিত করুন'। নিচের প্রতিবেশকাতর সূত্রগুলো (এরা সমতুল্য, অর্থাৎ একই নির্দেশ দিচ্ছে) লক্ষণীয় :

(২১) ক ঙ ক ঙ → ঙ খ ঙ
      খ ক → খ 'ঙ—ঙ' প্রতিবেশে
      গ ক → খ / ঙ—ঙ

(২১)-এর প্রতিটি সূত্র একই নির্দেশ দিচ্ছে : নির্দেশটি হচ্ছে 'ক'-কে 'ঙ—ঙ' প্রতিবেশে 'খ'-রূপে সম্প্রসারিত করুন।' 'ঙ—ঙ' প্রতিবেশের অর্থ হচ্ছে 'ক'-এর বাঁয়ে-ডানে উভয় দিকেই আছে 'ঙ'। প্রতিবেশকাতর

সূত্ররচনায় বর্তমানে (২১গ) প্রণালিটিই শুধু ব্যবহৃত হয়। প্রতিবেশকাতর সূত্রে সম্প্রসারণীয় প্রতীকের ডানের অথবা বাঁয়ের, অথবা একসঙ্গে উভয় দিকের প্রতিবেশগত শর্ত নির্দেশ করা সম্ভব। (২১)-এর সূত্রগুলোতে ডান ও বাঁ প্রতিবেশ নির্দেশ করা হয়েছে। নিচের সূত্র দুটি লক্ষণীয়:

(২২) ক → খ / ঙ—
ক → খ / —ঙ

(২২ক) সূত্রটি নির্দেশ করছে যে যদি 'ক'-র বাঁয়ে 'ঙ' থাকে, তবে 'ক'-কে 'খ'-রূপে সম্প্রসারিত করতে হবে, এবং (২২খ) সূত্রটি নির্দেশ করছে যে যদি 'ক'-র ডানে 'ঙ' থাকে, তবে 'ক'-কে 'খ'-রূপে সম্প্রসারিত করতে হবে।

প্রতিবেশকাতর সূত্র সাধারণত ব্যবহার করা হয় একই গ্রন্থি, বা প্রতীকের বিকল্প সম্প্রসারণ নির্দেশের জন্যে। মনে করা যাক 'ক'-র দু'রকম সম্প্রসারণ সম্ভব: (ক) 'ক'-কে 'খ'-রূপে সম্প্রসারিত করা যায় যখন 'ক'-র বাঁয়ে 'ঙ' থাকে; এবং (খ) অন্যসব প্রতিবেশে 'ক'-কে সম্প্রসারিত করা যায় 'গ' রূপে। এ সূত্র দুটিকে প্রকাশ করা যায় (২৩)-এর একটি মাত্র সূত্রে:

(২৩) ক → { খ / ঙ— ; গ }

এ-সূত্রে 'ক'-র দু'রকম সম্প্রসারণ নির্দেশ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমে নির্দেশ করা হয়েছে শর্তসাপেক্ষ সম্প্রসারণটি, এবং পরে দেখানো হয়েছে শর্তরহিত সম্প্রসারণটি। (২৩) সূত্রটির নির্দেশ হচ্ছে: ''ক'-কে 'ঙ-—' প্রতিবেশে 'খ' রূপে এবং অন্যত্র 'গ'-রূপে সম্প্রসারিত করতে হবে।' যদি এমন হতো যে 'ক'-কে 'ঙ—' প্রতিবেশে 'খ'-রূপে শুধু সম্প্রসারণ করা সম্ভব, এবং অন্যত্র 'গ', বা 'ঘ', বা 'চ' রূপে সম্প্রসারণ করা সম্ভব, তবে সূত্রটি হতো নিম্নরূপ:

(২৪) ক → { খ/ঙ— ; গ ; ঘ ; চ }

পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্র অব্যবহিত-উপাদান রীতিরই সুশৃঙ্খল গাণিতিক রূপায়ন। এ-সূত্ররাশি 'ক্রমবিন্যস্ত' (যে-ক্রমে সূত্র রাশি বিন্যস্ত, সে-ক্রম-অনুসারে তাদের প্রয়োগ করতে হবে) হ'তে পারে, এবং 'ক্রমহীন' (সূত্রপ্রয়োগের সময় কোনো ক্রম মানার দরকার নেই) হ'তে পারে। 'ক্রমবিন্যাস' হতে পারে দু'রকমের: (ক) 'আন্তর ক্রমবিন্যাস', এবং (খ) 'বাহ্যিক ক্রমবিন্যাস (দ্র Φ ১. ৪. ৩)। সাংগঠনিক সূত্ররাশি রচিত হওয়ার সময় নিজেরাই নিজেদের ওপর একরকম ক্রম আরোপ করে: যেমন—কোনো একটি প্রতীক সম্প্রসারণের সূত্র প্রযুক্ত হ'তে পারে না, যদি না তার আগে প্রযুক্ত হয় সে-সূত্রটি, যে-টির প্রয়োগে উদ্ভূত হয়েছে সম্প্রসারণীয় প্রতীকটি। এমন ক্রমবিন্যাসকে বলা হয় 'আন্তর ক্রমবিন্যাস'। এ-বিন্যাস যেহেতু সহজাত, তাই তা বিশেষ মূল্যবান নয়। মূল্যবান হচ্ছে 'বাহ্যিক ক্রমবিন্যাস'।

বাহ্যিক ক্রমবিন্যাস হচ্ছে উপাত্তবর্ণনার জন্যে ভাষাবিজ্ঞানীর আরোপিত বিন্যাস, এবং এর সাহায্যেই তিনি প্রকাশ করেন উপাত্ত সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি।

[খ] **রূপান্তর(মূলক) সূত্র**: রূপান্তর ব্যাকরণের রূপান্তর-কক্ষে ব্যবহৃত সূত্ররাশি 'রূপান্তর(মূলক) সূত্র' নামে পরিচিত। রূপান্তরসূত্র একরকম পুনর্লিখন সূত্র; তবে এ-সূত্র পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্রের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। পদসাংগঠনিক সূত্র নির্দেশ করে বাক্যের, বা অন্য কিছুর, আভ্যন্তর সংগঠন; আর রূপান্তরসূত্র বাক্যের আভ্যন্তর, বা গভীর সংগঠনের ওপর প্রযুক্ত হ'য়ে সৃষ্টি করে 'আহরিত' সংগঠন। রূপান্তরসূত্র পৌনপুনিকভাবে বাক্যের গভীর সংগঠনের ওপর প্রয়োগ ক'রে সৃষ্টি করা হয় বাক্যের বহিঃসংগঠন' বা 'বহির্তল'। পুনর্লিখন সূত্র প্রয়োগ করা হয় কোনো প্রতীক, বা গ্রন্থির ওপর; এবং রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ করা হয় সমগ্র বাক্যসংগঠন, বা পদচিত্রের ওপর। ''সিন্ট্যা''-কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণে 'আবশ্যিক রূপান্তর (মূলক) সূত্র', ও 'ঐচ্ছিক রূপান্তর(মূলক) সূত্র' নামে দু'রকম রূপান্তরসূত্র ছিলো। পরে ঐচ্ছিক রূপান্তরসূত্র বাদ দেয়া হয়, এবং সমস্ত রূপান্তরসূত্রই আবশ্যিক হ'য়ে ওঠে। রূপান্তর ব্যাকরণের প্রথম পর্যায়ে রূপান্তরসূত্রসমূহ সর্বশক্তিমান ছিলো, তারা অসাধ্য সাধন করতে পারতো। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে রূপান্তরসূত্রের শক্তি সুশৃঙ্খল ও সুচিন্তিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ''সিন্ট্যা''-কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণে সরল-বিবৃতিধর্মী-হ্যাঁ-সূচক বাক্যের গভীর সংগঠন থেকে প্রশ্নবোধক, নিষেধাত্মক, ও অন্যান্য বাক্যসংগঠন আহরণ করা হতো। অর্থাৎ রূপান্তরসূত্র বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করতে পারতো। ক্যাটজ ও পোস্টাল (১৯৬৪) প্রধান ভূমিকা নেন রূপান্তর সূত্রের শক্তি নিয়ন্ত্রণে। তাঁরা একটি মৌল প্রস্তাব পেশ করেন: 'রূপান্তরসমূহ অর্থ সংরক্ষক', বা 'রূপান্তরসূত্র বাক্যের অর্থবদল ঘটাবে না।' রূপান্তর ব্যাকরণে তাঁদের প্রস্তাবিত নীতিটি মৌলনীতি হিশেবে গৃহীত হয়েছে।

ভাষায়, বা বিভিন্ন বাক্যসংগঠনে ক্রিয়াশীল রূপান্তররাশি আবিষ্কার ভাষাবিজ্ঞানীর দায়িত্ব। তবে রূপান্তরসূত্র রচনার কয়েকটি প্রণালি রয়েছে। ''সিন্ট্যা''-কাঠামোর ব্যাকরণে যে-প্রণালিতে রূপান্তর সূত্র রচিত হতো, বর্তমানে তেমনভাবে রচিত হয় না। নিচে, (খ.১)-এ ''সিন্ট্যা''-কাঠামোর রূপান্তরসূত্র রচনা প্রণালি, এবং (খ.২) এ-''আস্পেকটস''-ও ''আস্পেকটস''–উত্তর কাঠামোর রূপান্তরসূত্র রচনাপ্রণালি দেখানো হলো:

(খ.১) **''সিন্ট্যা''-কাঠামোর রূপান্তরসূত্র**: প্রথমে নির্দেশ করা হয় রূপান্তরটির নাম —যেমন: 'প্রশ্নবোধক রূপান্তর,' 'নিষেধাত্মক রূপান্তর' ইত্যাদি,— এবং উল্লেখ করা হয় রূপান্তরটি 'আবশ্যিক', না 'ঐচ্ছিক'। এর পর দেয়া হয় বাক্যের তাৎপর্যপূর্ণ সাংগঠনিক বর্ণনা, এবং সাংগঠনিক রূপান্তর নির্দেশ করা হয় 'কভারপ্রতীক'-এর সাহায্যে (দ্র চমস্কি (১৯৫৭, ১১১-১১৪))। একটি নমুনা:

নিষেধাত্মক (ঐচ্ছিক) রূপান্তর

সাংগঠনিক বর্ণনা: # বিপ...ক্রিপ #

সাংগঠনিক রূপান্তর: # $ঙ^1$...$ঙ^2$ # ⟹ # $ঙ^1$ ... $ঙ^2$...না #

এখানে '$ঙ^1$' '$ঙ^2$' কভারপ্রতীক, অর্থাৎ '$ঙ^1$' নির্দেশ করছে বাক্যের শুরুর বিশেষ্যপদ (বিপ), '$ঙ^2$' নির্দেশ করছে ক্রিয়াপদ (ক্রিপ)। সাংগঠনিক

রূপান্তর উল্লিখিত সংগঠনে যোগ করেছে নিষেধাত্মক ভাষাবস্তু 'না'। এ-সূত্রের সাহায্যে হ্যাঁ-সূচক বাক্যকে না-সূচক বাক্যে রূপান্তরিত করা হয়।

(খ·৩) **"আস্পেকটস"-ও "আস্পেকটস"-উত্তর কাঠামোর রূপান্তরসূত্র** : প্রথমে উল্লেখ করা হয় রূপান্তরটির নাম, এবং অব্যবহিত পরবর্তী পংক্তিতে দেয়া হয় বাক্যটির তাৎপর্যপূর্ণ সাংগঠনিক বর্ণনা। রূপান্তর নির্দেশের সুবিধার জন্যে সংগঠনের বিভিন্ন উপাদান নির্দেশ করা হয় সংখ্যার সাহায্যে। তারপর উল্লেখ করা হয়, যদি থাকে, একরাশ শর্ত। বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনা যদি এ-শর্তরাশি পূরণ করে, তবেই রূপান্তর ক্রিয়াশীল হ'তে পারে, নইলে নয়। সবশেষে দেয়া হয় সাংগঠনিক রূপান্তরের ভাষিক নির্দেশ। ওপরে প্রদত্ত নিষেধাত্মক রূপান্তরটিকে (খ·২)-প্রণালিতে প্রকাশ করলে পাওয়া যাবে এ-সূত্রটি :

নিষেধাত্মক রূপান্তর :

সা ব $\quad {}_{\text{বাক্য}}[\underset{১}{\text{নএ}} \quad \underset{২}{\text{বিপ}} \quad \underset{৩}{\text{ক্রিপ}}]_{\text{বাক্য}}$

শর্ত : (ক)...

(খ) ..

সা রূ : (ক) ১ বর্জন করুন :

(খ) ৩-এর ডানে 'না' যোগ করুন।

রূপান্তরসূত্রের বাক্যসংগঠন পরিবর্তন-শক্তি : বাক্যসংগঠন বদলের অমিত শক্তি রয়েছে রূপান্তরসূত্রের। রূপান্তরসূত্রের সাহায্যে বাক্যসংগঠনে নতুন বস্তু যোগ করা যায়, সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত কোনো উপাদানকে বর্জন করা যায়, উপাদানরাশির পারস্পরিক স্থান বদল করা যায়, এবং যুগপৎ স্থানান্তর-সংযোজন-বর্জন করা যায়। রূপান্তরসূত্র সাধারণত নিম্নের ক্রিয়াসমূহ সম্পাদন করে : 'সংযোজন', 'বর্জন', 'পারস্পরিক স্থানান্তর', এবং 'প্রতিকল্পন'। সংগঠন রূপান্তরণের উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলো দেখানো হলো :

[ক] **সংযোজন** : কোনো পদচিত্রে এক বা একাধিক গ্রন্থি সংযোজন করা যেতে পারে। যদি কোনো রূপান্তরসূত্র থাকে চ+ছ => চ+ছ+জ, তবে পাওয়া যাবে :

(২৫)

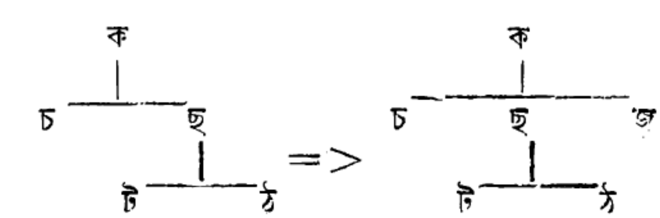

রূপান্তরসূত্রে বাক্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ সাংগঠনিক বর্ণনা থাকে না, থাকে রূপান্তর প্রয়োগের জন্যে তাৎপর্যপূর্ণ সাংগঠনিক বর্ণনা (লক্ষণীয় : পুনর্লিখন সূত্রে ব্যবহার করা হয় একটি তীর (→), কিন্তু রূপান্তরসূত্রে, সাধারণত, ব্যবহার করা হয় দ্বৈততীর (=>); কিন্তু বর্তমানে উভয় সূত্রেই একতীর ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে)।

[খ] **বর্জন** : কোনো পদচিত্র থেকে এক বা একাধিক গ্রন্থি বর্জন করা যেতে পারে। বর্জনের সময় গ্রন্থিটির ওপর আধিপত্যকারী, ও অধীন সমস্ত বৃন্ত পদচিত্র থেকে বর্জন করা হয়। যদি কোনো রূপান্তর সূত্র থাকে চ+ছ => চ, তবে পাওয়া যাবে :

(২৬)

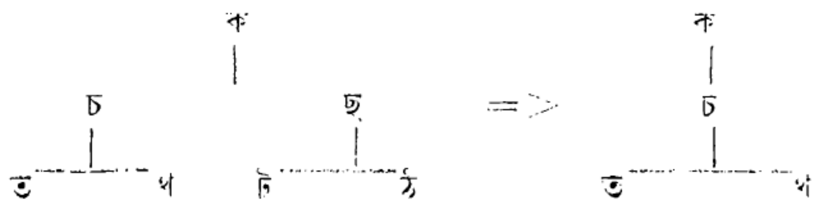

[গ] **পারস্পরিক স্থানান্তর** : পদচিত্রের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থিদের স্থান পারস্পরিকভাবে বদল করা যায়। যদি কোনো রূপান্তর সূত্র থাকে চ+ছ => ছ+চ, তবে পাওয়া যাবে :

(২৭)

[ঘ] **প্রতিকল্পন** : পদচিত্রের অন্তর্ভুক্ত এক বা একাধিক গ্রন্থিকে অন্য এক বা একাধিক গ্রন্থি দ্বারা প্রতিকল্পিত করা যেতে পারে। যদি কোনো রূপান্তর সূত্র থাকে চ + ছ => জ + ছ, তবে পাওয়া যাবে :

(২৮)

এ-ছাড়া পদচিত্রে যুগপৎ সংযোজন-বর্জন-স্থানান্তর ঘটানো যায়।

১'৩'৩ প্রতীকরাজি

রূপান্তর ব্যাকরণের সূত্রে তিন রকম প্রতীক ব্যবহৃত হয় : (ক) 'শব্দপ্রতীক', (খ) 'অপ্যারেটর' ('সংকেত'), ও (গ) 'সংক্ষেপক'। শব্দপ্রতীক ব্যবহৃত হয় নানারকম বাক্য-শ্রেণী, শব্দ-শ্রেণী, ভাষা-একক প্রভৃতি নির্দেশের জন্যে ; অপ্যারেটর ব্যবহৃত হয়

নানারকম ক্রিয়াপ্রক্রিয়া সংকেতের জন্যে; এবং সংক্ষেপক ব্যবহৃত হয় একাধিক সূত্রকে একসূত্রে প্রকাশের জন্যে। অপ্যারেটর ও সংক্ষেপক সূত্রের বিভিন্ন ক্রিয়াপ্রক্রিয়া নির্দেশ ক'রে ব'লে এদের 'গ্রন্থি'র অন্তর্গত বস্তুরূপে বিবেচনা করা হয় না, এবং এদের কোনো নিজস্ব সংগঠন নেই। শুধু শব্দপ্রতীকগুলোই বাক্যের বাস্তব উপাদান।

[ক] **শব্দপ্রতীক** : বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহকে নির্দেশ করার জন্যে যে-সমস্ত প্রতীক ব্যবহার করা হয়, তাদের বলা হয় 'শব্দপ্রতীক' ('ভ্যাক্যাবিউল্যারি সিম্বল')। শব্দপ্রতীক দু'রকম : (ক) 'শ্রেণী ও রূপমূল নির্দেশক প্রতীক', এবং (খ) 'কভারপ্রতীক' (আবরণ-প্রতীক)।

(ক'১) **শ্রেণী ও রূপমূল নির্দেশক প্রতীক** : এ-প্রতীকসমূহ বাক্য, ও বাক্যের 'উচ্চ' উপাদান-শ্রেণী নির্দেশ করে, এবং রূপমূলের মতো 'নিম্ন' উপাদানও নির্দেশ করে। 'উচ্চ' উপাদান নির্দেশক প্রতীককে বলা যায় 'শ্রেণী-প্রতীক', এবং রূপমূল নির্দেশক প্রতীককে বলা যায় 'রূপমূল-প্রতীক'। বাক্যের উচ্চ উপাদান নির্দেশক শ্রেণী-প্রতীকসমূহ 'অ-অন্তপ্রতীক' (যে-প্রতীককে পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে আরো সম্প্রসারিত করা সম্ভব), এবং বাক্যের নিম্ন উপাদান (রূপমূল) নির্দেশক প্রতীকসমূহ 'অন্তপ্রতীক' (যে-প্রতীককে পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে আর সম্প্রসারণ করা সম্ভব নয়)।

শ্রেণী-প্রতীকের ('অ-অন্তপ্রতীকের) উদাহরণ : 'বা' (বাক্য), 'বিপ' (বিশেষ্য-পদ), 'ক্রিপ' (ক্রিয়াপদ), 'বি' (বিশেষ্য) প্রভৃতি।

রূপমূল-প্রতীকের ('অন্তপ্রতীকের') উদাহরণ : 'ছেলে', 'মেয়ে', 'সে' প্রভৃতি।

(ক'২) **কভারপ্রতীক (আবরণপ্রতীক)** : কভারপ্রতীক শুধু রূপান্তরসূত্রেই ব্যবহৃত হয়। কোনো সংগঠনের এক বা একাধিক গ্রন্থি নির্দেশের জন্যে ব্যবহৃত হয় এমন প্রতীক। মনে করা যাক, কোনো একটি সংগঠনের আকার হচ্ছে #ক+খ + গ+ঘ#। এ-সংগঠনটির ওপর এমন একটি রূপান্তরসূত্র প্রযুক্ত হবে, যার জন্যে দরকারী শুধু সংগঠনের 'ক', ও 'ঘ' গ্রন্থি। এ-গ্রন্থি দুটির মধ্যবর্তী গ্রন্থি সূত্রটির জন্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়। তবে সূত্রটি প্রয়োগের জন্যে জানা দরকার যে 'ক', ও 'ঘ'-র মাঝে কোনো গ্রন্থি আছে, জায়গাটুকু শূন্য নয়। রূপান্তরসূত্রটিতে সংগঠনটির সামগ্রিক বর্ণনা দেয়া যেতে পারে; কিন্তু দিলে তা বাহুল্য হবে। এ-বাহুল্য এড়ানোর জন্যে কাজে লাগানো হয় কভারপ্রতীক, যা কখনো শূন্য গ্রন্থি, বা এক বা একাধিক গ্রন্থি নির্দেশ করে। ওপরের সংগঠনটির 'খ + গ' গ্রন্থি নির্দেশের জন্যে ব্যবহার করতে পারি 'ঙ'-কে কভারপ্রতীকরূপে। তাহলে সংগঠনটির বর্ণনা হবে নিম্নরূপ : #ক+ঙ+ঘ#। ইংরেজিতে সাধারণত বর্ণমালার শেষ বর্ণ তিনটিকে কভারপ্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয়। বাঙলায় আমি স্বল্পব্যবহৃত কয়েকটি বর্ণ (যেমন : ঙ, ঞ, ক্ষ) কভারপ্রতীকরূপে ব্যবহার করবো।

[খ] **অপ্যারেটর** (প্রক্রিয়ানির্দেশক সংকেত) : দু'রকম প্রক্রিয়া—গ্রন্থন ও পুনর্লিখন—নির্দেশের জন্যে অপ্যারেটর ব্যবহৃত হয়।

(খ'১) **গ্রন্থন-প্রতীক** : এর মধ্যে পড়ে সংযোগচিহ্ন (+), এবং সীমাচিহ্ন (#)।

(ক) **সংযোগচিহ্ন** (+) : এ-চিহ্নটি একাধিক গ্রন্থি সংযোগের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এটি সংযুক্ত গ্রন্থিসমূহের সীমাও নির্দেশ করে। যেমন : ক → খ+গ সূত্রটি নির্দেশ করছে যে 'খ', ও 'গ' দুটি পৃথক প্রতীক, এবং তারা একত্রে একটি গ্রন্থি সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণে '+' চিহ্নটিকে বর্জনও করা হয়। যেমন : উল্লিখিত সূত্রটিকে ক → খ গ-রূপেও লেখা যায়।

(খ) **দ্বৈতক্রুস** (#) : এ-চিহ্নটিকে সাধারণত বাক্য, বা অন্য কোনো এককের সীমা নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন : #বিপ+ক্রিপ# নির্দেশ করছে যে দ্বৈতক্রুসের মধ্যবর্তী গ্রন্থটি একটি বাক্য।

(খ·২) **পুনর্লিখন প্রতীক** : পদসাংগঠনিক সূত্রে পুনর্লিখন নির্দেশের জন্যে ব্যবহৃত হয় তীরচিহ্ন (→)। পুনর্লিখন নির্দেশের জন্যে অভগ্ন তীর (→), বা বিভগ্ন তীর (- - - →) ব্যবহার করা যেতে পারে। তীরটি নির্দেশ করে যে তীরটির বাঁ-দিকের গ্রন্থিকে ডান-দিকের গ্রন্থিরূপে লিখতে হবে। তীরটি তার বাঁ ও ডানের গ্রন্থি দুটির মধ্যে সম্পর্কও নির্দেশ করে। পদসাংগঠনিক সূত্রে তীরচিহ্ন নির্দেশ করে 'হচ্ছে' সম্পর্ক। যেমন : ক → খ সূত্রটিতে তীরটি নির্দেশ দিচ্ছে যে 'ক'-কে পুনরায় 'খ'-রূপে লিখতে হবে; এবং নির্দেশ করছে যে 'ক হচ্ছে খ'; বা 'খ হচ্ছে ক'। রূপান্তরসূত্রে তীরচিহ্ন 'আহরিত', বা 'গঠিত', বা 'সৃষ্ট' অর্থ বোঝায়। যেমন : ক+খ==>খ+ক রূপান্তরসূত্রে তীরটি নির্দেশ করছে যে এর বাঁয়ের সংগঠনকে ডানদিকের সংগঠনে রূপান্তরিত করতে হবে। তীরটি এখানে ডান-বামের বস্তুদের মধ্যে সম্পর্কও নির্দেশ করছে। তীরটি বোঝাচ্ছে যে ডানের সংগঠনটি বাঁয়ের সংগঠন থেকে 'আহরিত', বা 'গঠিত', বা 'সৃষ্ট'।

রূপান্তর ব্যাকরণে নানারকম তীর দু'রকম তাৎপর্যে ব্যবহার করা হয়। পুনর্লিখন ও রূপান্তর বোঝানোর জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে অভগ্ন, বা বিভগ্ন একতীর (→, - - - →)। শুধু পুনর্লিখন নির্দেশের জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে অভগ্ন (→), বা বিভগ্ন (- - - →) একতীর; এবং রূপান্তর জ্ঞাপনের জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে অভগ্ন (=>), বা বিভগ্ন (==>) দ্বৈততীর। এ-রচনায় পুনর্লিখনের জন্যে সাধারণত অভগ্ন একতীর (→), এবং রূপান্তর বোঝানোর জন্যে অভগ্ন দ্বৈততীর (=>) ব্যবহৃত।

[গ] **সংক্ষেপক** : সংক্ষেপকরূপে ব্যবহৃত হয় তিন রকম বন্ধনি : (ক) প্রথম বন্ধনি (( )); (খ) দ্বিতীয় বন্ধনি ({ }); ও (গ) তৃতীয় বন্ধনি ([ ])। এদের প্রয়োগবিধি :

(গ·১) **প্রথম বন্ধনি (( ))** : প্রথম বন্ধনি ঐচ্ছিকতা নির্দেশ করে। যে-সমস্ত সূত্র, দু-একটি প্রতীক বাদে, অভিন্ন, তাদের একত্র করার জন্যে প্রথম বন্ধনি ব্যবহৃত হয়। একত্রিত সূত্রে ভিন্নতানির্দেশক প্রতীকগুলোকে প্রথম বন্ধনিবদ্ধ ক'রে যথাস্থানে স্থাপন করা হয়। সূত্র প্রয়োগের সময় বন্ধনিহীন প্রতীকগুলোকে আবশ্যিকভাবে নিতে হয়, এবং বন্ধনিবদ্ধ প্রতীক(গুলো)কে নেয়া যেতে পারে, বা নাও নেয়া যেতে পারে। যেমন : ক→খ+(গ) সূত্রে দুটি সূত্র একত্রিত। সূত্র দুটি হচ্ছে : ক→খ, এবং ক→খ+গ। ওপরের একত্রিত সূত্রটি নির্দেশ

করছে যে 'ক'-কে 'খ'-রূপে অবশ্যই পুনরায় লিখতে হবে, তবে ঐচ্ছিকভাবে 'গ'-কেও নেয়া যেতে পারে, অর্থাৎ 'ক'-কে 'খ+গ' রূপেও পুনরায় লেখা যেতে পারে। এখন বন্ধনির কতিপয় প্রয়োগ নিচে দেখানো হলো

(গ.১.**ক**) ক → (খ) গ : এ-সূত্রে ডানের সূত্র দুটি একত্রিত ক → গ

ক → খ গ

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় অবশ্যই 'গ'-কে গ্রহণ করতে হবে, তবে ঐচ্ছিকভাবে 'খ'-কেও, 'গ'-এর বাঁয়ে, নেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ 'খ'-কে বাদ দিয়ে 'গ'-কে নেয়া সম্ভব, কিন্তু 'গ'-কে বাদ দিয়ে 'খ'-কে নেয়া অসম্ভব।

(গ. ১.**খ**) ক → খ (গ) (ঘ) সূত্রটিতে চারটি সূত্র একত্রিত

ক → খ

ক → খ গ

ক → খ ঘ

ক → খ + গ + ঘ

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় 'খ'-কে অবশ্যই নিতে হবে, এবং ঐচ্ছিকভাবে 'গ' বা 'ঘ'-কে বা উভয়কে নেয়া যেতে পারে। সূত্রটি প্রয়োগের সময় সূত্রে উল্লিখিত প্রতীকের ক্রম মানতে হবে।

(**গ.১.গ**) ক → খ (গ+ঘ) সূত্রটিতে দুটি সূত্র একত্রিত:

ক → খ

ক → খ + গ + ঘ

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় 'খ'-কে অবশ্যই নিতে হবে; এবং ঐচ্ছিকভাবে 'গ + ঘ'-কেও নেয়া যেতে পারে। 'গ+ঘ'-এর কোনো প্রতীককে একা নেয়া যাবে না, নিলে উভয়কেই নিতে হবে।

(**গ.১.ঘ**) ক → ((খ) গ) ঘ সূত্রটিতে তিনটি সূত্র একত্রিত:

ক → ঘ

ক → গ + ঘ

ক → খ + গ + ঘ

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় 'ঘ'-কে অবশ্যই নিতে হবে ; এবং ঐচ্ছিকভাবে 'গ'-কে বা 'খ+গ'-কেও নেয়া যেতে পারে। এ-সূত্রে 'খ'-কে না নিয়েও নেয়া সম্ভব 'গ'-কে, কিন্তু 'গ'-কে না নিয়ে 'খ'-কে নেয়া অসম্ভব।

(গ.১.ঙ) ক → (খ) (গ) সূত্রটিতে তিনটি সূত্র একত্রিত :

ক → খ

ক → গ

ক → খ   গ

সূত্রটির তীরের ডান দিকের উভয় প্রতীকই ঐচ্ছিক ; তবে সূত্রটি প্রয়োগের সময় এদের একটিকে অবশ্যই নিতে হবে, এবং ঐচ্ছিকভাবে দুটিকেই নেয়া সম্ভব।

(গ.২) **দ্বিতীয় বন্ধনি**({ }) : কোনো গ্রন্থির বিকল্প সম্প্রসারণ নির্দেশের জন্যে দ্বিতীয় বন্ধনি ({ }) ব্যবহৃত হয়। যে-সমস্ত সূত্র একটি প্রতীক বাদে (বা প্রতীক পরম্পরা বাদে), অভিন্ন, তাদের একত্রে প্রকাশ করার জন্যে দ্বিতীয় বন্ধনি ব্যবহার করা হয়। ভিন্নতাজ্ঞাপক প্রতীকগুলোকে উল্লম্বভাবে বিন্যস্ত করা হয়, এবং তাদের ঘিরে দেয়া হয় দ্বিতীয় বন্ধনিতে। দ্বিতীয় বন্ধনিবদ্ধ প্রতীকসমূহ আবশ্যিক : সূত্র প্রয়োগ করার সময় দ্বিতীয় বন্ধনিস্থ যে-কোনো একটিকে অবশ্যই নিতে হবে, কিন্তু একবারে একাধিক প্রতীক নেয়া যাবে না। নিচের সূত্রটি লক্ষণীয় :

(গ.২.ক) $\text{ক} \rightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{খ} \\ \text{গ} \\ \text{ঘ} \end{array} \right\}$ সূত্রটিতে তিনটি সূত্র একত্রিত.

ক → খ

ক → গ

ক → ঘ

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় 'খ', 'গ', 'ঘ'-এর কোনো একটিকে অবশ্যই নিতে হবে (এবং যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে)।

(গ.২.খ) $\left\{ \begin{array}{c} \text{ক} \\ \text{খ} \end{array} \right\} \text{গ} \Rightarrow \text{ট}$ সূত্রটিতে দুটি সূত্র একত্রিত :

ক + গ => ট

খ + গ => ট

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় 'গ'-কে অবশ্যই নিতে হবে, এবং 'গ'-র বাঁয়ে 'ক', ও 'খ'-র মাঝ থেকে একটিকে অবশ্যই নিতে হবে। তবে উভয়কে একবারে নেয়া যাবে না।

যদিও দ্বিতীয় বন্ধনির ভেতরে সাধারণত আবশ্যিক প্রতীকসমূহকে স্থাপন করা হয়, তবে ঐচ্ছিক বিকল্প প্রতীকও দ্বিতীয় বন্ধনিতে স্থাপন করা যায়। নিচের সূত্রগুলো লক্ষণীয় :

$$(\text{গ.২.গ})\quad \text{ক} \rightarrow \left(\begin{Bmatrix} \text{খ} \\ \text{গ} \end{Bmatrix} \right) \text{ঘ}$$

সূত্রটিতে তিনটি সূত্র একত্রিত

ক → ঘ

ক → খ + ঘ

ক → গ + ঘ

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় 'ঘ'-কে অবশ্যই নিতে হবে, এবং ঐচ্ছিকভাবে 'খ' ও 'গ'-এর যে কোনো একটিকে নেয়া যেতে পারে।

$$(\text{গ·২·ঘ})\quad \text{ক} \rightarrow \begin{Bmatrix} \text{খ} + \text{গ} \\ \text{ঘ} \\ \text{চ (ছ)} \end{Bmatrix}$$

সূত্রটিতে চারটি সূত্র একত্রিত :

ক → খ + গ

ক → ঘ

ক → চ

ক → চ + ছ

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় 'খ + গ', অথবা 'ঘ', অথবা 'চ', বা ঐচ্ছিকভাবে 'চ + ছ'-কে নিতে হবে।

আরো নানা জটিল সূত্র দ্বিতীয় বন্ধনির সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব।

কোনো গ্রন্থির বিকল্প সম্প্রসারণসমূহকে যে উল্লম্বভাবে স্থাপন করতেই হবে, তা নয়। বিকল্প সম্প্রসারণরাশিকে তীরের ডানে সরলরৈখিকভাবে বিন্যস্ত করা যায়। তবে এমনভাবে বিন্যাস করা হ'লে সাধারণত দ্বিতীয় বন্ধনি ব্যবহার করা হয় না। যেমন : ক→খ, গ, ঘ। এমন একত্রীকরণ কৌশল সাধারণত শব্দতালিকা নির্মাণের সময়ই ব্যবহৃত হয়। যেমন : বি(শেষ্য) → ছেলে, মেয়ে,…। এমন শব্দসূত্র নির্দেশ করে যে সূত্রের একবার প্রয়োগে তীরের ডান দিকের বস্তুপুঞ্জ থেকে মাত্র একটি বস্তু গ্রহণ করা যেতে পারে (দ্র Φ ১·৪)।

(গ·৩) **তৃতীয় বন্ধনি** : তৃতীয় বন্ধনি সাধারণত রূপান্তর সূত্রে ব্যবহৃত হয়। সমস্থানে বিসদৃশ ও অভিন্ন গ্রন্থিসম্বলিত সূত্রসমূহকে একত্রিত করার জন্যে ব্যবহৃত হয় তৃতীয় বন্ধনি ([ ])। একত্রিত সূত্রগুলোকে কমপক্ষে দু'স্থানে বিসদৃশ হ'তে হবে। এ-কারণে এমন একটি সূত্রে কমপক্ষে দু'জোড়া তৃতীয় বন্ধনি ব্যবহৃত হয়। সূত্রগুলোর যে-সমস্ত প্রতীক ভিন্ন, একত্রীকরণের সময় তাদের উল্লম্বভাবে স্থাপন করে তৃতীয় বন্ধনিতে ঘিরে দেয়া হয়। নিচের সূত্রগুলো লক্ষণীয় :

$$(\text{গ·৩·ক})\quad \begin{bmatrix} \text{ক} \\ \text{খ} \end{bmatrix} \text{গ} + \text{ঘ} \Rightarrow \begin{bmatrix} \text{চ} \\ \text{ছ} \end{bmatrix} \text{গ} + \text{ঘ}$$

সূত্রটিতে দুটি সূত্র একত্রিত :

$$\text{ক} + \text{গ} + \text{ঘ} \Rightarrow \text{চ} + \text{গ} + \text{ঘ}$$

$$\text{খ} + \text{গ} + \text{ঘ} \Rightarrow \text{ছ} + \text{গ} + \text{ঘ}$$

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় বাম বন্ধনিস্থ 'ক' পরিবর্তিত হবে 'চ'-তে, এবং 'খ' পরিবর্তিত হবে 'ছ'-তে। এমন সূত্রে বাঁ-দিকের গ্রন্থির তৃতীয় বন্ধনিস্থ যে-বস্তুটিকে নেয়া হবে, ডান দিকের গ্রন্থির তৃতীয় বন্ধনি থেকে নিতে হবে সে-বস্তুটিকে, যে-টি আগের বস্তুটির তুল্যস্থানে অবস্থিত।

$$(\text{গ.৩.খ})\quad \begin{bmatrix} \text{ক} \\ \text{খ} \end{bmatrix} \text{গ} \begin{bmatrix} \text{ঘ} \\ \text{ঙ} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \text{চ} \\ \text{ছ} \end{bmatrix} \text{গ} \begin{bmatrix} \text{ঝ} \\ \text{ঞ} \end{bmatrix}$$

সূত্রটিতে দুটি সূত্র একত্রিত :

$$\text{ক} + \text{গ} + \text{ঘ} \Rightarrow \text{চ} + \text{গ} + \text{ঝ}$$

$$\text{খ} + \text{গ} + \text{ঙ} \Rightarrow \text{ছ} + \text{গ} + \text{ঞ}$$

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় বাঁ-দিকের গ্রন্থি থেকে 'ক' নিলে ডান-গ্রন্থি থেকে নিতে হবে 'চ', আর বাঁ-গ্রন্থি থেকে 'খ' নিলে ডান-গ্রন্থি থেকে নিতে হবে 'ছ'। অনুরূপভাবে 'ঘ—ঝ', এবং 'ঙ—ঞ' নিতে হবে।

সূত্র একত্রীকরণের তিন রকম প্রণালি এক সঙ্গে ব্যবহৃত হ'তে পারে একই সূত্রে। তাই রচনা করা যেতে পারে নিচের সূত্রটির মতো সূত্র :

$$(\text{গ.৩.গ})\quad \begin{bmatrix} \text{ক (খ)} \\ \text{গ} \end{bmatrix} \text{ঘ} \begin{Bmatrix} \text{চ} \\ \text{ছ} \end{Bmatrix} \Rightarrow \text{ঘ} \begin{Bmatrix} \text{চ} \\ \text{ছ} \end{Bmatrix}$$

সূত্রটিতে ছটি সূত্র একত্রিত :

$$\text{ক} + \text{খ} + \text{ঘ} + \text{চ} \Rightarrow \text{ঘ} + \text{চ}$$

$$\text{ক} + \text{ঘ} + \text{চ} \Rightarrow \text{ঘ} + \text{চ}$$

ক + খ + ঘ + ছ => গ + ছ

ক + ঘ + ছ => গ + ছ

গ + ঘ + চ => ঘ + চ

গ + ঘ + ছ => ঘ + ছ

১.৪ পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ

সাংগঠনিক অব্যবহিত-উপাদান প্রণালিকে সুশৃঙ্খল রূপ দিলে যা দাঁড়ায়, তাই 'পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ' (দ্র পোস্টাল (১৯৬৪))। সাংগঠনিকেরা বাক্যবর্ণনার জন্যে অব্যবহিত-উপাদানতত্ত্বকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের তত্ত্বকে সুশৃঙ্খল রূপ দিতে পারেন নি। চমস্কি (দ্র চমস্কি (১৯৫৭, ২৬)) রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ প্রস্তাবের সময় বাক্যের অব্যবহিত-উপাদান নির্ভর ক'রে গঠন করে সুশৃঙ্খল, সূত্রসমন্বিত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ ব্যবহৃত হয় রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের 'ভিত্তি কক্ষে' (দ্র *Ф* ১. ৫.১.১ ; ১.৬.৩)। সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণের 'ভিত্তি কক্ষ' ও প্রকৃতিতে রূপান্তরমূলক (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ১২০-১২৩), তবে আকৃতিতে তা পদ সাংগঠনিক। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ, নানাবিধ দুর্বলতা সত্ত্বেও, বেশ শক্তিশালী; এবং এর সাহয্যে ভাষার সমস্ত বাক্যই সৃষ্টি করা সম্ভব। তবে অনেকে দাবি করেছেন (দ্র চমস্কি (১৯৫৭, ৩৪-৪৮)) যে এর সাহায্যে ভাষার সমস্ত বাক্য সৃষ্টি করতে গেলে মুখোমুখি হ'তে হবে বিপুল জটিলতার; এবং কেউকেউ দাবি করেছেন যে পৃথিবীতে এমন কিছু ভাষা আছে, যাদের সমস্ত বাক্য পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করা সম্ভব নয় (দ্র লায়নস (১৯৭০))। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ হচ্ছে বাক্যগঠনকারী একগুচ্ছ পুনর্লিখন সূত্রের সমষ্টি। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের শুরুতে থাকে একটি 'আদিপ্রতীক' বা 'আদিগ্রন্থি' (দ্র *Ф* ১.৩.২)—# বাক্য #। আদিপ্রতীকের পরে থাকে বাক্যগঠনকারী একগুচ্ছ সূত্র, যাদের যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ ক'রে সৃষ্টি করা যায় বাক্য। পদ সাংগঠনিক ব্যাকরণ সৃষ্ট বাক্যসমূহের স্বয়ংক্রিয় সাংগঠনিক বর্ণনা দেয় (দ্র *Ф* ১.৩.১)। পদ সাংগঠনিক ব্যাকরণের ক্রিয়াকৌশল বোঝানোর জন্যে (২৯)-এ একটি খণ্ডিত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ পেশ করা হলো :

(২৯) # বাক্য #

ক বাক্য → বিপ + ক্রিপ

খ ক্রিপ → বিপ + ক্রিক

গ বিপ → বি

ঘ ক্রিক → ক্রিগু + ক্রিস

ঙ বি → মৌলি, সে, তারা,···বই, কবিতা, চিঠি,···

চ ক্রিমূ → পড়

ছ ক্রিস → এ, ছে, লে

[সংক্ষেপসূত্র : বিপ : বিশেষ্যপদ, ক্রিপ : ক্রিয়াপদ, ক্রিরূ : ক্রিয়ারূপ; বি : বিশেষ্য ক্রিমূ : ক্রিয়ামূল : ক্রিস : ক্রিয়াসহায়ক।]

(২৯)-এর ব্যাকরণটিতে সাতটি 'পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্র' আছে। প্রতিটি সূত্র নির্দেশ দিচ্ছে তীরের বাঁ-দিকের প্রতীককে ডান-দিকের প্রতীকরূপে 'পুনরায়' লেখার জন্যে। ব্যাকরণটিতে দু'রকমের প্রতীক রয়েছে : যে-সমস্ত প্রতীক তীরের বাঁ-দিকে রয়েছে, সে-গুলো হচ্ছে 'অ-অন্ত প্রতীক'; এবং যে-প্রতীকগুলো শুধুই তীরের ডানে বসেছে, কোনো সূত্রেই তীরের বাঁয়ে বসে নি, সে-গুলো হচ্ছে 'অন্তপ্রতীক' (দ্র Փ ১.৩.৩)। অন্তপ্রতীকগুলো নির্দেশ করে সে-সব বস্তু, যারা অবিভাজ্য—অর্থাৎ রূপমূল। যেমন : 'সে, পড়, এ' প্রভৃতি। অ-অন্তপ্রতীকগুলো নির্দেশ করে বাক্যের উচ্চ পর্যায়ের পদ, বা ক্যাটেগরি। যেমন; 'বিপ', 'ক্রিপ', 'ক্রিমূ', 'ক্রিরূ' প্রভৃতি। (২৯)-এর সূত্ররাশি যান্ত্রিকভাবে বাক্য সৃষ্টি করতে পারে। এ-সূত্রগুলো যদি একের পর এক প্রয়োগ করি, তাহলে পাওয়া যাবে একটি বাক্যের 'ব্যুৎপত্তি' (দ্র (৩০))। (৩০)-এ # # নির্দেশ করছে বাক্য-সীমা। ব্যাকরণটির 'আদিপ্রতীক' হচ্ছে 'বাক্য'। তাই (২৯)-সৃষ্ট সমস্ত 'ব্যুৎপত্তি'র প্রথম পংক্তিরূপে উপস্থিত থাকবে 'বাক্য' প্রতীকটি। ব্যুৎপত্তির প্রতিটি গ্রন্থি জন্মেছে অব্যবহিত-পূর্ববর্তী গ্রন্থির ওপর একটি ক'রে সূত্র প্রয়োগ ক'রে। (২৯ক) সূত্রটি প্রয়োগ ক'রে পাওয়া গেছে ব্যুৎপত্তির দ্বিতীয় পংক্তিটি, এবং তার ওপর (২৯খ) সূত্রটি প্রয়োগ করে পাওয়া গেছে ব্যুৎপত্তির তৃতীয় গ্রন্থিটি। তৃতীয় গ্রন্থিটির ওপর (২৯গ) সূত্রটি প্রয়োগ করা হয়েছে দু'বার, এবং পাওয়া গেছে ব্যুৎপত্তির চতুর্থ গ্রন্থিটি। চতুর্থ

(৩০) **ব্যুৎপত্তি**	**গ্রন্থি**	**প্রযুক্ত সূত্র**
# বাক্য #	প্রথম	
# বিপ + ক্রিপ #	দ্বিতীয়	[২৯ক]
# বিপ + বিপ + ক্রিরূ #	তৃতীয়	] ২৯খ]
# বি + বি + ক্রিরূ #	চতুর্থ	[২০গ (দু'বার)
# বি + বি + ক্রিমূ + ক্রিস #	পঞ্চম	[২৯ঘ]
# মৌলি + বি + ক্রিমূ + ক্রিস #	ষষ্ঠ	[২৯ঙ]
# মৌলি + বই + ক্রিমূ + ক্রিস #	সপ্তম	[২৯ঙ]
# মৌলি + বই + পড় + ক্রিস #	অষ্টম	[২৯চ]
# মৌলি + বই + পড় + ছে #	নবম	[২৯ছ]

গ্রন্থির ওপর (২৯ঘ) সূত্র প্রয়োগ ক'রে সম্প্রসারণ করা হয়েছে 'ক্রিরূ'-কে এবং, পাওয়া গেছে ব্যুৎপত্তির পঞ্চম গ্রন্থিটি। পঞ্চম গ্রন্থির ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে (২৯ঙ) সূত্র, এবং সৃষ্ট হয়েছে ষষ্ঠ গ্রন্থিটি। (২৯ঙ) সূত্রটি পুনরায় প্রযুক্ত হয়েছে

ষষ্ঠ গ্রন্থির ওপর ; এবং জন্মেছে ব্যুৎপত্তির সপ্তম গ্রন্থি। সপ্তম গ্রন্থিতে আছে দুটি সম্প্রসারণযোগ্য প্রতীক—'ক্রিমূ' ও 'ক্রিস'। এ-গ্রন্থির ওপর (২৯চ) সূত্র প্রয়োগ ক'রে সম্প্রসারণ করা হয়েছে 'ক্রিমূ'-কে এবং সৃষ্ট হয়েছে অষ্টম গ্রন্থি। অষ্টম গ্রন্থিতে সম্প্রসারণযোগ্য প্রতীক আছে মাত্র একটি। অষ্টম গ্রন্থির 'ক্রিস'-কে (২৯ছ) সূত্রের সাহায্যে সম্প্রসারণ ক'রে সৃষ্টি করা হয়েছে নবম গ্রন্থি। নবম গ্রন্থিটি গঠিত কেবল অন্তপ্রতীকে ; এতে এমন কোনো প্রতীক নেই, যা সম্প্রসারণযোগ্য। কোন সূত্র প্রয়োগের ফলে কোন গ্রন্থি পাওয়া গেছে, তা দেখানো হয়েছে ব্যুৎপত্তির ডান-দিকের 'প্রযুক্ত সূত্র' স্তম্ভে। এ-ভাবে ক্রমান্বয়ে সূত্র প্রয়োগের ফলে আমরা উপনীত হই ব্যুৎপত্তির 'অন্তগ্রন্থি'-তে; অর্থাৎ সে-গ্রন্থিতে, যাতে সম্প্রসারণযোগ্য কোনো প্রতীক নেই। (৩০)-ব্যুৎপত্তির # মৌলি + বই + পড় + ছে # গ্রন্থিটি হচ্ছে অন্তগ্রন্থি। যে-ব্যুৎপত্তির শেষ পংক্তিতে কোনো সম্প্রসারণযোগ্য প্রতীক থাকে না, বা কোনো 'অ-অন্তপ্রতীক' থাকে না, তাকে 'সমাপ্ত ব্যুৎপত্তি' বলা হয়। (৩০) একটি 'সমাপ্ত বা সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তি', কেননা এর শেষ পংক্তিটিতে এমন কোনো প্রতীক নেই, যা সমপ্রসারণযোগ্য। ব্যুৎপত্তিটির অন্তগ্রন্থির ওপর রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে 'মৌলি বই পড়ছে' বাক্যটি। (২৯)-এর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণটির সূত্র প্রয়োগ ক'রে যে-সমস্ত বাক্য পাওয়া যাবে, তাদের বিবেচনা করতে হবে এ-ব্যাকরণ কর্তৃক সৃষ্ট বাক্য ব'লে।

সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ কেবল বাক্য সৃষ্টি করে না, বাক্য সৃষ্টির সাথে সাথে তা বাক্যের স্বয়ংক্রিয় সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়। 'মৌলি বই পড়ছে' বাক্যটির সংগঠন (৩১)-এর পদ-চিত্রে (দ্র পৃষ্ঠা ৭৫) উপস্থাপন করা যায়।* ব্যাকরণের সূত্ররাশিকে, বা সূত্র প্রয়োগে সৃষ্ট ব্যুৎপত্তিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপস্থাপিত করা যায় পদচিত্রে (দ্র ৩১·৩·১)। ব্যাকরণের সূত্র-রাশিকে পদচিত্রে উপস্থাপনের প্রণালি, সংক্ষেপে, নিম্নরূপ : প্রথমে নিতে হবে আদিপ্রতীক 'বাক্য'-কে; এবং তার ওপর প্রয়োগ করতে হবে ব্যাকরণের প্রথম সূত্র। 'বাক্য'-কে যে-দুটি প্রতীকরূপে সমপ্রসারণ করতে হবে, তাদের বসাতে হবে 'বাক্য' থেকে সামান্য নিচে (দ্র ৩১)। তারপর সরল রেখার সাহায্যে সম্প্রসারিত প্রতীক দুটিকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করতে হবে 'বাক্য'-এর সাথে। প্রতীক দুটিকেও ব্যাকরণের উপযুক্ত সূত্রের সাহায্যে সমপ্রসারিত করতে হবে অনুরূপভাবে, এবং সমপ্রসারণের ফলে প্রাপ্ত প্রতীককে সরল রেখার সাহায্য প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করতে হবে মূল প্রতীকের সাথে। এমন প্রণালি প্রয়োগ ক'রেক'রে এক সময় দেখা যাবে আর সূত্র প্রয়োগ সম্ভব নয়। তখনি রচিত হবে একটি পূর্ণাঙ্গ পদচিত্র। কোনো বাক্যের ব্যুৎপত্তি ও পদচিত্র সমান সংবাদ বহন করে না ; পদচিত্রের চেয়ে ব্যুৎপত্তি অনেক বেশি অনুপুঙ্খ : 'মৌলি বই পড়ছে' বাক্যটি সম্পর্কে (৩১)-পদচিত্রটি যতো তথ্য বহন করে, তার চেয়ে বেশি তথ্য বহন করে (৩০)-এর ব্যুৎপত্তিটি। (৩০)-এ বাক্য সৃষ্টির জন্যে প্রযুক্ত সূত্রসমূহের ক্রম সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত, কিন্তু (৩১)-এ সূত্র প্রয়োগের ক্রম অনির্দেশিত : (৩০)-এর সাহায্যে সহজে

* রূপান্তর ব্যাকরণে সাধারণত (৩১)-রূপী পদচিত্র ব্যবহার করা হয়। আধিপত্যকারী বৃন্তের সাথে অধীন বৃন্তরাশিকে যুক্ত করা হয় তির্যক রেখা টেনে ; তবে কোনো আধিপত্যকারী বৃন্ত যদি মাত্র একটি বৃন্তের ওপর আধিপত্য করে, তখন আধিপত্যকারী ও অধীন বৃন্তকে, সাধারণত, লম্বরেখার সাহায্যে যুক্ত করা হয়। এ-রচনায় অধিকাংশ পদচিত্র, মৌদ্রণিক কারণে, বংশলতিকাচিত্রের ধরনে ছাপা হয়েছে (উদাহরণস্বরূপ দ্র (৬৭))। যে-সমস্ত পদচিত্র, এ-রচনায়, ব্লকের সাহায্যে মুদ্রিত, সেগুলোতে বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত শব্দপ্রতীকের অভ্যন্তরে হাইফেন ব্যবহার করা হয়েছে (যেমন : 'বি-প', 'ক্রি-প' প্রভৃতি)। কিন্তু মুদ্রণের সময় হাইফেন অপ্রয়োজনীয় ভেবে পরিহার করা হয়েছে। পদচিত্র, স্মরণ রাখা দরকার, রূপান্তর ব্যাকরণের শোভা, বা গিমিক নয় : পদচিত্র বাক্যসংগঠন দৃষ্টির সামনে স্পষ্ট তুলে ধরে বলে এর অমূল্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

রচনা করা সম্ভব (৩১) ; তবে (৩১)-এর সাহায্যে কোনোক্রমেই (৩০) গঠন সম্ভব নয়। (৩১)-এর পদচিত্রটি বহন করছে 'মৌলি বই পড়ছে' সম্পর্কে কেবল গুরুত্বপূর্ণ,

(৩১)

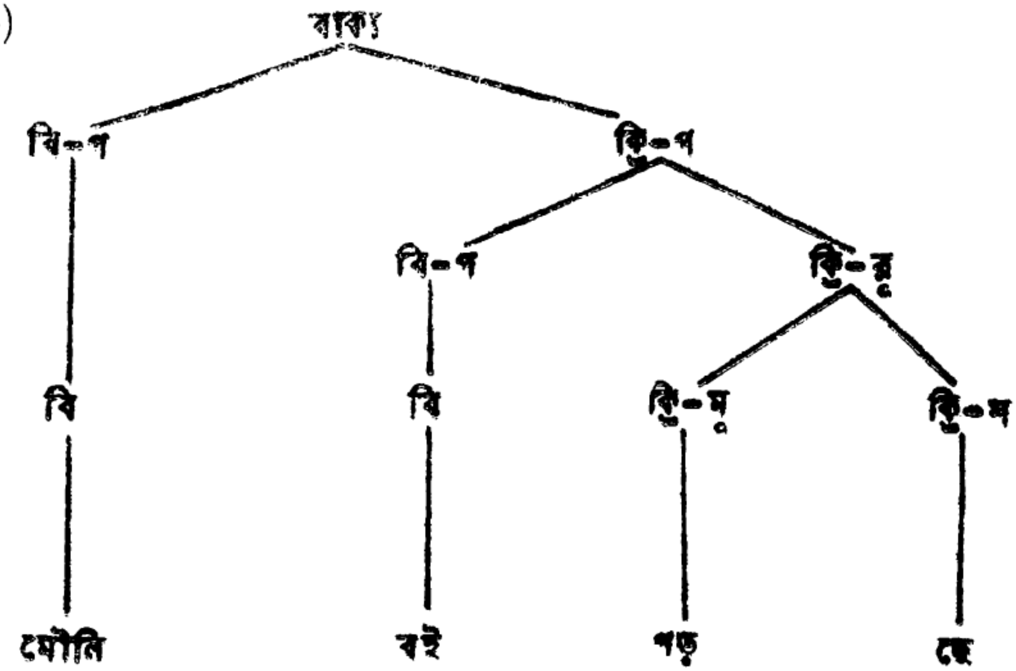

তাৎপর্যপূর্ণ, অপরিহার্য তথ্যাবলি ; অর্থাৎ (৩১) বহন করছে এ-বাক্যটির সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য। কোনো অপ্রয়োজনীয় তথ্য এতে নেই। কিন্তু (৩০)-এ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য জড়ো হ'য়ে আছে। ব্যুৎপত্তি নির্মাণ জটিল প্রক্রিয়া ব'লে রূপান্তর ব্যাকরণে বাক্যের সংগঠন দেখানোর জন্যে সাধারণত পদচিত্রই ব্যবহৃত হয়।

(৩১)-এর পদচিত্রটি ব্যাখ্যা করা যাক। পদচিত্রটিতে 'বাক্য' হচ্ছে 'আদিপ্রতীক' (দ্র Φ ১'৩'১, ১'৩'৩)। 'বিপ', 'ক্রিপ', 'বি', 'ক্রিরূ', 'ক্রিস' প্রভৃতি হচ্ছে 'অ-অন্তপ্রতীক' এবং 'মৌলি', 'বই', 'পড়্', 'ছে' প্রভৃতি হচ্ছে 'অন্তপ্রতীক'। 'বাক্য' প্রত্যক্ষভাবে 'আধিপত্য', করছে 'বিপ', ও 'ক্রিপ'র ওপর, এবং পরোক্ষভাবে আধিপত্য করছে 'বাক্য'-এর নিচের সমস্ত প্রতীকের ওপর। 'বিপ,' ও 'ক্রিপ' কেউ কারো ওপর আধিপত্য করছে না ; তবে 'বিপ' অবস্থিত 'ক্রিপ'র আগে। 'বাক্য' থেকে উৎসারিত ব'লে 'বিপ', ও 'ক্রিপ' পরস্পরের 'ভগিনী'! এবং উভয়েই 'বাক্য'-এর 'কন্যা'। পদচিত্রে দুটি প্রতীকের সংযোগস্থলের নাম হচ্ছে 'বৃন্ত' এবং 'বৃন্ত'-লগ্ন অভিধাটি হচ্ছে 'বৃন্তনাম' (যেমন : 'বিপ', 'ক্রিপ', 'ক্রিরূ' প্রভৃতি)। পদচিত্রের যে-সমস্ত প্রতীক, বা বৃন্ত অন্য কোনো বৃন্তের ওপর আধিপত্য করে না, তারা হচ্ছে 'অন্তবৃন্ত'। পদচিত্রে অন্তবৃন্তসমূহ বাঁ-থেকে-ডানে বিন্যস্ত থাকে, এবং গঠন করে পদচিত্রের 'অন্তগ্রন্থি'। (৩১)-এর অন্তগ্রন্থি হচ্ছে # মৌলি + বই + পড় + ছে #।

(৩১)-পদচিত্রটি 'মৌলি বই পড়ছে' বাক্যটির সংগঠন সম্পর্কে কি তথ্য পরিবেশন করছে? পদচিত্রের অন্তগ্রন্থিটি নির্দেশ করছে বাক্যগঠনে অংশী রূপমূলসমূহের সরলরৈখিক বিন্যাস (বাক্যটির ধ্বনিবিন্যাসপ্রসঙ্গ আমি আলোচনায় গ্রহণ করছি না)। পদচিত্রটি বাক্যগঠনে অংশী রূপমূলরাশির সরলরৈখিক বিন্যাস দেখানো ছাড়াও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে বাক্যটির উপাদানসমূহের ক্রমস্তরিক বিন্যাস। অর্থাৎ বাক্যের উপাদানপুঞ্জ বাক্যে কেবল বাঁ-থেকে-ডানে সরলরেখায় বিন্যস্ত নয়, তারা স্তরক্রমেও বিন্যস্ত।

যে-কোনো ভাষাভাষীই অস্পষ্টভাবে বোধ করেন যে বাক্যগঠনে অংশী রূপমূল, বা শব্দ-সমূহ পরস্পরবিচ্ছিন্নভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয় না ; বরং তারা অব্যবহিত শব্দ, বা রূপমূলের সাথে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে নানারকম বড়ো আকারের একক সৃষ্টি করে। বাক্যে যে-সমস্ত অবিভাজ্য সার্থ ভাষাবস্তু, অর্থাৎ রূপমূল, ব্যবহৃত হয়, তাদের বলা হয় 'অন্তউপাদান'। (৩১)-এ 'মৌলি', 'বই', 'পড়', ও 'ছে' অন্তউপাদানের উদাহরণ। বাক্যে ব্যবহৃত অন্তউপাদানসমূহ পাশের উপাদানের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ হ'তে পারে। যেমন : (৩১)-এ 'পড়', ও 'ছে'-র সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ, এবং এরা দুটিতে মিলে গঠন করেছে একটি 'উপাদান', বা একক। (৩১)-পদচিত্রটি বিভিন্ন ক্ষুদ্র উপাদানের মিলনে গঠিত বিভিন্ন বৃহত্তর উপাদান, বা 'সংগঠন' ও নির্দেশ করছে। (৩১)-এ যে- সমস্ত (সাধারণত দুটি) বৃন্ত একই বৃন্তে মিলিত, সে-সমস্ত বৃন্ত গঠন করছে উৎস-বৃন্তের নাম-ধারী একক। যেমন : 'ক্রিমূ', ও 'ক্রিস' মিলিত হয়েছে 'ক্রিরূ' বৃন্তে, তাই তারা গঠন করেছে 'ক্রিরূ' নামী সংগঠন। যে-সমস্ত উপাদান একই উৎস-বৃন্তে মিলিত হয়, তাদের বলা হয় উৎস-বৃন্তের (অর্থাৎ উৎস-বৃন্তের নামধারী সংগঠনের) 'অব্যবহিত উপাদান'। যেমন : (৩১)-এ 'বাক্য'-এর অব্যবহিত উপাদান হচ্ছে 'বিপ', ও 'ক্রিপ', কেননা তারা 'বাক্য'-বৃন্ত থেকে উৎসারিত, বা 'বাক্য'-বৃন্তে উপনীত। (৩১)-এর বিভিন্ন বৃন্তনাম নির্দেশ করছে বিভিন্ন উপাদানের ক্যাটেগরি। যেমন : 'বই'-এর উৎস-বৃন্তের নাম হচ্ছে 'বি', অর্থাৎ পদচিত্রটি নির্দেশ করছে যে 'বই'-এর পদগত পরিচয় ('ক্যাটে-গরি') হচ্ছে 'বিশেষ্য'। 'বি'-র (দ্র (৩১)) অব্যবহিত ওপরস্থিত বৃন্তনাম হচ্ছে 'বিপ', অর্থাৎ পদচিত্রটি নির্দেশ করছে যে 'বই' বিশেষ্যটি এ-বাক্যে 'বিপ', বা বিশেষ্যপদ-রূপে ব্যবহৃত। অনুরূপভাবে পদচিত্রটি নির্দেশ করছে যে 'পড়' হচ্ছে 'ক্রিয়ামূল', এবং 'ছে' হচ্ছে 'ক্রিয়াসহায়ক', আবার 'ক্রিমূ', ও 'ক্রিস' যৌথভাবে হচ্ছে 'ক্রিয়ারূপ'। অনুরূপভাবে 'বিপ', ও 'ক্রিরূ' যৌথভাবে হচ্ছে 'ক্রিয়াপদ'। অনুরূপভাবে 'মৌলি' হচ্ছে 'বিশেষ্য', এবং 'বিশেষ্যপদ'। দুটি অব্যবহিত-উপাদান 'বিপ', ও 'ক্রিপ' সম্মিলিত হ'য়ে গঠন করেছে সম্পূর্ণ বাক্যটি।

(৩১)-এর 'বিপ', 'ক্রিপ', 'বি', 'ক্রিরূ', 'ক্রিমূ', 'ক্রিস' প্রভৃতিকে বলা হয় 'বাক্যিক ক্যাটেগরি' ('সিনট্যাকটিক ক্যাটেগরি')। বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের 'পরিচয়', বা 'অভিধা' বহন করে বাক্যিক ক্যাটেগরি। এ ছাড়া আরেক রকমের ক্যাটে-গরি রয়েছে ; তার নাম 'ভূমিকাগত ক্যাটেগরি' ('ফাংশনাল ক্যাটেগরি')। ভূমিকাগত ক্যাটেগরি নির্দেশ করে বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদের 'ভূমিকা'। 'কর্তা' 'কর্ম' 'প্রত্যক্ষ কর্ম' 'গৌণ কর্ম' প্রভৃতি ভূমিকাগত ক্যাটেগরির উদাহরণ। (৩১)-পদচিত্রটিতে বাক্যের বিভিন্ন উপাদনের 'বাক্যিক ক্যাটেগরি' সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে, কিন্তু তাদের ভূমিকাগত পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। (৩১)-পদচিত্রে কোন উপাদানটি 'কর্তা', কোনটি 'কর্ম', তা কি-ভাবে জানা যাবে ? বাক্যের বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকাগত পরিচয়, এক উপায়ে, উল্লেখ ক'রে দেয়া সম্ভব ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক সূত্রে। পদ-সাংগঠনিক সূত্রেই নির্দেশ ক'রে দেয়া যায় যে বিশেষ এক বিশেষ্যপদ হচ্ছে বাক্যের কর্তা বা কর্ম ইত্যাদি। যেমন : রচনা করা সম্ভব (৩২)-এর মতো সূত্র :

(৩২)	ক	বাক্য	→	বিপ$_{\text{কর্তা}}$	+	ক্রিপ
	খ	ক্রিপ	→	বিপ$_{\text{কর্ম}}$	+	ক্রিরূ

(৩২)-এর সূত্র দুটি বিশেষ্যপদের ভূমিকাও নির্দেশ ক'রে দিয়েছে। কিন্তু এ-ধরনের নির্দেশ নানা কারণে গ্রহণঅযোগ্য। এতে ব্যাকরণের সূত্রই শুধু জটিল হ'য়ে

ওঠে না, বরং এ-রকম সূত্র বিভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ বোধের প্রকাশ। কোনো পদচিত্রের বিভিন্ন বাক্যিক ক্যাটেগরির ভূমিকাগত পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব পদচিত্র থেকেই। চমস্কি (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৭১)) পদচিত্র থেকেই নির্ণয় করতে চেয়েছেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন পদের ভূমিকাগত পরিচিতি। তাঁর মতে, যে-বিশেষ্য পদটির ওপর 'বাক্য' প্রত্যক্ষ-ভাবে আধিপত্য করে, সে-টিই হচ্ছে 'কর্তা', আর যে-বিশেষ্যপদটির ওপর 'ক্রিপ' প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করে, সে-টি হ'চ্ছে 'কর্ম'। (৩১)-এ 'বাক্য' প্রত্যক্ষভাবে আধি-পত্য করে সর্ববামের 'বিপ'-র ওপর ('মৌলি'); এবং 'ক্রিপ' প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করে দ্বিতীয় 'বিপ'-র ওপর ('বই')। সুতরাং 'মৌলি', ও 'বই' হ'চ্ছে যথাক্রমে এ-বাক্যের 'কর্তা', ও 'কর্ম'। চমস্কির আধিপত্যমূলক প্রণালিতে অবশ্য কর্তা-কর্ম নির্ণয় সর্বদা, এবং সব ভাষায়, সম্ভব নয়।

পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ হ'চ্ছে 'অব্যবহিত-উপাদান ব্যাকরণ'। তবে এতে অব্যবহিত-উপাদানতত্ত্বকে সুস্পষ্ট, সুষ্ঠু, ও সুশৃঙ্খল রূপ দেয়া হয়েছে। এ-ব্যাকরণ বাক্য বর্ণনা করে না, সৃষ্টি করে, এবং সৃষ্ট সমস্ত বাক্যের স্বয়ংক্রিয় সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়। এ-ব্যাকরণ বাক্যের উপাদানরাশির যেমন দেয় সরলরৈখিক বর্ণনা, তেমনি তা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে উপাদানসমূহের ক্রমস্তরিক সংগঠন। অর্থাৎ বাক্যের 'গভীরতা' ও সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে পদসাংগঠনিক ব্যাকরণে। (২৯)-এর ব্যাকরণটি খণ্ডিত ও দুর্বল: এটিকে সম্প্রসারিত করা যায় নানাভাবে। এটির সৃষ্টিক্ষমতা অতি সামান্য, এবং এটি প্রচুর ত্রুটিপূর্ণ বাক্যও সৃষ্টি করবে। এখন প্রশ্ন হ'চ্ছে পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে কোনো ভাষার 'সমস্ত শুদ্ধ, এবং কেবল শুদ্ধ' বাক্য সৃষ্টি করা সম্ভব কি-না? চমস্কি (দ্র চমস্কি (১৯৫৭)) মনে করেন যে ইংরেজি ভাষার সমস্ত বাক্য পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করা সম্ভব; তবে তাতে নানারকম জটিলতা ছড়িয়ে পড়ে দিকেদিকে, এবং অনেক সময় দিতে হয় ভাষাবোধবিরোধী বর্ণনা। কেউকেউ অবশ্য দাবি করেছেন যে পদ-সাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে সব ভাষার সমস্ত বাক্য সৃষ্টি সম্ভব নয় (দ্র লায়নস (১৯৭০))। বাঙলা ভাষার সমস্ত বাক্য, সম্ভবত, পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু তাতে দেখা দেবে বিপুল জটিলতা। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের ব্যাপক সীমাবদ্ধতা রয়েছে (দ্র চমস্কি) ১৯৫৭, ৩৪-৪৮), পোস্টাল (১৯৬৪ Φ ১'৪'৩))। তবে পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ ব্যবহার করা হয় রূপান্তর ব্যাকরণের ভিত্তি অংশে। ভিত্তি অংশে পদসাংগঠনিক সূত্ররাশি রচনা করে বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন, যার ওপর রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যায় বাক্যের বহিঃসংগঠন। (দ্র Φ১'৫'১'১; Φ১'৬'৩)।

১'৪'১ প্রতিবেশমুক্ত ও প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ: কর্তাক্রিয়ারূপ সংগতি

দু'রকম—প্রতিবেশমুক্ত ও প্রতিবেশকাতর—পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্রের পরিচয়, Φ১'৩'২ পরিচ্ছেদাংশে, দেয়া হয়েছে। প্রতিবেশমুক্ত সূত্রে একটি প্রতীককে সম্প্রসারিত করা হয় শর্তহীনভাবে; এবং প্রতিবেশকাতর সূত্রে সম্প্রসারিত করা হয় প্রতিবেশগত শর্তসাপেক্ষে। যে-ব্যাকরণ কেবল প্রতিবশমুক্ত সূত্রর সমষ্টি, সে-ব্যাকরণ হ'চ্ছে 'প্রতি-বেশমুক্ত ব্যাকরণ'; আর যে-ব্যাকরণে অন্তত একটি প্রতিবেশকাতর সূত্র ব্যবহৃত, সে-ব্যাকরণ হ'চ্ছে 'প্রতিবেশকাতর, বা প্রতিবেশনিয়ন্ত্রিত ব্যাকরণ'। প্রতিবেশমুক্ত ব্যাকরণ-কেও ধরা হয় একরকম প্রতিবেশকাতর ব্যাকরণ ব'লে, যাতে 'শূন্য' প্রতিবেশগত শর্ত বিদ্যমান। একই উপাত্ত বর্ণনা সম্ভব উভয় প্রকার ব্যাকরণের সাহায্যে। প্রতিবেশ-কাতর ব্যাকরণ প্রতিবেশমুক্ত ব্যাকরণের চেয়ে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন। এদের মধ্যে উৎকৃষ্টতর কোনটি? এর কোনো সুস্পষ্ট, পূর্বনির্দিষ্ট উত্তর নেই। যে-ব্যাকরণ ভাষাভাষীর

বোধিকে পরিতৃপ্ত ক'রে বাক্যসৃষ্টি করতে পারবে, সেটিই উৎকৃষ্ট। প্রতিবেশমুক্ত সূত্রের উদাহরণ হচ্ছে (৩৩ক), এবং প্রতিবেশকাতর সূত্রের উদাহরণ হচ্ছে (৩৩খ):

(৩৩) ক ক → খ

খ ক → খ / গ—

(৩৩ক)-তে নির্দেশ দেয়া হয়েছে 'ক'-কে নিঃশর্তে 'খ'-রূপে পুনরায় লেখার জন্যে; কিন্তু (৩৩খ)-তে আরোপ করা হয়েছে একটি প্রতিবেশগত শর্ত। (৩৩খ)-তে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে যদি 'ক'-এর বাঁয়ে 'গ' থাকে, তবে 'ক'-কে 'খ'-রূপে পুনরায় লিখতে হবে।

পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায়ই কর্তা ও ক্রিয়ারূপের মধ্যে কোনো-না-কোনো রকম 'সংগতি'—'কংকর্ড', 'এগ্রিমেণ্ট'—থাকে; এবং বাঙলা ভাষায়ও আছে। বাঙলা ভাষায় কর্তা যে-'পুরুষ+শ্রেণী'-র হয়, ক্রিয়ারূপও হয় সে-'পুরুষ+শ্রেণী'-র। (৩৪)-এর উপাত্ত লক্ষণীয়:

(৩৪)
ক আমি / আমরা করি।
ক´ আমি / আমরা করছি।
ক´´ আমি / আমরা করেছি।
খ আপনি / আপনারা করেন।
খ´ আপনি / আপনারা করছেন।
খ´´ আপনি / আপনারা করেছেন।
গ তুমি / তোমরা করো।
গ´ তুমি / তোমরা করছো।
গ´´ তুমি / তোমরা করেছো।
ঘ তুই / তোরা করিস।
ঘ´ তুই / তোরা করছিস।
ঘ´´ তুই/তোরা করেছিস।
ঙ তিনি/তাঁরা করেন।
ঙ´ তিনি/তাঁরা করছেন।
ঙ´´ তিনি/তাঁরা করেছেন।
চ সে/তারা করে।
চ´ সে/তারা করছে।
চ´´ সে/তারা করছে।

(৩৪)-এ ব্যাপক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় নি; শুধুমাত্র বর্তমান কালে বিভিন্ন 'আস্পেক্ট'-এ ক্রিয়ারূপ কর্তার সাথে কি-রকম সংগতি রক্ষা করে, উপাত্তে কেবল তাই দেখানো হয়েছে। এ-উপাত্তে দেখা যায় যে বাঙলা ক্রিয়ারূপ বাক্যের কর্তার সাথে 'পুরুষ+শ্রেণী'-গত সংগতি রক্ষা করে। বাঙলায় 'পুরুষ' আছে তিন রকম: প্রথম পুরুষ ('আমি'/'আমরা'), দ্বিতীয় পুরুষ ('আপনি'/'আপনারা', 'তুমি'/'তোমরা', 'তুই'/'তোরা'), এবং তৃতীয় পুরুষ ('তিনি'/'তাঁরা', 'সে'/'তারা'); এবং 'শ্রেণী' রয়েছে তিন রকম: 'সম্মানিত' ('আপনি', 'তিনি'), 'সাধারণ' ('তুমি', 'সে'), এবং 'হীন' (তুই')। 'শ্রেণী' ব্যাপারটি সব পুরুষে প্রযোজ্য নয়: প্রথম পুরুষ শ্রেণী-

হীন ('আমি' সম্মান-অসম্মাননিরপেক্ষ)। দ্বিতীয় পুরুষে তিনটি শ্রেণী-ই বিদ্যমান 'আপনি', 'তুমি', এবং 'তুই'। তৃতীয় পুরুষে বিদ্যমান দুটি শ্রেণী : 'তিনি', 'সে'। (৩৪)-এর উপাত্তে দেখা যায় যে ক্রিয়ারূপ কর্তার পুরুষ+শ্রেণী-অনুসরণে বিভিন্ন। যেমন : 'আমি করি' : 'তুমি করো'। ক্রিয়ারূপ শুধু শ্রেণীগত কারণেও ভিন্ন হয় ;—যেমন 'আপনি করেন' : 'তুমি করো'। এখানে 'আপনি' ও 'তুমি' একই পুরুষের, তবে তাদের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য রয়েছে ব'লে ক্রিয়ারূপও বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। লক্ষণীয় যে দ্বিতীয় পুরুষের সম্মানাত্মক ক্রিয়ারূপ ('আপনি করেন'), এবং তৃতীয় পুরুষের সম্মানাত্মক ক্রিয়ারূপ ('তিনি করেন') আকারে অভিন্ন। লিঙ্গানুসরণে বাঙলায় ক্রিয়ারূপ ভিন্ন হয় না;—যেমন : 'সে (পুং/স্ত্রী) করে'। বচন-অনুসরণেও বাঙলা ক্রিয়ারূপ ভিন্ন হয় না;—যেমন : 'আমি / আমরা করি'। বাঙলায় ক্রিয়ারূপ বাক্যের কর্তার পুরুষ+শ্রেণী (যেখানে প্রযোজ্য)-অনুসরণে ভিন্ন হয়। তাই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি যে 'বাঙলা ক্রিয়ারূপ বাক্যের কর্তার সাথে পুরুষ ও শ্রেণী(যেখানে প্রযোজ্য)-গত সংগতি রক্ষা করে।'

কর্তা-ক্রিয়ারূপের উল্লিখিত সংগতি কি-ভাবে সুষ্ঠু, সুস্পষ্ট, সুশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ করা যায়? প্রচলিত ব্যাকরণে ক্রিয়ামূলসমূহকে বিন্যস্ত করা হয় বিভিন্ন 'গণ'-এ, তালিকা দেয়া হয় 'ক্রিয়াবিভক্তি'সমূহের, এবং ক্রিয়ারূপ গঠনের একরকম অস্পষ্ট নিয়ম নির্দেশ করা হয়। বাঙলা ভাষার সমস্ত ক্রিয়ারূপ সৃষ্টির সুস্পষ্ট সূত্র বেশ জটিল হ'তে বাধ্য (এ-উক্তি প্রযোজ্য সব ভাষার ক্ষেত্রেই)। এখন আমরা এমন একটি ব্যাকরণ চাই যা (৩৪)-এর উপাত্তের কর্তা ও ক্রিয়ারূপের সংগতি নির্ভুলভাবে নির্দেশ করবে। কি-রকম ব্যাকরণের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে উল্লিখিত সংগতি? কর্তা-ক্রিয়ারূপের সংগতি দেখানো যায় 'প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের' সাহায্যে, এবং 'প্রতি-বেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ'-এর সাহায্যে, এবং 'রূপান্তর ব্যাকরণ'-এর সাহায্যে। এখানে 'প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ', ও 'প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ'-এর সাহায্যে কি-ভাবে (৩৪)-এর উপাত্ত সৃষ্টি করা যায়, এবং সংগতি-সূত্র নির্দেশ করা যায়, তাই বিবেচনা করা হবে। ব্যাকরণের সূত্ররচনার আগে যা বিবেচনা করা দরকার ভালোভাবে :

[ক] 'ক্রিয়ারূপ' বলতে কি বুঝছি আমরা? 'ক্রিয়ারূপ' বলতে বুঝছি 'ক্রিয়ামূল' ও 'ক্রিয়াসহায়ক'-এর মিলনে গঠিত ভাষাবস্তুকে। বাঙলা 'ক্রিয়ারূপ'কে সহজেই ভাগ করা যায় দু'ভাগে : একদিকে থাকে অপরিবর্তনীয় (এদের কখনো কখনো ঘটে রূপধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন) 'ক্রিয়ামূল', এবং অন্য দিকে থাকে এমন ভাষাবস্তু, যাকে সাময়িকভাবে নাম দেয়া হয়েছে 'ক্রিয়াসহায়ক' (প্রচলিত ব্যাকরণী নাম 'ক্রিয়াবিভক্তি', যা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর)। 'করি', 'করছি', 'করেছি,' 'করেন', 'করছেন', 'করেছেন' প্রভৃতি ক্রিয়ারূপের নিদর্শন। এদের সহজেই ভাগ করা যায় দু'ভাগে ;—যেমন : 'করি'='কর'+'ই' ; 'করছি'='কর'+'ছি' ; 'করেছি'='কর'+'এছি'। এদের প্রথমাংশ, ক্রিয়ামূল, রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কারণ ছাড়া বদলায় না ; এবং দ্বিতীয়াংশ, ক্রিয়াসহায়ক, ('ই', 'ছি', 'এছি' প্রভৃতি), নিয়ত পরিবর্তমান।

[খ] 'ক্রিয়াসহায়ক' কি নির্দেশ করে? একটু মনোনিবেশ করলে বোঝা যায় যে তিন রকম 'বোধ'—'কাল', 'ক্রিয়ারীতি' ('আস্পেক্ট'), ও 'পুরুষ+শ্রেণী'—নির্দেশ করে এ-আপাতঅবিশ্লেষ্য বস্তুরাশি। যেমন : 'করছি'র 'ছি' নির্দেশ করছে 'কাল'

(বর্তমান), 'ঘটমান ক্রিয়ারীতি' (অর্থাৎ ক্রিয়াটি ঘটমান), এবং 'পুরুষ' (যিনি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করছেন, তিনি প্রথম পুরুষের)। কয়েকটি উদাহরণ :

করছেন = কর বর্তমান ··· ঘটমান ··· দ্বিতীয়/তৃতীয় পুরুষ, সম্মানাত্মক

করছো = কর বর্তমান ··· ঘটমান ··· দ্বিতীয় পুরুষ, সাধারণ

করছিস = কর + বর্তমান ঘটমান ··· দ্বিতীয় পুরুষ, হীন

করছে = কর + বর্তমান ঘটমান ··· তৃতীয় পুরুষ, সাধারণ

দেখা যাচ্ছে যে 'ছি' নির্দেশ করে 'বর্তমান কাল, ঘটমানতা, ও প্রথম পুরুষ' ; 'ছেন' নির্দেশ করে 'বর্তমানকাল, ঘটমানতা, ও দ্বিতীয়/তৃতীয় পুরুষ ও সম্মানাত্মক শ্রেণী' ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'ই', 'এন', 'ছি', 'ছেন' প্রভৃতি কি বিভাজ্য, না অবিভাজ্য ? এ-গুলোকে কি আরো ভেঙে দেখানো সম্ভব এদের কোন অংশ নির্দেশ করে 'কাল', কোন অংশ নির্দেশ করে ক্রিয়ারীতি', এবং কোন অংশ নির্দেশ করে 'পুরুষ (শ্রেণী)' ? অনেকের কাছে মনে হ'তে পারে যে এরা অবিশ্লেষ্য। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে 'ই'-কে ('করি' = 'কর' + 'ই') : এটিতো গঠিত ক্ষুদ্রতম ধ্বনিতে। এ-ক্ষীণ তনুকে আর ভাঙা যায় কি-ভাবে ? আর কি-ভাবেই বা দেখানো যায় এর কোন অঙ্গ পালন করছে কোন ভূমিকা ?

বাঙলা 'ক্রিয়ারূপ' বিশ্লেষণ, বা সৃষ্টির জন্যে তিনটি পথ খোলা আছে ভাষাবিজ্ঞানীর সামনে :

(৩৫) ক তিনি মনে করতে পারেন যে বাঙলা ক্রিয়ারূপগুলো ('করি', 'করছি', 'করেছি', 'করেন', 'করছেন', 'করেছেন' প্রভৃতি) অবিশ্লেষ্য। ভাষাভাষীরা এ-গুলো শেখে স্বতন্ত্রভাবে;—তাই ব্যাকরণের কাজ হলো বাঙলা ভাষার সমস্ত ক্রিয়ারূপের তালিকা রচনা করা, এবং কোন কর্তার সাথে কোন ক্রিয়ারূপ ব্যবহৃত হ'তে পারে, তা নির্দেশ করা।

খ তিনি মনে করতে পারেন যে বাঙলা ক্রিয়ারূপগুলো বিশ্লেষ্য ('করি' = 'কর' + 'ই', 'করছি' = 'কর' + 'ছি' প্রভৃতি), তবে ক্রিয়াসহায়কগুলো অবিশ্লেষ্য ('ই', 'ছি', 'এছি' প্রভৃতি)। ক্রিয়াসহায়কগুলো একদেহে নির্দেশ করে 'কাল-ক্রিয়ারীতি-পুরুষ (শ্রেণী)'। তাই ব্যাকরণের কাজ হলো বাঙলা ভাষার সমস্ত ক্রিয়াসহায়কের তালিকা প্রস্তুত করা, এবং কোন কর্তার সাথে কোন ক্রিয়াসহায়ক ব্যবহৃত হ'তে পারে, তা নির্দেশ করা।

গ তিনি মনে করতে পারেন যে বাঙলা ক্রিয়ারূপগুলো বিশ্লেষ্য, এবং ক্রিয়া-সহায়কগুলোও বিশ্লেষ্য। তাই ব্যাকরণের কাজ হলো ক্রিয়াসহায়কগুলোকে বিশ্লেষণ করা, এবং ক্রিয়াসহায়কের কোন অংশ কি নির্দেশ করে, তা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা।

সামান্য অভিনিবেশেই বোঝা যায় যে প্রথম সিদ্ধান্তটি ভ্রান্ত। বাঙলাভাষীরা প্রতিটি ক্রিয়ারূপকে পৃথকভাবে আয়ত্ত করে না। বাঙলা ক্রিয়ারূপ গঠনের রয়েছে আন্তর

সূত্র, যার সাহায্যে বিচিত্র ক্রিয়ারূপ গঠন করা যায়। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিকে গ্রহণ করা যায় স্বাভাবিক ভাষাবোধসম্পন্ন বাঙলাভাষীর ক্রিয়ারূপসম্পর্কিত ধারণার প্রকাশ ব'লে। সাধারণ বাঙলাভাষীর কাছে ক্রিয়ারূপ বিশ্লেষণযোগ্য বস্তু; ক্রিয়াসহায়ক অবিশ্লেষ্য। ক্রিয়াসহায়কের কোন অংশ কি নির্দেশ করে, তা বলা সাধারণ বাঙলাভাষীর পক্ষে অসম্ভব। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি স্বাভাবিক ভাষাবোধসম্মত, এবং প্রথম সিদ্ধান্তের চেয়ে অনেক উন্নত। তৃতীয় সিদ্ধান্তটি সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী : এ-সিদ্ধান্ত সাধারণ ভাষাবোধকে অতিক্রম ক'রে গেছে। এ-সিদ্ধান্তটি সুগভীর ভাষাবোধের নিদর্শন। ভাষাবিজ্ঞানী যদি তাঁর এ-বোধকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেন, দেখিয়ে দিতে পারেন যে ক্রিয়াসহায়ক বিশ্লেষ্য, এবং ক্রিয়াসহায়কের কোন অংশ কি নির্দেশ করে, তা যদি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেন, তবে তাঁর ব্যাকরণই হবে উৎকৃষ্টতম।

(৩ক)-র সিদ্ধান্তকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে শুধু প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে। এ-ব্যাকরণে থাকবে না কোনো প্রতিবেশকাতর সূত্র, এর সমস্ত সূত্র প্রতিবেশমুক্ত। (৩ক)-র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (৩৪)-উপাত্তের প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ হবে (৩৬) :

(৩৬) **প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ [এক]**

ক বাক্য → {
বিপ-প্রপু + ক্রিরূ-প্রপু
বিপ-দ্বিপু-সম্মান + ক্রিরূ-দ্বিপু-সম্মান
বিপ-দ্বিপু-সাধারণ + ক্রিরূ-দ্বিপু-সাধারণ
বিপ-দ্বিপু-হীন + ক্রিরূ-দ্বিপু-হীন
বিপ-তৃপু-সম্মান + ক্রিরূ-তৃপু-সম্মান
বিপ-তৃপু-সাধারণ + ক্রিরূ-তৃপু-সাধারণ
}

খ	বিপ-প্রপু	→	আমি, আমরা
গ	বিপ-দ্বিপু-সম্মান	→	আপনি, আপনারা
ঘ	বিপ-দ্বিপু-সাধারণ	→	তুমি, তোমরা
ঙ	বিপ-দ্বিপু-হীন	→	তুই, তোরা
চ	বিপ-তৃপু-সম্মান	→	তিনি, তাঁরা
ছ	বিপ-তৃপু-সাধারণ	→	সে, তারা
জ	ক্রিরূ-প্রপু	→	করি, করছি, করেছি,···

ঋ { ক্রিরূ-দ্বিপু-সম্মান / ক্রিরূ-তৃপু-সম্মান } → করেন, করছেন, করেছেন,···

ঞ ক্রিরূ-দ্বিপু-সাধারণ → করো, করছো, করেছো,···

ট ক্রিরূ-দ্বিপু-হীন → করিস, করছিস, করেছিস,···

ঠ ক্রিরূ-তৃপু-সাধারণ → করে, করছে, করেছে,···

[সংক্ষেপসূত্র : বিপ-প্রপু : বিশেষ্যপদ-প্রথম পুরুষ ; বিপ-দ্বিপু-সম্মান : বিশেষ্যপদ-দ্বিতীয় পুরুষ-সম্মানাত্মক ; বিপ-দ্বিপু-সাধারণ : বিশেষ্যপদ-দ্বিতীয় পুরুষ-সাধারণ প্রভৃতি ; ক্রিরূ-প্রপু : ক্রিয়ারূপ-প্রথম পুরুষ ; ক্রিরূ-দ্বিপু-সম্মান : ক্রিয়ারূপ-দ্বিতীয় পুরুষ-সমানাত্মক, ক্রিরূ-দ্বিপু-সাধারণ : ক্রিয়ারূপ-দ্বিতীয় পুরুষ-সাধারণ প্রভৃতি।]

(৩ক)-র সিদ্ধান্ত অনুসারে রচিত (৩৬)-এর প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণটি (৩৪)-উপাত্তের সমস্ত বাক্য নির্ভুলভাবে সৃষ্টি করবে। তবে উপাত্ত-বহির্ভূত কোনো বাক্য এ-ব্যাকরণ সৃষ্টি করবে না ; অর্থাৎ এ-ব্যাকরণটি, সৃষ্টিশীল নয়, বর্ণনামূলক। (৩৬)-এর ব্যাকরণটি সৃষ্ট বাক্যের যে-পদসাংগঠনিক বর্ণনা দেবে, তা দেখা যাবে (৩৭)-এর পদচিত্রে :

(৩৭)

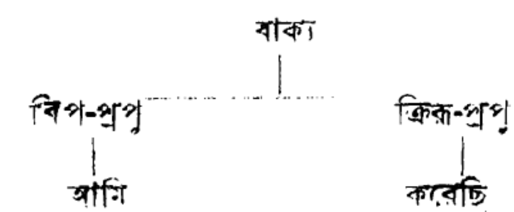

(৩৬)-এর প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণটি মর্মমূলে ত্রুটিপূর্ণ : এটি রচিত হয়েছে ভ্রান্ত বিশ্লেষণ ভিত্তি ক'রে। (৩৬ক) —সূত্রটি নির্দেশ করছে যে বাঙলায় ছ'রকম বাক্য-সংগঠন রয়েছে, এবং তারা পরস্পরসম্পর্কশূন্য। এ-ব্যাকরণ অনুসারে বাঙলা ভাষার প্রতিটি বাক্য পুরুষ (শ্রেণী) ভিত্তিতে ছ'ভাগে বিভক্ত ; আবার বিশেষ্যপদ ও ক্রিয়ারূপসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত পুরুষ (শ্রেণী)-অনুসারে। এ-বিশ্লেষণ ভ্রান্ত। এটির মতে বাঙলা ক্রিয়া-রূপসমূহ অবিভাজ্য : ক্রিয়ামূল ও ক্রিয়াসহায়কের সমবায়ে ক্রিয়ারূপ গঠনের কোনো উপায় নেই বাঙলায়। (৩৬)-এর ব্যাকরণটি ভবিষ্যদ্বাণী করে যে বাঙলাভাষীরা বাঙলা ভাষার সমস্ত ক্রিয়ারূপ পৃথক ও অবিভাজ্য শব্দ রূপে আয়ত্ত ক'রে থাকে। এ-ধারণাও ভ্রান্ত। বাঙলা বিশেষ্য ও সর্বনাম বচনভেদে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে, কিন্তু এ-ব্যাকরণ বচন-ভেদ স্বীকার করে না। এ-ব্যাকরণে 'আমি/আমরা', 'তুমি/তোমরা'র মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (৩৬)-ব্যাকরণটি (৩৪)-উপাত্তের বিভিন্ন ভাষাবস্তুর তালিকামাত্র, যাতে বিভিন্ন ভাষাবস্তুর সহাবস্থানের সূত্র রচনা করা হয়েছে। ব্যাকরণটি অবশ্য (৩৪)-উপাত্তের বাক্যসমূহ নির্ভুলভাবে সৃষ্টি করে, তাই এটি অর্জন করেছে 'পর্যবেক্ষণাত্মক যোগ্যতা' (দ্র *φ* ১.২.৪)। কিন্তু ভাষাবোধবিরোধী প্রক্রিয়ায় বাক্য সৃষ্টি করে ব'লে এটি অত্যন্ত দুর্বল, ও ত্রুটিপূর্ণ ব্যাকরণ।

এবার (৩৫খ)-সিদ্ধান্ত অনুসারে (৩৪)-উপাত্তের বাক্যরাশি সৃষ্টির জন্যে একটি পদ-সাংগঠনিক ব্যাকরণ রচনা করা যাক। (৩৫খ)-সিদ্ধান্ত হচ্ছে বাঙলা ক্রিয়ারূপ দু'অংশে—ক্রিয়ামূল ও ক্রিয়াসহায়ক—বিভাজ্য। ক্রিয়াসহায়ক অবিভাজ্য : তা অভগ্নরূপে যুগপৎ বহন করে 'কাল-ক্রিয়ারীতি-পুরুষ (শ্রেণী)'। (৩৫খ)-র একটি চমৎকার বোধ হচ্ছে যে ক্রিয়াসহায়কের ব্যবহার নির্ভরশীল বাক্যের কর্তার ওপর : বাক্যের কর্তা-বিশেষ্য-পদ যে-পুরুষ (শ্রেণী)র ক্রিয়াসহায়কও হবে সে-পুরুষ (শ্রেণী)র। অর্থাৎ কর্তা ক্রিয়াসহায়কের নিয়ন্ত্রক। (৩৫খ)-সিদ্ধান্ত নির্দেশ করছে যে বাঙলা ক্রিয়ারূপ কর্তার সাথে পুরুষ (শ্রেণী)-গত 'সংগতি' রক্ষা করে। এ-সিদ্ধান্ত অনুসারে ক্রিয়ারূপের ব্যবহার কর্তার ওপর নির্ভরশীল ব'লে দরকার হবে প্রতিবেশকাতর সূত্র : এ-বোধ প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ-বোধকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যে চাই 'প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ'। এ-ব্যাকরণটি (৩৬)-এর প্রতিবেশমুক্ত ব্যাকরণ থেকে আন্তর গুণেই উৎকৃষ্ট, কেননা এতে যে-বোধ প্রকাশিত, তা অনেক গভীর, ও বাঙলাভাষীর বোধসম্মত। (৩৫খ)-সিদ্ধান্ত অনুসারে (৩৪)-এর উপাত্ত সৃষ্টির জন্যে দরকার হবে (৩৮)-এর 'প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ (এক)' :

(৩৮) **প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ [এক]**

ক	বাক্য	→	বিপ + ক্রিপ
খ	ক্রিপ	→	ক্রিরূ
গ	ক্রিরূ	→	ক্রিমূ + ক্রিস
ঘ	বিপ	→	{ বিপ-প্রপু / বিপ-দ্বিপু-সম্মান / বিপ-দ্বিপু-সাধারণ / বিপ-দ্বিপু-হীন / বিপ-তৃপু-সম্মান / বিপ-তৃপু-সাধারণ }
ঙ	বিপ-প্রপু	→	আমি, আমরা
চ	বিপ-দ্বিপু-সম্মান	→	আপনি, আপনারা
ছ	বিপ-দ্বিপু-সাধারণ	→	তুমি, তোমরা
জ	বিপ-দ্বিপু-হীন	→	তুই, তোরা
ঝ	বিপ-তৃপ-সম্মান	→	তিনি, তাঁরা

ঞ বিপ-তৃপু-সাধারণ → সে, তারা

ট ক্রিমূ → কর

ঠ ক্রিপ →

রূপ	পরিবেশ
ই / ছি / এছি	/ বিপ-প্রপু —
এন / ছেন / এছেন	/ বিপ-দ্বিপু-সম্মান — ; বিপ-তৃপু-সম্মান
ও / ছো / এছো	/ বিপ-দ্বিপু-সাধারণ —
ইস / ছিস / এছিস	/ বিপ-দ্বিপু-হীন —
এ / ছে / এছে	/ বিপ-তৃপু-সাধারণ —

(৩৮) একটি 'প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ', কেননা এতে একটি প্রতিবেশকাতর সূত্র, (৩৮ঠ), ব্যবহৃত। (৩৪)-উপাত্তের সমস্ত বাক্য সৃষ্ট হবে এটির সূত্র-প্রয়োগে, এবং (৩৮ট) সূত্রে যদি সন্নিবিষ্ট হয় আরো ক্রিয়ামূল, তবে এটি উপাত্ত-বহির্ভূত প্রচুর বাক্য সৃষ্টি করবে। নানা দিকে (৩৮)-ব্যাকরণটি উৎকৃষ্টতর (৩৬)-ব্যাকরণ থেকে। এ-ব্যাকরণের প্রথম সূত্রটি, (৩৮ক), উপাত্তের সমস্ত বাক্যের জন্যে নির্দেশ করছে মাত্র একটি মৌল সংগঠন—বিপ + ক্রিপ—অর্থাৎ (৩৪)-উপাত্তের সমস্ত বাক্যের সংগঠন অভিন্ন। (৩৬)-এর ব্যাকরণটি যেখানে দেখিয়েছিলো ছ'রকম সংগঠন, সেখানে এটি দেখাচ্ছে এক রকম সংগঠন। আগের ব্যাকরণের মতে যে-সমস্ত বাক্য সম্পর্কশূন্য, এ-ব্যাকরণের মতে সে-সমস্ত বাক্য সংগঠনগতভাবে অভিন্ন। (৩৮)-এর বোধ উৎকৃষ্ট ভাষাবোধের নিদর্শন, তাই এটি (৩৬) থেকে উৎকৃষ্টতর। (৩৮)-ব্যাকর-

ণের (৩৮ঘ) সূত্রটি বাক্যের কর্তা-বিশেষ্যপদসমূহকে, পুরুষ(শ্রেণী) অনুসারে, ভাগ করেছে ছটি শ্রেণীতে ; অর্থাৎ বাঙলায় বিশেষ্যপদ তাৎপর্যপূর্ণ ছ-শ্রেণীভুক্ত। (৩৮গ)-সূত্রটি ক্রিয়ারূপকে ভাগ করেছে দু-অংশে : 'ক্রিমূ', ও 'ক্রিস' অংশে। (৩৮)-ব্যাকরণটির বড়ো সাফল্য হচ্ছে এটি ক্রিয়াসহায়কসমূহকে কর্তা বিশেষ্যপদের পুরুষ(শ্রেণী)র ওপর নির্ভরশীল ব'লে নির্দেশ করেছে। (৩৮ঠ) সূত্রটি লক্ষণীয় : এ-সূত্রটি ক্রিয়াসহায়ককে কোন প্রতিবেশে কি-রূপে সম্প্রসারিত করতে হবে, তা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে। সূত্রটিতে একত্রিত হয়েছে অনেকগুলো বিকল্পসূত্র। সূত্রটি নির্দেশ করছে যে ক্রিয়া-সহায়কের বাঁ-দিকে যদি থাকে প্রথম পুরুষসূচক বিশেষ্যপদ (অর্থাৎ কর্তা-বিশেষ্য-পদটি যদি প্রথম পুরুষসূচক হয়) তবে ক্রিয়াসহায়কের রূপ হবে 'ই', বা 'ছি', বা 'এছি', যদি ক্রিয়াসহায়কের বাঁ-দিকে থাকে সম্মানাত্মক দ্বিতীয়, বা তৃতীয় পুরুষসূচক বিশেষ্য-পদ, তবে ক্রিয়াসহায়কের রূপ হবে 'এন', বা 'ছেন', বা 'এছেন' ইত্যাদি। (৩৮)-ব্যাকরণটি সৃষ্ট বাক্যের (৩৯)-রূপী সাংগঠনিক বর্ণনা দেবে

(৩৯)

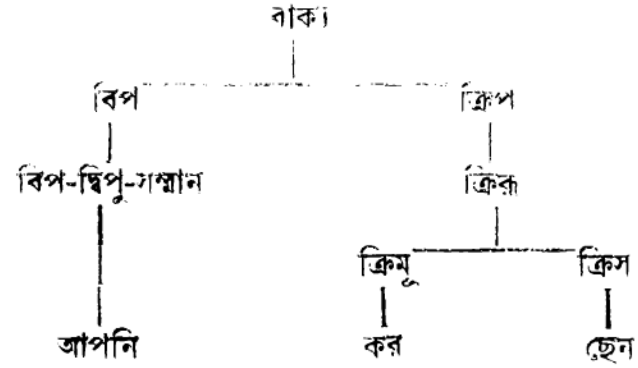

(৩৯)-এর অন্তগ্রন্থির ওপর রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে 'আপনি করছেন' বাক্যটি। অন্যান্য সূত্র প্রয়োগে পাওয়া যাবে (৩৪)-উপাত্তের অন্যান্য বাক্য। (৩৬)-এর প্রতিবেশমুক্ত ব্যাকরণ, ও (৩৮)-এর প্রতিবেশকাতর ব্যাকরণ একই উপাত্ত সৃষ্টি করে ; তাই ব্যাকরণ দুটি 'দুর্বলভাবে সমতুল্য' (দ্র *Φ* ১'২'৫)। কিন্তু (৩৭), ও (৩৯)-এর তুলনা ক'রে বোঝা যায় যে এরা সৃষ্ট বাক্যের বিভিন্ন সাংগঠনিক বর্ণনা দেয় : অর্থাৎ এরা 'শক্তিমানভাবে সমতুল্য' নয়। এদের সৃষ্টিশক্তি ভিন্ন। ব্যাকরণ মূল্যায়-নের মাণদণ্ড প্রয়োগ করলে দেখা যাবে যে (৩৮)-ব্যাকরণটি (৩৬) থেকে অনেক উন্নত (দ্র *Φ* ১'২'৫)। (৩৬)-এর পদসাংগঠনিক প্রতিবেশমুক্ত ব্যাকরণটি ভবিষ্যদ্বাণী করে যে বাঙলাভাষীরা পুরুষ(শ্রেণী)-অনুসারে বাঙলা বাক্যের শ্রেণীকরণ ক'রে থাকে, এবং বিশেষ্যপদসমূহকেও শ্রেণীবিন্যস্ত ক'রে থাকে পুরুষ(শ্রেণী) অনুসারে (দ্র ৩৬ক, ৩৬খ—ছ)। ব্যাকরণটির এ-দাবি ভাষাবোধবিরোধী, ও ভ্রান্ত। (৩৮)-এর প্রতিবেশকাতর ব্যাকরণটি পুরুষ(শ্রেণী)-কে সমগ্র বাক্যের নয়, বিশেষ্যপদের বৈশিষ্ট্য ব'লে নির্দেশ করেছে (৩৮ঘ)-সূত্রে, এবং (৩৮ঠ)-সূত্রে নির্দেশ করেছে যে 'সংগতি'-বোধটি নির্ভরশীল বাক্যের কর্তা-বিশেষ্যপদের পুরুষ(শ্রেণী)র ওপর। ব্যাকরণটির সংগতি-বিষয়ক এ-ব্যাখ্যা ভাষাবোধসম্মত, এবং (সুতরাং) মূল্যবান। এ-সব কারণে (৩৮)-এর প্রতিবেশকাতর ব্যাকরণটি (৩৬)-এর প্রতিবেশমুক্ত ব্যাকরণটির চেয়ে অনেক বেশি 'বর্ণনাত্মক যোগ্যতাসম্পন্ন' (দ্র *Φ* ১'২'৪' ; *Φ*১'২'৫)। সুতরাং (৩৬) পরিত্যাজ্য, এবং (৩৮) গ্রহণযোগ্য। তবে এটিও ত্রুটিমুক্ত নয়। এটিতে বিশেষ্যপদের বচনগত ভেদ নির্দেশ করা হয়নি, সংগতি-সূত্রটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়নি, এবং ক্রিয়াসহায়ক কি-কি বোধ প্রকাশ করে, তাও নির্দেশ করা হয় নি। প্রতিবেশকাতর ব্যাকরণ যে সর্বদাই প্রতিবেশমুক্ত ব্যাকরণের চেয়ে উৎকৃষ্ট, তা নয়। সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণে

প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক সূত্র সাধারণত পরিহার করা হয়, এবং প্রতিবেশকাতর সূত্রের দায়িত্ব পালনে নিয়োগ করা হয় রূপান্তরসূত্র। ব্যাকরণের 'ভিত্তিকক্ষ'কে রাখা হয় যথাসম্ভব 'সাধারণ', বা প্রতিবেশকাতর সূত্রমুক্ত। সংগতি-সূত্র প্রদর্শনের উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে রূপান্তরসূত্রের ব্যবহার।

(৩৫গ)-র সিদ্ধান্তকেও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে শুধু প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে। (৩৫গ)-র সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে বাঙলা ক্রিয়ারূপ দু-অংশে—ক্রিয়ামূল ও ক্রিয়াসহায়ক—বিভক্ত; এবং ক্রিয়াসহায়ক বিভক্ত তিন অংশে: 'ক্রিয়ারীতি', 'কাল', ও 'পুরুষ(শ্রেণী)' এ-তিন অংশে। এর মধ্যে 'পুরুষ(শ্রেণী)' অংশ নির্দেশ করে বাক্যের কর্তা-বিশেষ্যপদের সাথে 'পুরুষ(শ্রেণী)'-ঘটিত 'সংগতি'। অর্থাৎ ক্রিয়ারূপের দ্বিতীয়াংশ ক্রিয়াসহায়কের 'পুরুষ(শ্রেণী)' হয় কর্তা-বিশেষ্যপদের 'পুরুষ (শ্রেণী)'র অনুরূপ। (৩৫গ) সিদ্ধান্ত ক্রিয়াসহায়ককে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করতে অভিলাষী; এবং ক্রিয়াসহায়কের কোন অংশ কি-ভূমিকা পালন করে, তা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে উৎসাহী। ক্রিয়াসহায়কের দ্বিতীয়াংশ নির্দেশ করে 'কাল' (বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি), প্রথমাংশ নির্দেশ করে 'ক্রিয়ারীতি' (সরল, ঘটমান, ঘটিত প্রভৃতি), এবং তৃতীয়াংশ নির্দেশ করে বাক্যের কর্তা-বিশেষ্যপদের সাথে 'পুরুষ(শ্রেণী)'-ঘটিত সংগতি। অর্থাৎ ক্রিয়াসহায়ক বিভক্ত ত্রিখণ্ডে। এবার (৩৫গ)-র সিদ্ধান্ত-অনুসারে একটি প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ, (৪০), রচনা করা যাক :

(৪০) **প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ [দুই]**

ক	বাক্য	→	বিপ + ক্রিপ
খ	ক্রিপ	→	ক্রিরূ
গ	ক্রিরূ	→	ক্রিমূ + ক্রিস
ঘ	বিপ	→	বি
ঙ	বি	→	পু(রুষ)
চ	পু	→	{ প্রপু / দ্বিপু / তৃপু }
ছ	দ্বিপু	→	{ দ্বিপু-সম্মান / দ্বিপু-সাধারণ / দ্বিপু-হীন }

জ	তৃপু	→	{ তৃপু-সম্মান তৃপু-সাধারণ }
ঝ	ক্রিস	→	ক্রিরী + কাল + সংগতি
ঞ	কাল	→	বর্তমান
ট	ক্রিরী	→	{ সরল ঘটমান ঘটিত }
ঠ	সংগতি	→	সংগতি পু(শ্রে$_{ঞ}$) / পু(শ্রে$_{ঞ}$)—
ড	প্রপু	→	আমি, আমরা
ঢ	দ্বিপু-সম্মান	→	আপনি, আপনারা
ণ	দ্বিপু-সাধারণ	→	তুমি, তোমরা
ত	দ্বিপু-হীন	→	তুই, তোরা
দ	তৃপু-সম্মান	→	তিনি, তাঁরা
ধ	তৃপু-সাধারণ	→	সে, তারা
ন	ক্রিমূ	→	কর
প	বর্তমান	→	ϕ
ফ	সরল	→	ϕ
ব	ঘটমান	→	ছ
ভ	ঘটিত	→	এছ
ম	সংগতি-প্রপু	→	ই
য	{ সংগতি-দ্বিপু-সম্মান সংগতি-তৃপু-সম্মান }	→	এন

ষ	সংগতি-দ্বিপু-সাধারণ	→	ও
স	সংগতি-দ্বিপু-হীন	→	ঈস
শ	সংগতি-তৃপু-সাধারণ	→	এ

(৪০)-এর প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণটি (৩৪)-উপাত্তের সমস্ত বাক্য সৃষ্টি করবে। এটির (৪০ন)-সূত্রে যদি সরবরাহ করা হয় আরো কিছু ক্রিয়ামূল, তবে এটির সৃষ্টিক্ষমতা বেড়ে যাবে বহুগুণে, এবং সৃষ্টি করবে উপাত্ত-অতিক্রান্ত প্রচুর বাক্য। (৪০)-এর ব্যাকরণটি সৃষ্ট বাক্যরাশির যে-সাংগঠনিক বর্ণনা দেবে, তা (৩৬), ও (৩৮)-এর ব্যাকরণের থেকে ভিন্ন, ও উন্নত। প্রথমে (৪০)-এর সূত্ররাশি পর্যালোচনা করা যাক। (৪০ক)-সূত্রটি নির্দেশ করছে যে (৩৪)-উপাত্তের, এবং বাঙলা ভাষার, সমস্ত বাক্যের মৌল সংগঠন হচ্ছে ''বিপ + ক্রিপ''। (৪০খ) 'ক্রিপ'কে সম্প্রসারিত করেছে 'ক্রিরূ'-রূপে; এবং (৪০গ) 'ক্রিরূ'-কে সম্প্রসারিত করছে দুটি---'ক্রিমূ', ও 'ক্রিস'-অংশে। (৪০ঘ) 'বিপ'-কে সম্প্রসারিত করেছে 'বি'-রূপে, এবং (৪০ঙ) 'বি'-কে সম্প্রসারিত করেছে 'পু(রুষ)'-রূপে। (৪০চ) নির্দেশ করছে যে বাঙলায় পুরুষ তিন প্রকার: প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ, ও তৃতীয় পুরুষ। (৪০ছ, জ) সূত্রে দ্বিতীয়, ও তৃতীয় পুরুষকে যথাক্রমে তিনটি, ও দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছে। লক্ষণীয় যে প্রথম পুরুষকে কোনো 'শ্রেণী'তে ভাগ করা হয় নি; কেননা বাঙলায় প্রথম পুরুষ শ্রেণী-নিরপেক্ষ। (৪০ঝ)-সূত্রটি 'ক্রিস'-কে ভাগ করেছে তিনটি ক্রমবিন্যস্ত খণ্ডে: 'ক্রিরী + কাল + সংগতি'। সূত্রটি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে যে বাঙলা ক্রিয়াসহায়ক তিন অংশে বিভক্ত: এর প্রথমাংশ নির্দেশ করে 'ক্রিয়ারীতি,' দ্বিতীয়াংশ নির্দেশ করে 'কাল', এবং তৃতীয়াংশ নির্দেশ করে কর্তার সাথে 'সংগতি'। (৪০ঞ) সূত্রটি 'কাল'-কে সম্প্রসারিত করেছে শুধু 'বর্তমান' রূপে। (৩৪)-এর উপাত্তে একটিমাত্র কালের পরিচয়ই রয়েছে; কিন্তু সমগ্র বাঙলা ভাষা উপাত্তরূপে গ্রহণ করলে 'কাল'-কে, সম্ভবত, চার রকমে (বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, নিত্য-অতীত) সম্প্রসারণ করতে হবে। (৪০ঞ) সূত্রটি উপাত্তকে অতিক্রম করে নি। (৪০ট) সূত্রটি 'ক্রিরী'-কে সম্প্রসারিত করছে তিন রকমে: 'সরল', 'ঘটমান', ও 'ঘটিত' রূপে। সূত্রটি নির্দেশ করছে যে তিন রীতিতে বাঙলায় ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। (৪০ঠ) সূত্রটি অভিনব, এবং অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটি কর্তার সাথে ক্রিয়াসহায়কের সংগতিবিধি নির্দেশ করছে। (৪০ঠ)-সূত্রটি একটি 'স্কিমা': এতে অসংখ্য সূত্রকে প্রকাশ করা হয়েছে একসূত্রে। সূত্রটির নির্দেশ: 'সংগতির বাঁ-দিকের বিশেষ্যপদের (অর্থাৎ কর্তার) যে-পুরুষ(শ্রেণী), 'সংগতির'ও তা-ই হবে 'পুরুষ (শ্রেণী)'। অর্থাৎ কর্তা-বিশেষ্যপদের পুরুষ(শ্রেণী) যদি হয় 'ঞ', তবে সংগতির পুরুষ(শ্রেণী)ও হবে 'ঞ'। অর্থাৎ পুরুষ যদি হয় 'প্রথম', তবে সংগতির পুরুষও হবে 'প্রথম' (স্মরণীয়: প্রথম পুরুষের কোনো শ্রেণী নেই), বা কর্তার পুরুষ যদি হয় 'দ্বিতীয়', এবং শ্রেণী যদি হয় 'সম্মান', তবে সংগতির পুরুষ (শ্রেণী) হবে 'দ্বিতীয় পুরুষ-সম্মান' ইত্যাদি। (৪০ঠ)-সূত্রটি যদিও বাস্তবে ছটি সূত্রকে প্রকাশ করেছে একসূত্রে, তবে প্রকৃতিতে এটি একসূত্রে প্রকাশ করেছে অসংখ্য সূত্র। যদি বাঙলায় 'পুরুষ'-এর সংখ্যা হতো দশ কোটি, এবং 'শ্রেণী'র সংখ্যা হতো পনেরো কোটি, তবে তাদের তালিকা করা অসম্ভব হতো: কিন্তু এ-সূত্রটি নির্ভুলভাবে নির্দেশ করতো সংগতিবিধি। (৪০ড-ন) সূত্রগুলো বেশ সরল; এ-সূত্ররাশি বিভিন্ন ক্যাটেগরির অন্তউপাদান নির্দেশ করছে। (৪০প-শ)-সূত্ররাশিও বেশ সরল, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ-সূত্রসমূহ সাধারণ ভাষাভাষীর ভাষাবোধের চেয়ে অনেক গভীর বোধের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। এ-সূত্ররাশি সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে ক্রিয়াসহায়কের কোন অংশের কি-রূপ। (৪০প) নির্দেশ করছে যে

'বর্তমান' কালের জন্যে বাঙলায় কোনো ভাষাবস্তু ব্যবহৃত হয় না। বা 'শূন্য', ভাষাবস্তু ব্যবহৃত হয়। (৪০ফ) নির্দেশ করছে যে 'সরল' ক্রিয়ারীতিও নির্দেশিত হয় 'শূন্য' ভাষাবস্তুর সাহায্যে ; অর্থাৎ 'সরল' ক্রিয়ারীতি নির্দেশের জন্যে কোনো ভাষাবস্তু ব্যবহৃত হয় না। (৪০ব, ভ) নির্দেশ করছে যে 'ঘটমান', ও 'ঘটিত' ক্রিয়ারীতির জন্যে, যথাক্রমে, ব্যবহৃত হয় 'ছ', এবং 'এছ'। (৪০ম-শ) নির্দেশ করছে সংগতির জন্যে কি-ভাষাবস্তু ব্যবহৃত হয় বাঙলায়। (৪০য) নির্দেশ করছে যে দ্বিতীয় পুরুষ-সম্মান, ও তৃতীয় পুরুষ-সম্মান শ্রেণীর জন্যে ব্যবহৃত হয় 'এন' ; (৪০র) নির্দেশ করছে যে দ্বিতীয় পুরুষ-সাধারণ কর্তার সাথে সংগতির জন্যে ব্যবহৃত হয় 'ও' ; (৪০ম) নির্দেশ করছে যে প্রথম পুরুষসূচক কর্তার সাথে সংগতির জন্যে ব্যবহৃত হয় 'ই' ; (৪০ল) নির্দেশ যে দ্বিতীয় পুরুষ-হীন কর্তার সাথে সংগতির জন্যে বসে 'ইস' ; এবং (৪০শ) নির্দেশ করছে যে তৃতীয় পুরুষ-সাধারণ কর্তার সাথে সংগতির জন্যে ব্যবহৃত হয় 'এ'। এ-ব্যাকরণটি ক্রিয়াসহায়কের তিন অংশের ভূমিকা, ও রূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্দেশ করে। (৪০)-এর প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণটি সৃষ্ট বাক্যের নিম্নরূপ সাংগঠনিক বর্ণনা দেবে :

(৪১)

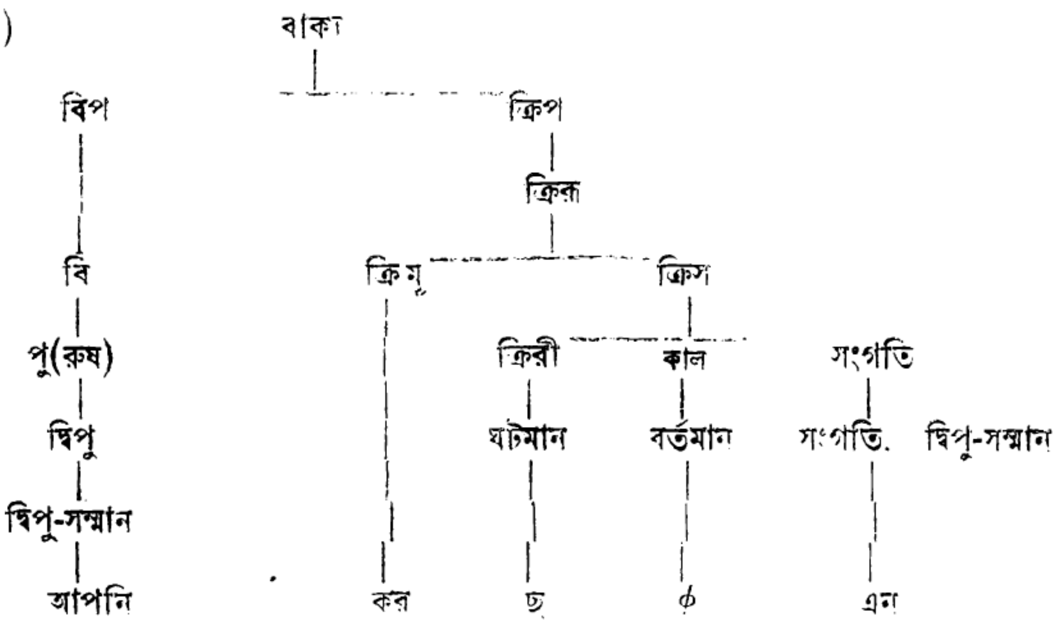

(৪১)-এর অন্তগ্রন্থি 'আপনি + কর + ছ + ϕ + এন' -এর ওপর রূপধ্বনিতাত্ত্বিকসূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে 'আপনি করছেন' বাক্যটি। (৪০)-এর অন্যান্য সূত্র প্রয়োগে পাওয়া যাবে (৩৪)-উপাত্তের অন্যান্য বাক্য।

(৩৬, ৩৮, ৪০)-এর ব্যাকরণ তিনটি, যেহেতু অভিন্ন উপাত্ত সৃষ্টি করে, 'দুর্বলভাবে সমতুল্য' ; কিন্তু এরা, সৃষ্ট বাক্যের বিভিন্ন সাংগঠনিক বর্ণনা দেয় ব'লে, 'শক্তিমান-ভাবে সমতুল্য' নয়। (৩৭,৩৯,৪১)-এর পদচিত্রগুলোর তুলনা করলে বোঝা যায় যে (৩৭)-এর সাংগঠনিক বর্ণনা ভাষাবোধবিরোধী, ও ভ্রান্ত ; (৩৯)-এর সাংগঠনিক বর্ণনা স্বাভাবিক ভাষাবোধসম্মত, ও (৩৭)-এর বর্ণনার চেয়ে উন্নত ; এবং (৪১)-এর সাংগঠনিক বর্ণনা সুগভীর ভাষাবোধের নিদর্শন, এবং উৎকৃষ্টতম। (৪০)-এর প্রতি-বেশকাতর ব্যাকরণটি (৩৪)-উপাত্তের বাক্যরাশি সৃষ্টির সাথেসাথে দিয়েছে বাক্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ সাংগঠনিক বর্ণনা, যাতে অনেক আপাতঅদৃশ্য ক্যাটেগরি সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হ'য়ে উঠেছে। (৩৬.৩৮,৪০)-এর মধ্যে তৃতীয়টি শ্রেষ্ঠ। তবে এটি (৩৪)-এর

উপাত্ত সৃষ্টির জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ নয়। এ-ব্যাকরণেরও রয়েছে নানা ত্রুটি। সংগতি-সূত্র উদঘাটনের জন্যে পদসাংগঠনিক সূত্র বিশেষ উপযুক্ত নয়. এর জন্যে দরকার রূপান্তরসূত্র।

১'৪'২ পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ রচনার কৌশল

কোনো উপাত্তের ব্যাকরণ আবিষ্কারের কোনো স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক প্রণালি নেই। বিশ্লেষকের কাছে উপাত্তের আন্তর শৃঙ্খলা যে-ভাবে ধরা দেয়, সে-ভাবেই তিনি রচনা করেন সূত্রাবলি, অর্থাৎ ব্যাকরণ। যাঁর দৃষ্টি যতো গভীর, ও ব্যাপক, তাঁর রচিত ব্যাকরণও ততোই গভীর, ও ব্যাপক। একই উপাত্তের শৃঙ্খলা বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রূপে উদ্ভাসিত হ'তে পারে, তাই রচিত হ'তে পারে একই উপাত্তের বিভিন্ন ব্যাকরণ। কোনো উপাত্তের ব্যাকরণ হচ্ছে ওই উপাত্ত সম্পর্কে বিশ্লেষকের তত্ত্ব; তাই তাঁর তত্ত্ব যতো উন্নত হবে, ব্যাকরণও হবে তেমনি উন্নত। ব্যাকরণ আবিষ্কার প্রণালি যান্ত্রিক নয়; তবে ব্যাকরণ রচনার সহায়ক কিছু প্রণালিপদ্ধতি, যার সাহায্যে সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষক প্রকাশ করেন তাঁর ধারণা, রয়েছে। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ রচনার রয়েছে সহায়ক কিছু প্রণালি। ব্যাকরণ রচনার দুটি দিক: (ক) তত্ত্বগত দিক, ও (খ) প্রণালিপদ্ধতি-গত দিক। প্রথম দিকে ভিন্নতা ঘটতে পারে ব্যক্তিতেব্যক্তিতে; কিন্তু প্রণালিপদ্ধতি-গত দিকে ব্যক্তিভেদে ভিন্নতা ঘটে না।

ব্যাকরণ রচনার জন্যে প্রথমে দরকার 'উপাত্ত'। উপাত্তে থাকা দরকার উপাত্ত-ভাষার বিচিত্র ব্যাকরণসম্মত বাক্য, এবং বিচিত্র ব্যাকরণবিরোধী বাক্য। যদি কোনো ভাষার বিচিত্র ব্যাকরণসম্মত বাক্য-উপাত্ত পাওয়া যায়, তবে ওই উপাত্ত নির্ভর ক'রেও রচনা করা সম্ভব মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যাকরণ। কোনো উপাত্তের পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ রচনার জন্যে নিম্নলিখিত কৌশলরাশির সাহায্য নেয়া যেতে পারে (দ্র কৌটসৌডাস (১৯৬৬, ৪২)):

[ক] প্রথমে শনাক্ত করতে হবে উপাত্ত-বাক্যের রূপমূলসমূহ, এবং রচনা করতে হবে প্রয়োজনবোধে অর্থসহ রূপমূল-তালিকা। প্রতিটি রূপমূলকে ফেলতে হবে কোনো-না-কোনো 'পদ-শ্রেণী'তে: যেমন—বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি।

[খ] উপাত্ত ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রে স্থির করতে হবে কোন শ্রেণীর পদ হ'তে পারে কর্তা, কর্ম, বা বিশেষ্যপদ, ক্রিয়াপদ ইত্যাদি। অর্থাৎ কোন শ্রেণীর পদ বাক্যে কি-ভূমিকা পালন করে, তা স্থির করতে হবে। বিভিন্ন পদকে, ভূমিকা অনুসারে, দিতে হবে নাম। এর পরে নির্ণয় করতে হবে বাক্য-শ্রেণী। উপাত্তে কতো রকম সংগঠনের বাক্য রয়েছে, তা স্থির করতে হবে। মনে করা যাক, কিছু বাক্য রয়েছে, যাদের সংগঠন হচ্ছে 'বিপ+ক্রিব্ধ': এদের ফেলতে হবে এক-শ্রেণীতে; আবার কিছু বাক্য রয়েছে, যাদের সংগঠন 'বিপ+বিপ+ক্রিব্ধ': এদের ফেলতে হবে অন্য শ্রেণীতে। এ-ভাবে শনাক্ত করতে হবে উপাত্তের সমস্ত বাক্যের সংগঠন-শ্রেণী।

[গ] বাক্য-শ্রেণী নির্ণয়ের পরে দেখতে হবে কোন শ্রেণীর বাক্যে কোনকোন পদ-শ্রেণী ব্যবহৃত হয়। এ-জন্যে প্রতিটিতে শ্রেণীর বাক্যসমূহকে দীর্ঘতম-থেকে-ক্ষুদ্রতম ক্রমে সাজাতে হবে, এবং দেখতে হবে বাক্যের কোন স্থানে

কোন পদ-শ্রেণী বসে। পদসমূহকে স্তম্ভরূপে সাজাতে হবে, এবং একই রকম পদ-শ্রেণীসমূহকে বিন্যস্ত করতে হবে একই স্তম্ভে।

[ঘ] লক্ষ্য করতে হবে বাক্যে কোন উপাদান 'আবশ্যিক', এবং কোন উপাদান 'ঐচ্ছিক'। বাক্যে উপাদানসমূহের সহাবস্থানের আর কোনো বিধিনিষেধ রয়েছে কি-না, তাও দেখতে হবে।

[ঙ] বাক্যের বিভিন্ন উপাদান মিলে কি-ভাবে 'বাক্যিক ক্যাটেগরি' রচনা করে, তা দেখতে হবে। যেমন: 'নির্দেশক + বিশেষ্য' গঠন করতে পারে 'বিপ'; আবার শুধু 'ক্রিয়া'-ই গঠন করতে পারে 'ক্রিপ', আবার 'বিপ + ক্রিয়া' গঠন করতে পারে 'ক্রিপ' ইত্যাদি।

[চ] 'বাক্য-শ্রেণী'-সমূহের তুলনা ক'রে তাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করতে হবে।

[ছ] এবার রচনা করতে হবে সূত্র, এবং দেখতে হবে সূত্ররাশি কেমন পদ-চিত্র রচনা করে।

[জ] সবশেষে পরখ করতে হবে রচিত সূত্রাবলি নির্ভুল উপাত্ত সৃষ্টি করে কি-না। যদি করে, তবে চমৎকার; নইলে সংশোধন করতে হবে সূত্ররাশি।

মনে করা যাক, আমাদের রয়েছে মাত্র তিনটি বাক্যের উপাত্ত, (৪২), এবং আমাদের এ-উপাত্তের জন্যে একটি পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ রচনা করতে হবে।

(৪২) ক একটি মেয়ে একটি বই পড়ছে।
খ একটি ছেলে আসছে।
গ সে নাচছে।

(৪২)-উপাত্তের বাক্য তিনটি সৃষ্টির জন্যে রচনা করতে হবে একটি পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ। সূত্র এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে (৪২)-এর বাক্য তিনটি নির্ভুলভাবে গঠিত হয়। ওপরে উল্লেখিত প্রণালিসমূহ অনুসরণে পাই:

(৪৩) [ক] প্রথমে শনাক্ত করতে হবে (৪২)-এর বাক্যগুলোতে ব্যবহৃত রূপমূলসমূহ, এবং নির্দেশ করতে হবে, নিম্নরূপে, তাদের 'পদ-শ্রেণী':

রূপমূল	শ্রেণী
মেয়ে	বিশেষ্য (মনুষ্যবাচক)
বই	বিশেষ্য (অপ্রাণীবাচক)
ছেলে	বিশেষ্য (মনুষ্যবাচক)
সে	বিশেষ্য: সর্বনাম (মনুষ্যবাচক),

রূপমূল	শ্রেণী
পড়	ক্রিয়ামূল
আস	ক্রিয়ামূল
নাচ	ক্রিয়ামূল
এক	সংখ্যা
টি	অনুসর্গ
ছে	ক্রিয়াসহায়ক

[খ] (৪২)-এর তিনটি বাক্যকে প্রথমে ফেলা যায় দুইশ্রেণীতে : (৪২ক)-বাক্যটির সংগঠন হচ্ছে 'কর্তা + কর্ম + ক্রিরূ' : এবং (৪২ক, খ)-এর সংগঠন হচ্ছে 'কর্তা + ক্রিরূ'।

[গ] **ক-শ্রেণীর বাক্য** **খ-শ্রেণীর বাক্য**

কর্তা	কর্ম	ক্রিরূ	কর্তা	ক্রিরূ
সং + অনু + বি	সং + অনু + বি	ক্রিমূ + ক্রিস	সং + অনু + বি	ক্রিমূ + ক্রিস
			বি	ক্রিমূ + ক্রিস

(৪২ক)-বাক্যের কর্তা-বিশেষ্যপদ গঠিত একটি সংখ্যাসূচক শব্দ ও একটি অনুসর্গ ও একটি বিশেষ্যে। এর মধ্যে সংখ্যাবাচক শব্দ ও অনুসর্গটি গঠন করে একটি উপাদান : এর নাম দেয়া যাক 'নির্দেশক' (নি)। এ-নির্দেশক ও বিশেষ্য মিলে গঠন করে বিশেষ্যপদ ('বিপ')। তাই কর্তা-বিশেষ্যপদের সংগঠন হচ্ছে 'নি + বি'। কর্ম-বিশেষ্যপদের সংগঠনও একইরকম। (৪২খ) বাক্যের কর্তা-বিশেষ্যপদের সংগঠনও অনুরূপ। (৪২গ) বাক্যের কর্তা-বিশেষ্যপদটি হচ্ছে একটি সর্বনাম : এটিকেও ধ'রে নিচ্ছি বিশেষ্য ব'লে, তবে এটির আগে কোনো নির্দেশক বসে না। ক্রিয়ারূপের সংগঠন তিনটি বাক্যেই 'ক্রিমূ + ক্রিস'।

[ঘ] (৪২)-এর বাক্যগুলোতে দেখা যায় যে নির্দেশক ছাড়া আর সমস্ত বস্তুই আবশ্যিক। 'নি' বসে শুধু বিশেষ্যের আগে, সর্বনামের আগে বসে না।

বাক্যে কর্তা-ক্রিয়ার মধ্যে কোনো 'সংগতি-সূত্র' আছে কি-না, তা দেখতে হবে। তিনটি বাক্যেই দেখা যাচ্ছে যে 'ক্রিস' হচ্ছে 'ছে'। অর্থাৎ এ-উপাত্তে কর্তা-ক্রিয়ার মধ্যে সংগতির কোনো বিশেষ বিধি নেই।

দেখতে হবে বাক্যে ব্যবহৃত পদ-শ্রেণীর সহাবস্থানের কোনো বিশেষ বিধি —'সিলেকশনাল—রেস্ট্রিকশন' রয়েছে কি-না ? এর নাম দেয়া যাক 'সংগতি-

বিধি'। সংগতিবিধি নির্ণয় বেশ কঠিন, এবং সূত্রে তা প্রকাশ করা কঠিনতর। যেমন : বলতে পারি 'একটি ছেলে (মেয়ে) আসছে (নাচছে, পড়ছে)'; বা 'সে আসছে (নাচছে, পড়ছে)'। কিন্তু বলতে পারি না '*একটি বই আসছে', বা '*একটি বই নাচছে', বা '*একটি ছেলে একটি মেয়ে পড়ছে', বা '*একটি মেয়ে একটি ছেলে নাচছে' ইত্যাদি। এ-রকম বাক্য বিসংগত। বিসংগতি এড়ানো যায় কি-ভাবে? (৪২)-এর সব বাক্যের কর্তাই মনুষ্যবাচক, এবং (৪২খ)-বাক্যের কর্ম-বিশেষ্যটি অপ্রাণীবাচক। তাই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি যে বাক্যে শুধু মনুষ্যবাচক বিশেষ্যই বসতে পারে কর্তারূপে, আর কর্মরূপে বসতে পারে অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য। উপাত্তের ক্রিয়ামূল তিনটি লক্ষণীয় : এদের মধ্যে 'আস', ও 'নাচ' অকর্মক ক্রিয়ামূল, অর্থাৎ এদের সাথে কোনো কর্ম ব্যবহৃত হ'তে পারে না। 'পড়' ক্রিয়ামূলটি ঐচ্ছিক-ভাবে সকর্মক; অর্থাৎ এটির সাথে কর্ম থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে।

[ঙ] (৪২)-উপাত্তের (ক) বাক্যের সংগঠন : বাক্য = বিপ + ক্রিপ; ক্রিপ = বিপ + ক্রিরূ; বিপ = নি + বি; ক্রিরূ = ক্রিমূ + ক্রিস; নি = সং + অনু। (৪২খ, গ) বাক্যের সংগঠন : বাক্য = বিপ + ক্রিপ; ক্রিপ = ক্রিরূ; ক্রিরূ = ক্রিমূ + ক্রিস; বিপ = (নি) + বি; নি = সং + অনু।

[চ] উপাত্তের বাক্য তিনটির মধ্যে বাহ্যপার্থক্য থাকলেও তারা আন্তর সংগঠনে অভিন্ন। এদের সংগঠন হচ্ছে 'বিপ + ক্রিপ'।

উল্লিখিত বিশ্লেষণ অনুসারে (৪২)-উপাত্তের ব্যাকরণ হবে (৪৪) :

(৪৪) ক বাক্য → বিপ + ক্রিপ

খ ক্রিপ → { বিপ + ক্রিরূ$_{\text{সক}}$ / ক্রিরূ$_{\text{অক}}$ }

গ বিপ → { নি + বি / #সব(নাম) }

ঘ নি → সং + অনু

ঙ ক্রিরূ$_{\text{সক}}$ → ক্রিমূ$_{\text{সক}}$ + ক্রিস

চ ক্রিরূ$_{\text{অক}}$ → ক্রিমূ$_{\text{অক}}$ + ক্রিস

ছ বি → { # বি$_{\text{মনুষ্য}}$ / বি$_{\text{অপ্রাণী}}$ }

জ	বি$_{\text{মনুষ্য}}$	→	মেয়ে, ছেলে,
ঝ	বি$_{\text{অপ্রাণী}}$	→	বই,···
ঞ	সর্ব	→	সে
ট	ক্রিমূ$_{\text{সক}}$	→	পড়,
ঠ	ক্রিমূ$_{\text{অক}}$	→	আস, নাচ, ···
ড	সং	→	এক,···
ঢ	অনু	→	টি
ণ	ক্রিস	→	ছে

(৪৪)-এর ব্যাকরণটি নির্ভুলভাবে সৃষ্টি করবে (৪২)-এর বাক্য তিনটি, এবং 'একটি ছেলে একটি বই পড়ছে', 'সে একটি বই পড়ছে', 'একটি মেয়ে আসছে', 'সে আসছে', 'একটি মেয়ে নাচছে', 'একটি ছেলে নাচছে' প্রভৃতি উপাত্ত-অতিরিক্ত বাক্য। ব্যাকরণটি কোনো ব্যাকরণ বিরুদ্ধ বাক্য, যেমন : '*একটি মেয়ে সে (তাকে) পড়ছে', '*সে একটি মেয়ে (কে) পড়ছে', '*একটি মেয়ে একটি বই নাচছে' প্রভৃতি, সৃষ্টি করবে না। ব্যাকরণটি উপাত্ত অতিক্রম ক'রে যায় ব'লে এটি একটি সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ। (৪৪)-এর সূত্রগুলো ব্যাখ্যা করা যাক। (৪৪ক)-সূত্রটি উপাত্তের বাক্যগুলোর মৌল সংগঠনরূপে নির্দেশ করছে 'বিপ+ক্রিপ'-কে। (৪৪খ)-সূত্রটি 'ক্রিপ'-কে সম্প্রসারিত করেছে দু'রূপে : এ-সূত্রটি নির্দেশ করছে যে ক্রিয়াপদ দু'রকম হ'তে পারে। একরকম ক্রিয়াপদ গঠিত হয় বিশেষ্যপদ ও সকর্মক ক্রিয়ারূপের সমবায়ে, এবং অন্য রকম ক্রিয়াপদ গঠিত হয় শুধুই অকর্মক ক্রিয়ারূপে। (৪৪গ)-সূত্রটি নির্দেশ করছে যে বিশেষ্যপদ দু'রকম : একরকম বিশেষ্যপদ গঠিত হয় নির্দেশক ও বিশেষ্যের সমবায়ে, এবং এমন বিপ বসতে পারে কর্তা ও কর্ম উভয়রূপে ; আর অন্য রকম বিশেষ্যপদ গঠিত হয় শুধুই সর্বনামে, এবং এমন বিপ বসে শুধু বাক্যের প্রারম্ভে, অর্থাৎ কর্তারূপে (≠ সর্ব—নির্দেশ করছে যে সর্বনাম বসে বাক্যের বাম সীমান্তে, অর্থাৎ কর্তারূপে)। (৪৪ঘ) নির্দেশ করছে যে নির্দেশক গঠিত হয় সংখ্যা ও অনুসর্গের সমবায়ে। (৪৪ঙ, চ) সূত্র দুটি ক্রিয়ারূপের গঠন-প্রণালি নির্দেশ করছে : (৪৪ঙ) নির্দেশ করছে যে সকর্মক ক্রিয়ারূপ গ'ড়ে ওঠে সকর্মক ক্রিয়ামূল ও ক্রিয়াসহায়কের যোগে ; আর (৪৪চ) জানাচ্ছে যে অকর্মক ক্রিয়ারূপ গ'ড়ে ওঠে অকর্মক ক্রিয়ামূল ও ক্রিয়াসহায়কের মিলনে। (৪৪ছ) নির্দেশ করছে দু'রকম বিশেষ্য : এ-সূত্রানুসারে মনুষ্যবাচক বিশেষ্য বসে শুধু কর্তারূপে (≠ বি$_{\text{মনুষ্য}}$—জানাচ্ছে যে মনুষ্য-বাচক বিশেষ্য বসতে পারে বাক্যের বাম-সীমান্তে, অর্থাৎ কর্তারূপে), এবং অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য বসতে পারে অন্যত্র। (৪৪জ-ণ)-সূত্রগুলো বেশ সরল : এ-গুলো বিভিন্ন উচ্চ ক্যাটেগরির অন্তউপাদান নির্দেশ করে। (৪৪)-ব্যাকরণটি শুধু বাক্য সৃষ্টি করে না, সৃষ্ট বাক্যের স্বয়ংক্রিয় সাংগঠনিক বর্ণনাও দেয়। ব্যাকরণটি সৃষ্ট বাক্যের নিম্নরূপ সাংগঠনিক বর্ণনা দেবে :

(৪৫)

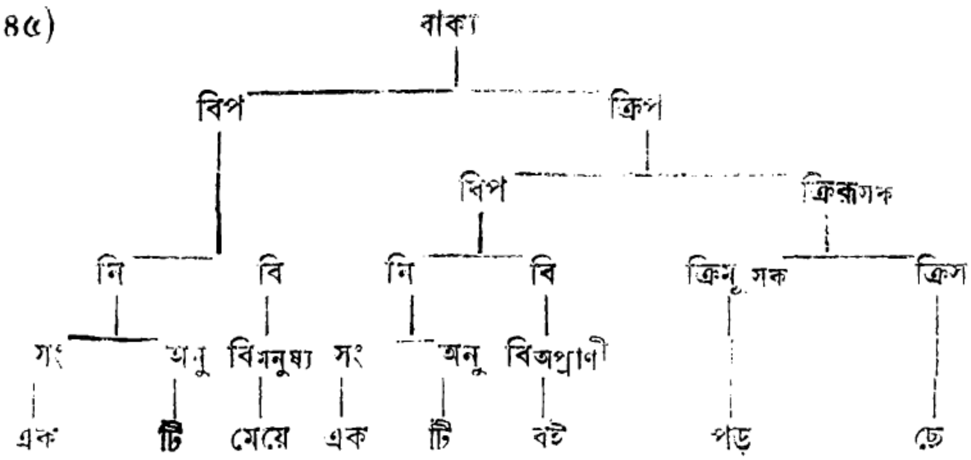

(৪৫)-এর অন্তগ্রন্থি 'এক + টি + মেয়ে এক + টি + বই পড় + ছে'-র ওপর রূপ-ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে (৪২ক)। অন্যান্য সূত্র প্রয়োগে পাওয়া যাবে অন্যান্য বাক্য।

১.৪.৩ পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা

পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ আন্তর শক্তিতে দুর্বল। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে অনেক ভাষার সমস্ত বাক্য সৃষ্টি অসম্ভব (দ্র লায়নস (১৯৭০)), এবং সমস্ত ভাষায়ই অনেক বাক্য আছে, যাদের পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করা যায় অত্যন্ত জটিল ও বোধিবিরোধী প্রক্রিয়ায় (দ্র চমস্কি (১৯৫৭, পরিচ্ছেদ ৫, ৮), পোস্টাল (১৯৬৪ক, খ))। কোনো ভাষিক তত্ত্বের ব্যর্থতা দু'উপায়ে প্রমাণ করা যায়। প্রথম ও প্রধান উপায় হচ্ছে দেখিয়ে দেয়া যে তত্ত্বটির সাহায্যে ভাষার সমস্ত বাক্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়; এবং দ্বিতীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে যে দেখিয়ে দেয়া তত্ত্বটির সাহায্যে সমস্ত বাক্য সৃষ্টি করা যায় বেশ জটিল, বিভ্রান্তিকর, ও অপরিচ্ছন্ন প্রক্রিয়ায়। প্রথম উপায়টি কোনো তত্ত্বকে বাতিল ক'রে দেয় সরাসরিভাবে, এবং দ্বিতীয় উপায়টি তুলে ধরে তত্ত্বের আন্তর অশক্তি। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে যে-কোনো ভাষার সমস্ত বাক্য সৃষ্টি করতে গেলে দেখা যায় যে ব্যাকরণের সূত্ররাশি হ'য়ে উঠছে ভয়াবহরূপে জটিল, এবং বাক্য সৃষ্টিও সর্বদা ভাষাবোধ অনুসারে হচ্ছে না। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের নানা সীমাবদ্ধতার কয়েকটি :

[ক] বিচ্ছিন্ন উপাদান নির্দেশে ব্যর্থতা

[খ] সাংগঠনিক সাদৃশ্য প্রদর্শনে ব্যর্থতা

[গ] বাক্যিক দ্ব্যর্থতানিরসনে ব্যর্থতা

[ক] **বিচ্ছিন্ন উপাদান নির্দেশে ব্যর্থতা** : পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ অব্যবহিত-উপাদান-ভিত্তিক, যার মৌল সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে বাক্যের বিভিন্ন 'উপাদান', বা একক অব্যবহিতরূপে (পাশাপাশি) বিরাজ করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে অনেক 'উপাদান'-এর উপাদানসমূহ পাশাপাশি অবস্থান না ক'রে বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন, বা বিলগ্ন উপাদানের স্বাভাবিক পদচিত্ররূপ দেয়ার শক্তি পদসাংগঠনিক (অব্যবহিত-উপাদান) ব্যাকরণের নেই। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৪৬) ক সে হেসে উঠলো।
খ উঠলো সে হেসে।

(৪৬ক)-তে 'হেসে উঠল'-কে বোধ করি একটি একক বা উপাদানরূপে, যাতে 'হেসে' ও 'উঠলো' অবস্থিত অব্যবহিতরূপে। কিন্তু (৪৬খ)-তে পাই অন্য বিন্যাস। এ-বাক্যে 'উঠলো সে', বা 'সে হেসে' উপাদান যে নয়, তা বোধ করি সহজেই; এবং এও বোধ করি যে 'হেসে উঠলো'-র দ্বিতীয়াংশই এ-বাক্যে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বসেছে বাক্যের প্রারম্ভে। 'উঠলো হেসে'-কে কোনো স্বাভাবিক উপায়ে পদচিত্রে উপস্থাপন করা অসম্ভব (দ্র হকেট (১৯৫৮, ১৫৫))। (৪৬)-এর উদাহরণ বেশ সহজসরল। দীর্ঘ ও জটিল বাক্যে উপাদানের অঙ্গরাশি নানাভাবে বিচ্ছিন্ন বিলগ্ন হ'য়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে এদিকে-সেদিকে। বাঙলায় যেহেতু শব্দক্রম বদলানোর স্বাধীনতা বেশি, তাই উপাদানের অঙ্গ-বিলগ্নতার সম্ভাবনা বাঙলায় ব্যাপক। বাঙলা সম্বন্ধাত্মক ও অন্যান্য বাক্য প্রায়ই লালন করে বিচ্ছিন্ন উপাদান :

(৪৭) ক যে-মেয়েটি নাচছে, আমি তাকে চিনি।
খ আমি যে-মেয়েটি নাচছে, তাকে চিনি।
গ তুমি যে আসবে না হলুদ চাঁদের তলে, তা কে জানে না ?
ঘ কে জানে না তা যে তুমি হলুদ চাঁদের তলে আসবে না ?

পদসাংগঠনিক রীতিতে (৪৭)-এর বাক্যগুলোর উপাদান নির্দেশ, স্বাভাবিক উপায়ে, সম্ভব নয়। (৪৭ক, গ) বাক্য দুটিতে উপাদানের অঙ্গ বিলগ্ন হয়ে আছে, এবং (৪৭খ ঘ)-তে উপাদানের বিলগ্ন অংশগুলোকে সংলগ্ন করা হয়েছে। (৪৭ক)-র তিনটি প্রধান উপাদান হচ্ছে 'আমি', 'যে-মেয়েটি নাচছে, তাকে', এবং 'চিনি'। এদের মাঝে দ্বিতীয়টি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে। (৪৭গ)-র প্রধান উপাদানসমূহ হচ্ছে 'কে', 'তা যে তুমি হলুদ চাঁদের তলে আসবে না,' এবং 'জানে না'; কিন্তু বাক্যটিতে দ্বিতীয় উপাদানটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বিচ্ছিন্ন উপাদানের স্বাভাবিক পদচিত্র-রূপ দেয়া অসম্ভব। বিচ্ছিন্ন উপাদানকে বশে আনার জন্যে দরকার রূপান্তর ব্যাকরণ।

[খ] **সাংগঠনিক সাদৃশ্য প্রদর্শনে ব্যর্থতা** : অব্যবহিত-উপাদানভিত্তিক পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ বৈসাদৃশ্যবাদী। এ-ব্যাকরণ সম্পর্কিত, কিন্তু সাংগঠনিক রূপে ভিন্ন, একাধিক বাক্যের বৈসাদৃশ্যই সুস্পষ্টভাবে দেখাতে পারে; কিন্তু তাদের আভ্যন্তর সাদৃশ্য ও নৈকট্য দেখাতে পারে না। দুটি সরল উদাহরণ :

(৪৮) ক আমি তোমাকে চাই।
খ চাই তোমাকে আমি।

বাঙলাভাষীদের কাছে সহজেই মনে হবে যে (৪৮ক, খ)-বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে; সুতরাং ব্যাকরণের দায়িত্ব হচ্ছে এদের সম্পর্ককে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। (৪৯)-এর প্রতিবেশমুক্ত ব্যাকরণটি সৃষ্টি করবে (৪৮ক) :

(৪৯) ক বাক্য → বিপ + ক্রিপ

খ ক্রিপ → বিপ + ক্রিরূ

গ	বিপ১	→	আমি
ঘ	বিপ২	→	তোমাকে
ঙ	ক্রিরূ	→	চাই

ব্যাকরণটি, ত্রুটিহীন না হ'লেও, সৃষ্টি করবে (৪৮ক), এবং নিম্নরূপ সাংগঠনিক বর্ণনা দেবে বাক্যটির :

(৫০)

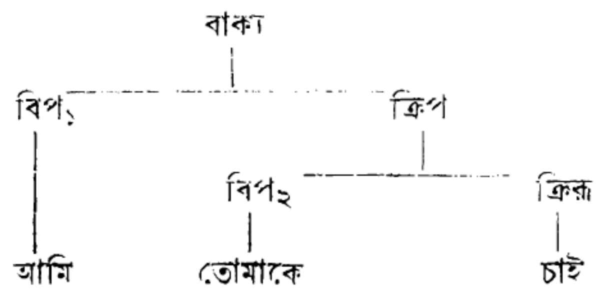

এ-সাংগঠনিক বর্ণনাটি মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য, কেননা এতে উচ্চ ক্যাটেগরিগুলোকে ভালোভাবেই দেখানো হয়েছে। (৪৯)-ব্যাকরণটি সৃষ্টি করে মাত্র একটি বাক্য; এর সাহায্যে (৪৮খ)-বাক্যটি গঠন করা সম্ভব নয়। যদি একই ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করতে চাই (৪৮ক, খ), তবে দরকার হবে (৫১)-র প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণটি :

(৫১)	ক	বাক্য	→	বিপ১ + ক্রিপ
	খ	ক্রিপ	→	বিপ২ + ক্রিরূ
	গ	বিপ১	→	ক্রিরূ/ — ক্রিরূ
	ঘ	ক্রিরূ	→	বিপ১ / ক্রিরূ—
	ঙ	বিপ১	→	আমি
	চ	বিপ২	→	তোমাকে
	ছ	ক্রিরূ	→	চাই

(৫১)-র সূত্ররাশি 'বাহ্যিক ক্রমানুসারে বিন্যস্ত' (অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞানী কর্তৃক নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে প্রয়োগ করতে হবে (দ্র ক১·৩·২))। এ-সূত্রসমূহ প্রয়োগ করতে হবে নিম্নরূপে। প্রথমে, অনিবার্যভাবে, প্রযুক্ত হবে (৫১ক)-সূত্র। এর পরে ঠিক করতে হবে বিপ১ ও ক্রিপ-র মধ্যে কোনটিকে আমরা প্রথমে সম্প্রসারিত করতে চাই। মনে করা যাক, প্রথমে সম্প্রসারিত করতে চাই বিপ১-কে। তাহলে আমাদের যেতে হবে (৫১ঙ)-সূত্রে, কেননা এ-ক্ষেত্রে (৫১খ-ঘ)-সূত্র প্রযোজ্য নয়। (৫১ঙ) প্রয়োগের পর প্রয়োগ করতে হয় (৫১ চ, ছ); কিন্তু তা প্রয়োগ সম্ভব নয় ব'লে আমাদের ফিরে যেতে হবে (৫১খ)-সূত্রে, এবং প্রয়োগ করতে হবে সূত্রটি। এটি প্রয়োগের পর প্রয়োগ করতে হবে (৫১ চ, ছ)। এ-সূত্রগুলো প্রয়োগেই ব্যুৎপত্তি সমাপ্ত হবে, এবং পাওয়া যাবে (৫০)-পদচিত্রটি, এবং গঠিত হবে (৪৮ক)-বাক্যটি। এবার (৫১)-র সূত্ররাশি অন্য ক্রমানুসারে প্রয়োগ করা যাক। এবার প্রথমে, অনিবার্যভাবে, প্রয়োগ করতে হবে (৫১ক), এবং এর পরে প্রয়োগ করতে হবে (৫১খ)। (৫১খ)-সূত্র প্রয়োগ করলে আমরা

বাধ্য হবো—ক্রমবিন্যাসনীতি অনুসারে—এর পরবর্তী সমস্ত সূত্র প্রয়োগ করতে এ-সমস্ত সূত্র প্রয়োগে গঠিত হবে (৪৮খ)-বাক্যটি, যার (৫১)-নির্দেশিত পদচিত্ররূপ হবে (৫২) :

(৫২)

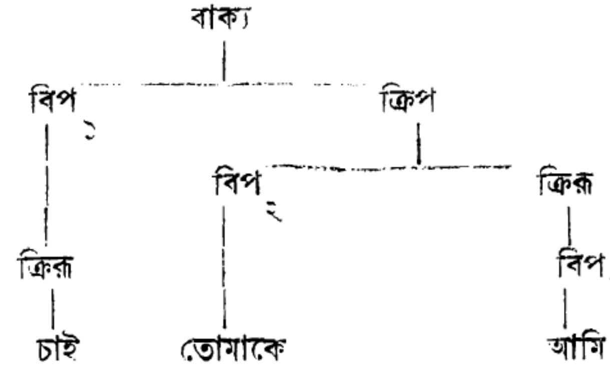

(৫২)-পদচিত্রটি সুস্পষ্টভাবে ভ্রান্ত। এর 'শক্তিমান সৃষ্টিশক্তি'-তে মারাত্মক ক্রটি লুকিয়ে আছে। (৫১)-ব্যাকরণটি (৪৮খ)-বাক্যের যে সাংগঠনিক বর্ণনা দিচ্ছে, তা ভাষাবোধ-বিরোধী; তাই এ-ব্যাকরণটি 'বর্ণনাত্মক যোগ্যতা-'সম্পন্ন নয়। ব্যাকরণটির সূত্ররাশি কেমন ক্রটিপূর্ণ, ত দেখ যাক : (৫১গ)-সূত্রটি বলছে যে বিশেষ্যপদ হচ্ছে ক্রিয়ারূপ, যদি বিপ-র ডানে থাকে ক্রিয়ারূপ; আবার (৫১ঘ)-সূত্রটি বলছে যে ক্রিয়ারূপ হচ্ছে বিশেষ্যপদ, যদি ক্রিরূ-র বাঁয়ে থাকে ক্রিয়ারূপ। এ-ধারণা খুবই ভ্রান্ত। ব্যাকরণটিকে উল্লিখিত ক্রটি থেকে মুক্ত করা যায়, যদি এর সূত্রগুলোকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যে তারা বাক্যের উপাদানসমূহকে পারস্পরিকভাবে স্থানান্তরিত করতে পারবে না। কিন্তু এমন নিয়ন্ত্রণে ব্যাকরণটি (৪৮ক, খ)-বাক্যের মধ্যে সাদৃশ্য দেখানোর সমস্ত শক্তি হারাবে। তাই দেখতে পাচ্ছি যে পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ অত্যন্ত সহজসরল ও সম্পর্কিত বাক্যের মধ্যেও সাদৃশ্য দেখাতে পারে না ভাষাবোধসম্মত উপায়ে।

পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ যেমন পারে না সম্পর্কিত, অথচ আপাতবিসদৃশ সংগঠনমণ্ডিত বাক্যের সাদৃশ্য দেখাতে, তেমনি তা পারে না আপাতসদৃশ, অথচ যুক্তিগতভাবে বিসদৃশ বাক্যের স্বাতন্ত্র্য দেখাতে। ইংরেজিতে প্রচুর বাক্য রয়েছে, যা বাহ্যসাদৃশ্যসম্পন্ন, কিন্তু আন্তর ব্যবধান তাদের মধ্যে দুস্তর [৪] বাঙলায়ও পাওয়া যায় প্রচুর বাক্য, যাদের বহিরঙ্গগত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু অন্তরঙ্গে রয়েছে বিপুল বৈসাদৃশ্য। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৫৩) ক সে দেখে এলো।
খ সে দেখে ফেললো।

---

৪. চমস্কি (১৯৬৪ক, ৩৪) থেকে দুটি বাক্য নিচ্ছি :

ক John is difficult to leave.

খ John is reluctant to leave.

এ-বাক্য দুটি আপাতদৃষ্টিতে সমসাংগঠনিক; সুতরাং ভাষার বহির্তলভিত্তিক সাংগঠনিক ব্যাকরণ এদের জন্যে পেশ করবে অভিন্ন সংগঠন, বা পদচিত্র। কিন্তু (ক) বাক্যটির ভেতরে ঢুকলে বোঝা যায় যে 'জন' হচ্ছে এ-বাক্যের 'লিভ' ক্রিয়ার 'যৌক্তিক কর্ম'; এবং (খ) বাক্যে 'জন' হচ্ছে 'লিভ' ক্রিয়ার 'যৌক্তিক কর্তা'। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের কৌশলের কোনো শক্তি নেই এ-অন্তর্দৃষ্টিকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার। বহির্তলের আপাতসাদৃশ্য ভেদ ক'রে উল্লিখিত বাক্য দুটির আন্তর বৈসাদৃশ্য প্রদর্শনের জন্যে দরকার রূপান্তর ব্যাকরণ, যাতে প্রতিটি বাক্যের রয়েছে একটি 'গভীর তল,' ও একটি 'বহির্তল'। বাক্য দুটি গভীর তলে বিভিন্ন; কিন্তু ওই সুদূর তল থেকে নানা রূপান্তরসূত্র প্রয়োগের ফলে বহির্তলে এরা হ'য়ে উঠেছে সদৃশ।

সংগঠনে আপাতসদৃশ হওয়া সত্ত্বেও (৫৩)-র বাক্য দুটি বিসদৃশ : 'দেখে এলো' নির্দেশ করে 'দেখার পরে আসা', আর 'দেখে ফেললো' নির্দেশ করে 'আকস্মিকভাবে দেখা', বা এ-রকম কিছু। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে এদের আন্তর ব্যবধান দেখানো সম্ভব নয়, এর জন্যে দরকার রূপান্তর ব্যাকরণ।

[গ] **বাক্যিক দ্ব্যর্থতানিরসনে ব্যর্থতা** : অদ্ব্যর্থ শব্দ-উপাদানে গঠিত কোনো বাক্য যদি সাংগঠনিক কারণে দ্ব্যর্থ (একাধিক (দুই, তিন,..) অর্থবহ) হয়, তবে ওই দ্ব্যর্থতাকে বলা যায় 'বাক্যিক দ্ব্যর্থতা', বা 'সাংগঠনিক দ্ব্যর্থতা'। এমনভাবে দ্ব্যর্থ বাক্যকে বলতে পারি 'সাংগঠনিকভাবে দ্ব্যর্থ' বাক্য। বাক্যিক দ্ব্যর্থতা, অনেক সময়, জন্ম নেয় বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহের বিভিন্ন উপাদানবিন্যাসের ফলে। একটি সরল উদাহরণ :

(৫৪) ক লাল কাগজের ফুল
খ (লাল কাগজের) ফুল
গ লাল (কাগজের ফুল)

'লাল কাগজের ফুল' বিশেষ্যপদটির দুটি অর্থ : এর এক অর্থ হচ্ছে যে (ক) 'ফুলটি লাল কাগজে তৈরি' ; এবং এর অন্য অর্থ হচ্ছে যে (খ) 'কাগজে তৈরি ফুলটি লাল'। অদ্ব্যর্থকরণের এক উপায় হচ্ছে 'বন্ধনীকরণ'। 'লাল কাগজের ফুল' বিশেষ্যপদটির প্রথম অর্থ স্পষ্ট হয়েছে (৫৪খ)-র বন্ধনীকরণের ফলে ; এবং দ্বিতীয় অর্থটি স্পষ্ট হয়েছে (৫৪গ)-র বন্ধনীকরণের ফলে। কিন্তু বাক্যিক দ্ব্যর্থতা সবসময় এমন সরল নয়। তা এতো জটিল হ'য়ে উঠতে পারে যে অব্যবহিত-উপাদানভিত্তিক বন্ধনীকরণপ্রণালি দ্ব্যর্থতামোচনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। কিঞ্চিৎ জটিল উদাহরণ :

(৫৫) ক আকাশের মতো নীল সমুদ্র দুলছে।
খ তোমার মতো লাল তিল আমি আর দেখি নি।

(৫৫ক)-বাক্যটি ত্রিমুখি দ্ব্যর্থতার নিদর্শন। বাক্যটিতে কোনো দ্ব্যর্থ শব্দ নেই, তাই বাক্যটি দ্ব্যর্থ সাংগঠনিক কারণে। আমার বোধে বাক্যটির তিন রকম অর্থ নিম্নরূপ : (ক) সমুদ্র আকাশের মতো নীল, এবং দুল্যমান ; (খ) সমুদ্র(টি) নীল, ও আকাশের মতো, এবং দুল্যমান, এবং (গ) আকাশ যেমন দোলে, নীল সমুদ্র তেমনভাবে দুল্যমান। বাস্তবে আমরা অবশ্য বাক্যটির তিন অর্থের মাঝ থেকে ছেঁকে নিই প্রথম অর্থটিকে। (৫৫খ)-বাক্যটি বহুমুখিভাবে দ্ব্যর্থ। আমার কাছে (৫৫খ)-র যে-অর্থগুলো ধরা দিয়েছে : (ক) তোমার তিল যেমন লাল, তেমন লাল তিল আমি আর দেখি নি ; (খ) তুমি একটি লাল তিল, এবং এমন লাল তিল আমি আর দেখি নি ; (গ) তুমি যেমন লাল, তেমন লাল তিল আমি আর দেখি নি। বাক্যটি নেড়েচেড়ে আরো কয়েকটি অর্থ পাওয়া সম্ভব। (৫৫খ)-বাক্যের শব্দবিন্যাস যদিও বিশেষভাবে নির্দেশ করে দ্বিতীয় অর্থটিকে, তবু বাস্তবে, বাস্তব কারণে, আমরা গ্রহণ করি বাক্যটির উল্লিখিত প্রথম অর্থটিকে। অব্যবহিত-উপাদানভিত্তিক পদসাংগঠনিক রীতিতে (৫৫)-বাক্যগুলোর দ্ব্যর্থতামোচন অসম্ভব। আরো কয়েকটি উদাহরণ :

(৫৬) ক আপনার বইটি চমৎকার।
খ তোমার পায়ের দাগ অবিনশ্বর।
গ স্নান করার সময় হাসান শরমিনকে দেখেছে।

(৫৬ক)-র নিরীহ বাক্যটিও বহুমুখিভাবে দ্ব্যর্থ। 'আপনার বইটি' বলতে বুঝাতে পারি 'যে-বইটি আপনি লিখেছেন', বা 'আপনি যে-বইটির মালিক', বা 'আপনি যে-বইটি উপহার দিয়েছেন', বা 'এ-মুহূর্তে যে-বইটি আপনার হাতে আছে' প্রভৃতি। (৫৬খ)-র 'তোমার পায়ের দাগ' দ্বিমুখিভাবে দ্ব্যর্থ। বাক্যটির এক অর্থ হচ্ছে 'তোমার পায়ে যে-দাগটি আছে, সে-টি অবিনশ্বর'; এর অন্য অর্থ হচ্ছে 'তোমার পা যে-দাগ—মাটিতে, পাথরে, গ্র্যানাইটে, বা কারো চিত্তে—এঁকেছে, তা অবিনশ্বর'। (৫৬গ)ও দ্বিমুখিভাবে দ্ব্যর্থ; এর এক অর্থ 'হাসান যখন স্নান করছিলো, তখন সে শরমিনকে দেখেছে'; আর এর অন্য অর্থ হচ্ছে 'শরমিন যখন স্নান করছিলো, তখন তাকে হাসান দেখেছে'। এ-বাক্যগুলোকে পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে দ্ব্যর্থতা থেকে মুক্ত করা অসম্ভব। (৫৬)-র বাক্যগুলোর উপাদানসমূহকে বন্ধনিবদ্ধ করা যায় নিম্নরূপে:

(৫৭) ক (আপনার বইটি) চমৎকার)
খ ((তোমার (পায়ের দাগ)) অবিনশ্বর)
গ (((স্নান করার সময়) (হাসান)) (শরমিনকে (দেখেছে)))

উল্লিখিতরূপে ছাড়া (৫৬)-র বাক্যগুলোকে অন্য কোনো রূপে বন্ধনীকরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এদের প্রতিটিই একাধিক অর্থবহ। এ-বাক্যরাশির দ্ব্যর্থতামোচনের জন্যে দরকার রূপান্তর ব্যাকরণ। আরো একটি দ্ব্যর্থ বাক্যের উদাহরণ দেখা যাক:

(৫৭) ঘ জেনারেল রহমান তাঁর বউকে ভালোবাসেন ব'লে মারেন না।

বাক্যটির সরলার্থ হচ্ছে যে 'যেহেতু জেনারেল রহমান তাঁর বউকে ভালোবাসেন, তাই তিনি তাঁর বউকে মারেন না'। কিন্তু বাক্যটির ভেতর লুকিয়ে আছে অন্য একটি কুটিল ইংগিত-অর্থ যে 'জেনারেল রহমান তাঁর বউকে মারেন, তবে ভালোবাসেন ব'লে নয়, মারেন অন্য কারণে'। এ-বাক্যের দ্ব্যর্থতানিরসনের শক্তি নেই পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের।

পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে এ-ব্যাকরণের সাহায্যে কোনো ভাষার সমস্ত বাক্য সুষ্ঠুভাবে সৃষ্টি করা অসম্ভব। অর্থাৎ বাক্যসৃষ্টিতে—বা বিশ্লেষণে—পদসাংগঠনিক তত্ত্ব ব্যর্থ, তাই দরকার এর চেয়ে শক্তিমান তত্ত্ব। চমস্কি (দ্র চমস্কি (১৯৫৭)) বিপুল উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে বাক্য সৃষ্টিতে পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ শোচনীয়ভাবে অক্ষম, তাই দরকার নতুন তত্ত্ব ও ব্যাকরণ। চমস্কি নিজেই পেশ করেন সে-শক্তিমান তত্ত্ব, যার নাম 'রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ'।

১'৫' রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ [[এক]]

১'৫'০ "সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচারস"-কাঠামোর ব্যাকরণ

রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের উন্মেষ ঘটে চমস্কির "সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচারস" (১৯৫৭) গ্রন্থে। এ-গ্রন্থে চমস্কি রূপান্তর ব্যাকরণের যে-কাঠামো পেশ করেন, তাকে আমি 'রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ [[এক]]'—সংক্ষেপে: 'রূব্যা-এক'—, বা "সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচারস"—সংক্ষেপে: "সিস্ট্রা"— -কাঠামোর ব্যাকরণ অভিধায় নির্দেশ করবো। "সিস্ট্রা"-কাঠামোর ব্যাকরণ বিগত দু'দশকে নানাভাবে শোধিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে, তবে এর মৌল বক্তব্য—ভাষায় 'রূপান্তর' সক্রিয়—সমস্ত রূপান্তর ব্যাকরণে রক্ষিত। সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণের ক্রিয়াকলাপ বোঝার জন্যে রূপান্তর-

ব্যাকরণের আদিকাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান অপরিহার্য ব'লে প্রথমে আমি ''সিনট্যা''-কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহের বিশদ বিবরণ দেবো (দ্র Φ ১'৫'০ -১'৫'৩)। পরে দেয়া হবে সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণের পরিচয় (দ্র Φ ১'৬-১'৭)।

ভাষার সমস্ত শুদ্ধ এবং কেবল শুদ্ধ বাক্য সৃষ্টির জন্যে চমস্কি ''সিনট্যা''-এ পরখ করেন তিন রকম ব্যাকরণ : (ক) 'সসীম অবস্থার ব্যাকরণ', (খ) 'পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ', ও (গ) 'রূপান্তর ব্যাকরণ'। এদের প্রথমটি সবচেয়ে দুর্বল। চমস্কি নানাবিধ যুক্তির সাহায্যে দেখান যে কোনো অসীম ভাষার সমস্ত বাক্য সৃষ্টির শক্তি 'সসীম অবস্থার ব্যাকরণে'র নেই (দ্র চমস্কি (১৯৫৭, ১৮-২১))। এ-ব্যাকরণের মূল কথা হচ্ছে 'বাঁ-থেকে-ডান দিকে নানা রকম 'বাছাই'-এর সাহায্যে সৃষ্ট হয় বাক্য', অর্থাৎ বাক্য গঠনের জন্যে প্রথমে বাছাই করতে হয় বাক্যের প্রথম শব্দটিকে, এবং এর পরে অব্যবহিত-পূর্ব শব্দের নিয়ন্ত্রণ অনুসারে বাছাই করতে হয় শব্দ। বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্যে উদাহরণস্বরূপ একটি বাক্য—'একটি পাখি উত্তর দিকে উড়ে যাচ্ছে' নেয়া যাক। উদাহরণ-বাক্যটির গঠনপ্রক্রিয়া 'সসীম ব্যাকরণ' বর্ণন করবে নিম্নরূপে : যে-সব শব্দ বাঙলা বাক্যে প্রথম ভাষাবস্তুরূপে বসতে পারে, তাদের তালিকা থেকে উদাহরণ-বাক্যের প্রথম শব্দ রূপে নির্বাচন করা হবে 'একটি'-কে, এবং তার পরে নির্বাচন করা হবে 'পাখি' শব্দটিকে। 'পাখি' শব্দটি নেয়ার কারণ হলো যে-সমস্ত শব্দ 'একটি'-র পরে বসতে পারে তাদের একটি হচ্ছে 'পাখি'। এর পরে নেয়া হবে 'উত্তর'; কেননা 'একটি পাখি'-র পরে বাঙলায় 'উত্তর' ব্যবহৃত হ'তে পারে। এ-ভাবে পূর্ববর্তী শব্দের নিয়ন্ত্রণে পরবর্তী শব্দ চয়ন ক'রে 'সসীম অবস্থার ব্যাকরণ' সৃষ্টি করবে 'একটি পাখি উত্তর দিকে উড়ে যাচ্ছে' বাক্যটি। এ-বাক্যগঠনের জন্যে যে-সমস্ত শব্দ নেয়া হয়েছে, তা না নিয়ে নেয়া যেতো অন্য সম্ভবপর শব্দ। যেমন : 'একটি'-র বদলে নেয়া যেতো 'পাঁচটি'; এবং গঠন করা যেতো 'পাঁচটি পাখি উত্তর দিকে উড়ে যাচ্ছে' বাক্যটি। 'সসীম অবস্থার ব্যাকরণের' চিত্ররূপ হবে (৫৮) :

(৫৭)

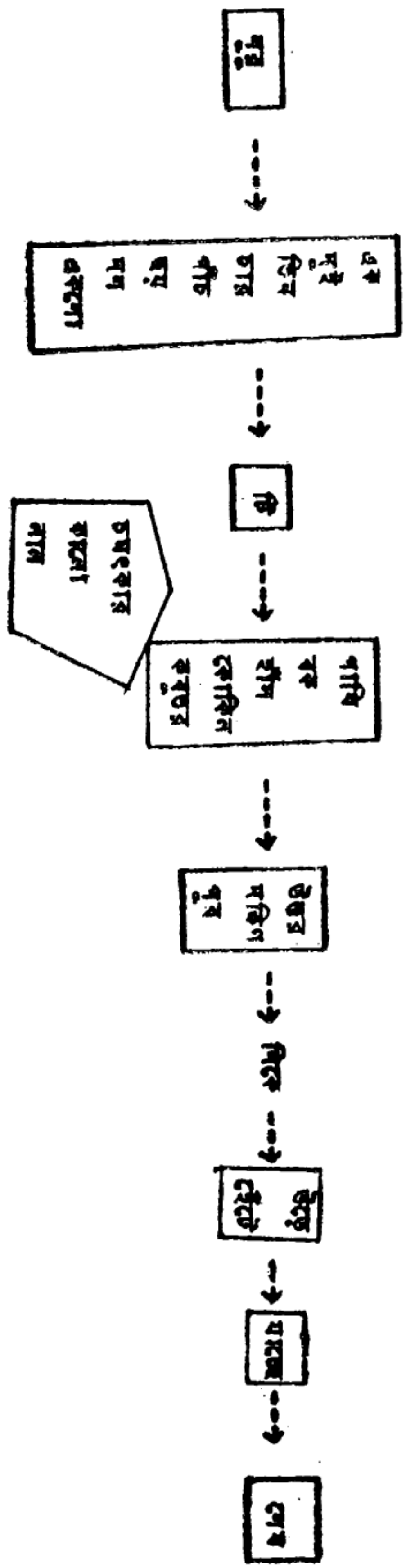

(৫৮)-র ব্যাকরণটিকে কল্পনা করা যেতে পারে এক বিমূর্ত যন্ত্র রূপে, যা এক 'অবস্থা' থেকে যায় অন্য এক 'অবস্থা'য়। এটির কাজ আরম্ভ হয় 'শুরু' অবস্থায়, এবং সমাপ্ত হয় 'শেষ' অবস্থায়। যন্ত্রটি প্রত্যেক 'অবস্থা'য় সক্রিয় হয়, এবং প্রত্যেক অবস্থা থেকে বেছে নেয়, বা সৃষ্টি করে, একটি ক'রে শব্দ। এ-প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট যে-কোনো শব্দপরম্পরাকে এ-যন্ত্রের সৃষ্ট ব্যাকরণসম্মত বাক্য ব'লে গ্রহণ করা যায়। (৫৮)-ব্যাকরণটি সৃষ্টি করবে অল্প কয়েকটি বাক্য। এর সৃষ্টিশক্তি বেড়ে যাবে বহুগুণে, যদি এর সাথে যোগ করা হয় 'লুপ', বা 'পৌনপুনিক শক্তি' (যেমনভাবে চিত্রের চতুর্থ অবস্থার সাথে যোগ করা হয়েছে 'চমৎকার, কালো, লাল' শব্দের লুপ)। ব্যাকরণটি সৃষ্টি করবে 'একটি পাখি উত্তর দিকে উড়ে যাচ্ছে', 'একটি চমৎকার পাখি উত্তর দিকে উড়ে যাচ্ছে', 'দুটি কালো পাখি দক্ষিণ দিকে হেঁটে যাচ্ছে' প্রভৃতি বাক্য। এ-ব্যাকরণটির সৃষ্ট বাক্যরাশি বেশ সহজসরল। এটির সাহায্যে বাঙলার সমস্ত বাক্য দূরে থাক, বাঙলা ভাষার এক খণ্ডাংশের সমস্ত বাক্য সৃষ্টি করতে গেলে ব্যাকরণটিকে ভয়াবহভাবে জটিল ক'রে তুলতে হবে। সসীম অবস্থার ব্যাকরণের ভাষিক তত্ত্বই ভ্রান্ত, তাই এর সাহায্যে কোনো ভাষার সমস্ত বাক্য স্বাভাবিক ও ভাষাবোধসম্মত উপায়ে সৃষ্টি করা অসম্ভব। সসীম ব্যাকরণ বাক্যসৃষ্টিতে চরমভাবে ব্যর্থ ব'লে চমস্কি বর্জন করেন এ-ব্যাকরণ।

চমস্কি (দ্র চমস্কি (১৯৫৭, ২৬-৪৮)), সসীম ব্যাকরণ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করার পর পরখ করেন 'পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ' (দ্র Φ ১'৪-১'৪'৩)। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ সসীম অবস্থার ব্যাকরণ চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান, এবং এ-ব্যাকরণ অনেক বেশি সুষ্ঠুভাবে বাক্য সৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করা সম্ভব ভাষার প্রায় সমস্ত বাক্য, এবং দেয়া সম্ভব বাক্যের স্বয়ংক্রিয় সাংগঠনিক বর্ণনা, তবু আন্তর অশক্তিবশত এর পক্ষে ভাষার সমস্ত বাক্য সুষ্ঠু ও বোধিসম্মত উপায়ে সৃষ্টি করা সম্ভব নয় (দ্র Φ ১'৪'৩)। ভাষার সমস্ত বাক্য সুষ্ঠুভাবে সৃষ্টি করার জন্যে দরকার পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের চেয়ে অধিকতর শক্তিমান ব্যাকরণ। চমস্কি ''সিন্‌ট্যা''-এ পেশ করেন সে-শক্তিমান ব্যাকরণকাঠামো, যার নাম রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ। রূপান্তর ব্যাকরণ পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিসম্পন্ন, তাই এর সাহায্যে কাটিয়ে ওঠা যায় পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা। চমস্কি অবশ্য পদসাংগঠনিক ব্যাকরণকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেন নি, বরং একে গ্রহণ করেছেন রূপান্তর ব্যাকরণের ভিত্তি রূপে, এবং এর সাথে যুক্ত করেছেন রূপান্তরতত্ত্ব। পদসাংগঠনিক সূত্র ও রূপান্তরসূত্রের শক্তিমান সমবায়ে গঠিত রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ।

১'৫'১ "সিন্‌ট্যা"-কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণের সংগঠন

''সিন্‌ট্যা''-কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণ ত্রিকক্ষিক : (ক) 'পদসাংগঠনিক কক্ষ, বা অংশ', (খ) 'রূপান্তর(সাধক) কক্ষ, বা অংশ', এবং (গ) 'রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ, বা অংশ'। এ-তিন কক্ষের, (অংশের, সংগঠনের) সমবায়ে গঠিত 'রূপান্তর ব্যাকরণ [[এক]]'। এ-ব্যাকরণের সাংগঠনিক রূপ (৫৯)। পদসাংগঠনিক কক্ষ হচ্ছে একগুচ্ছ পদসাংগঠনিক সূত্রের সমষ্টি ; রূপান্তর কক্ষ হচ্ছে একগুচ্ছ রূপান্তর সূত্রের সমষ্টি ; আর রূপধ্বনি-তাত্ত্বিক কক্ষ হচ্ছে একগুচ্ছ রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রের সমষ্টি। পদসাংগঠনিক সূত্র-রাশি গঠন করে বাক্যের 'আন্তর সংগঠন', বা 'আভ্যন্তর সংগঠন' ('গভীর সংগঠন', বা 'গভীর তল' অভিধা ''সিন্‌ট্যা''-ব্যাকরণে ব্যবহৃত হয় নি) ; আর রূপান্তরসূত্র(রাশি) আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর প্রযুক্ত হ'য়ে গঠন করে বাক্যের 'আহরিত সংগঠন', বা 'রূপান্তরিত সংগঠন'। আহরিত সংগঠনের ওপর রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করা হয় বাক্যের ধ্বনিরূপ।

(৫৯)

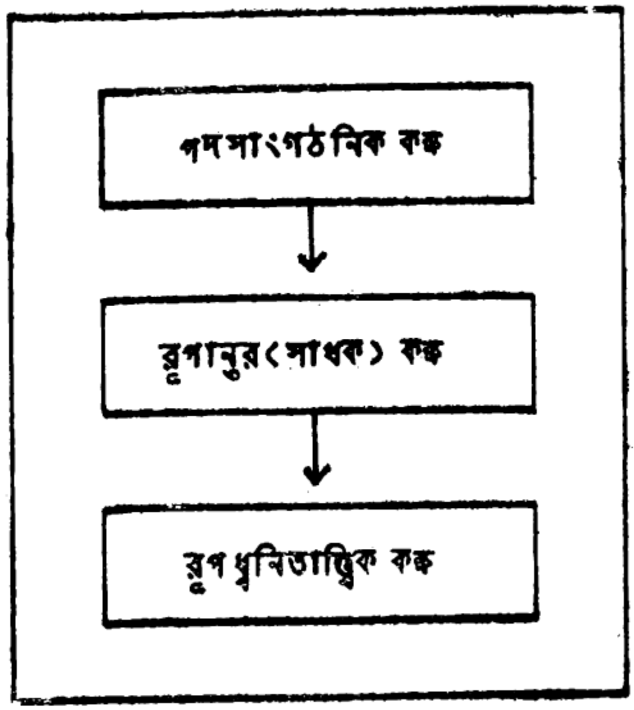

১'৫'১'১ পদসাংগঠনিক কক্ষ

''সিন্ট্যা''-কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক কক্ষ একগুচ্ছ প্রতিবেশমুক্ত, বা প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্রের সমষ্টি। এ-সূত্রসমূহ নির্দেশ করে ভাষার 'মৌল বাক্য'-এর অব্যবহিত-উপাদান। এ-সূত্ররাশি যে-সংগঠন নির্মাণ করে, তাকে বলা হয় বাক্যের 'আভ্যন্তর সংগঠন' : পরবর্তীকালে এর নাম হয় 'গভীর সংগঠন', বা 'গভীর তল' ; এবং আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে যে-সংগঠন পাওয়া যায়, তার নাম 'আহরিত সংগঠন', বা 'রূপান্তরিত সংগঠন' : পরবর্তী কালে এর নাম হয় 'বহিঃসংগঠন', বা 'বহির্তল'। পদসাংগঠনিক সূত্র ভাষার সমস্ত ও সব রকম বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন সৃষ্টি করে না ; সৃষ্টি করে বিশেষ এক শ্রেণীর বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন। চমস্কি (দ্র চমস্কি (১৯৫৭, ৪৫, ১০৭) ভাষার সমস্ত বাক্যকে ভাগ করেছেন দু'ভাগে : (ক) 'মৌল বাক্য', এবং (খ) 'আহরিত বাক্য', বা 'অমৌল বাক্য'।

[ক] **মৌল বাক্য** : ভাষার বিচিত্র শ্রেণীর বাক্য পর্যবেক্ষণ করলে এক শ্রেণীর বাক্য গোচরে আসে, যা বেশ সহজ সরল। এ-সব বাক্যে কোনো জটিল বিশেষ্যপদ, বা ক্রিয়াপদ থাকে না ; থাকে না 'কাল'-ঘটিত কোনো জটিলতা, বা 'প্রশ্নবোধক', বা 'নিষেধাত্মক' জটিলতা। এমন বাক্য গঠন করে যে-কোনো ভাষার এক ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ। চমস্কি এমন সহজসরল বাক্যকে গ্রহণ করেছেন ভাষার 'মৌল বাক্য' ব'লে। সাধারণত 'সরল-বিবৃতিধর্মী-হ্যাঁ-সূচক-কর্তৃবাচ্য'-এর বাক্যকে ধরা হয় 'মৌল বাক্য'—কার্নেল সেনটেনস—ব'লে। পদসাংগঠনিক সূত্রের সাহায্যে সৃষ্টি করা হয় মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন।

[খ] **আহরিত বাক্য** : মৌল বাক্য ছাড়া ভাষার অন্যান্য বাক্য 'অমৌল, বা আহরিত বাক্য'। মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর নানাবিধ 'রূপান্তর' প্রয়োগ ক'রে রচনা করা হয় অমৌল বাক্য।

(৬০)-এর বাক্যগুলো লক্ষণীয়

(৬০) ক মেয়েটি বই পড়ে।

খ মেয়েটি বই পড়ে না।

গ মেয়েটি কি বই পড়ে ?

ঘ মেয়েটি বই পড়ে ও গান গায়।

ঙ আমি জানি যে মেয়েটি বই পড়ে।

ওপরের বাক্যগুলোর মধ্যে (৬০ক) সরলতম : এটি একটি সরল-বিবৃতিধর্মী-হ্যাঁ-সূচক-কর্তৃবাচ্য বাক্য, যার ক্রিয়ারূপটিও সরল। এর তুলনায় অন্যান্য বাক্য অনেক জটিল : (৬০খ) নিষেধাত্মক, (৬০গ) প্রশ্নবোধক, (৬০ঘ) বাক্যে ক্রিয়াপদটি জটিল, এবং (৬০ঙ) একটি জটিল বাক্য। (৬০ঙ) দুটি মৌল বাক্যের ('আমি জানি', এবং 'মেয়েটি বই পড়ে') যোগফল। এ-বাক্যগুলোর মধ্যে (৬০ক)-কে গ্রহণ করা যায় মৌল বাক্য রূপে, এবং এর ওপর রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করা যায় অন্যান্য —অমৌল—বাক্য।

পদসাংগঠনিক কক্ষের সূত্ররাশি গঠন করে ভাষার সমস্ত মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন ; এবং ওই আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করা হয় অন্যান্য বাক্য। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণে রূপান্তরসূত্র ছাড়াই সৃষ্টি করা হয় বাক্য ; কিন্তু রূপান্তর ব্যাকরণে অন্তত একটি রূপান্তরসূত্র, সব বাক্যেই প্রযুক্ত হয়। তাই রূপান্তর ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক সূত্ররাশি কোনো বাক্যকেই সম্পূর্ণরূপে গঠন করে না, তা শুধু বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন সৃষ্টি ক'রেই বিরত হয়, এবং ওই অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব পালন করে রূপান্তরসূত্র (এবং রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র)। রূপান্তর কক্ষে দু'রকম সূত্র—'আবশ্যিক রূপান্তরসূত্র', ও 'ঐচ্ছিক রূপান্তরসূত্র'—রয়েছে। কোনো আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর কোন ধরনের—আবশ্যিক, বা ঐচ্ছিক—সূত্র প্রযুক্ত হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর ক'রে মৌল ও অমৌল বাক্যের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেয়া যায় :

[ক] **মৌল বাক্য** : পদসাংগঠনিক সূত্র ও আবশ্যিক রূপান্তর সূত্র (এবং রূপ-ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র) প্রয়োগ ক'রে, এবং কোনো ঐচ্ছিক রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ না ক'রে যে-সমস্ত বাক্য সৃষ্ট হয়, তাদের বলা হয় ভাষার 'মৌল বাক্য'।

[খ] **অমৌল, বা আহরিত বাক্য** : মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর অন্তত একটি ঐচ্ছিক রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ ক'রে যে-সমস্ত বাক্য সৃষ্ট হয়, তাদের বলা হয় ভাষার 'অমৌল, বা আহরিত বাক্য'।

যে-সমস্ত বাক্য অভিন্ন আভ্যন্তর সংগঠন থেকে উৎসারিত, তাদের বিবেচনা করা হয় 'সম্পর্কিত বাক্য' ব'লে। "সিন্ট্যা"-কাঠামোর ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক সূত্রাবলির কাজ হচ্ছে ভাষার মৌল বাক্যরাশির আভ্যন্তর সংগঠন সৃষ্টি করা। পরে অবশ্য (দ্র চমস্কি (১৯৬৫)) পরিত্যাগ করা হয়েছে ভাষার বাক্যসমূহের 'মৌল', ও 'অমৌল' বিভাগ।

১.৫.১.২ **রূপান্তর কক্ষ**

রূপান্তর কক্ষের রূপান্তরসূত্র প্রযুক্ত হয় পদসাংগঠনিক কক্ষের সূত্রাবলি কর্তৃক সৃষ্ট মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর, এবং নানাভাবে রূপান্তরিত হয় ওই আভ্যন্তর সংগঠন। রূপান্তরসূত্র প্রয়োগের ফলে গঠিত সংগঠনকে বলা হয় 'আহরিত সংগঠন', বা 'রূপান্তরিত সংগঠন'। রূপান্তরসূত্র অত্যন্ত শক্তিমান, তা বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনকে নানাভাবে পরিবর্তিত করে। রূপান্তরসূত্র বাক্যের দৃশ্যমান উপাদানের ওপর প্রযুক্ত হয় না, তা প্রযুক্ত হয় বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর, বা 'মধ্য সংগঠনের' ওপর। যেমন : 'আমি যাই' বাক্য থেকে 'আমি যাই না' বাক্যটি, রূপান্তরসূত্র প্রয়োগের ফলে, গঠিত : এ-কথার অর্থ এ নয় যে প্রথম বাক্যটির ভাষাবস্তুর ওপর রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করা হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যটি। এর অর্থ হচ্ছে যে প্রথম বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর 'নিষেধ-রূপান্তর' সূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করা হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যটি। রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ সম্পর্কে চমস্কির (দ্র চমস্কি (১৯৫৭, ৪৪)) মন্তব্য : 'ব্যাকরণিক রূপান্তর প্রযুক্ত হয় বিশেষ পদসংগঠনসম্পন্ন কোনো গ্রন্থির, বা একাধিক গ্রন্থির, ওপর, এবং তাকে রূপান্তরিত করে নতুন, আহরিত পদসংগঠনসম্পন্ন, গ্রন্থিতে।'

''সিস্ট্রা''-কাঠামোর ব্যাকরণে দু'রকম রূপান্তরসূত্র রয়েছে (দ্র চমস্কি (১৯৫৭, ৪৫)) : (ক) 'আবশ্যিক রূপান্তরসূত্র' এবং (খ) 'ঐচ্ছিক রূপান্তরসূত্র'।

[ক] **আবশ্যিক রূপান্তরসূত্র** : যে-(সমস্ত) রূপান্তরসূত্র ভাষার যে-কোনো বাক্য সৃষ্টির জন্যে অনিবার্যভাবে প্রয়োগ করতে হয়, তাই আবশ্যিক রূপান্তর সূত্র। আবশ্যিক রূপান্তরের সংখ্যা অত্যন্ত কম। যেমন : বাঙলা ভাষায় যে-কোনো বাক্য সৃষ্টির জন্যে বাক্যের ক্রিয়ারূপ ও কর্তার মধ্যে পুরুষ (শ্রেণী)গত (দ্র *Φ* ১.৪.১) সংগতি রক্ষা করতে হয়। এ-সংগতি নির্দেশ করা যেতে পারে রূপান্তরসূত্রের সাহায্যে। তাই বাঙলা ভাষায় 'কর্তা-ক্রিয়া সংগতিসূত্র'-কে গ্রহণ করা যায় আবশ্যিক রূপান্তরসূত্র রূপে। এ ছাড়া আর কোনো আবশ্যিক রূপান্তর বাঙলায় নেই। আবশ্যিক রূপান্তরসূত্রজাত বাক্য 'মৌল বাক্য' (দ্র *Φ* ১.৫.১.১)।

[খ] **ঐচ্ছিক রূপান্তর** : যে-(সমস্ত) রূপান্তরসূত্র অনিবার্য নয়, যাদের প্রয়োগ করা হয় বিশেষবিশেষ বাক্য সৃষ্টির জন্যে, তাই ঐচ্ছিক রূপান্তরসূত্র। যেমন : 'নিষেধ-রূপান্তর', বা 'প্রশ্নাত্মক রূপান্তর', বা 'আদেশ-রূপান্তর' প্রভৃতি সব বাক্য সৃষ্টির জন্যে প্রযুক্ত হয় না। 'নিষেধাত্মক বাক্য' সৃষ্টির জন্যে দরকার হয় 'নিষেধ-রূপান্তর', 'প্রশ্নবোধক বাক্য' সৃষ্টির জন্যে দরকার হয় 'প্রশ্নাত্মক রূপান্তর', এবং 'আদেশাত্মক বাক্য' সৃষ্টির জন্যে দরকার হয় 'আদেশ-রূপান্তর'। এ-সব, এবং এমন অনেক বিশেষ শ্রেণীর বাক্য সৃষ্টির জন্যে ব্যবহৃত, রূপান্তরই ঐচ্ছিক রূপান্তর।

কোনো রূপান্তরসূত্র প্রযুক্ত হ'তে পারে মাত্র একটি আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর, এবং অনেক রূপান্তরসূত্র রয়েছে, যা প্রযুক্ত হয় একাধিক আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর। রূপান্তর সূত্রের এমন প্রয়োগ অনুসারে রূপান্তর সূত্রকে (সাধারণত ঐচ্ছিক রূপান্তর এ-পর্যায়ে পড়ে) ভাগ করা হ'য়ে থাকে দু'শ্রেণীতে : (ক) 'এক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর', এবং (খ) 'একাধিক আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর'।

[ক] **এক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর** : যে-সমস্ত রূপান্তর মাত্র একটি আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর প্রযুক্ত হয়, তাদের বলা হয় 'এক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর'। যেমন : কোনো মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর 'নিষেধ-রূপান্তর', বা 'প্রশ্নাত্মক রূপান্তর', বা 'আদেশ-রূপান্তর' প্রয়োগ ক'রে আহরণ করা যায় যথাক্রমে 'নিষেধাত্মক বাক্য', 'প্রশ্নবোধক বাক্য', 'আদেশাত্মক' বাক্য' ইত্যাদি। এ-সব বাক্য গঠনের জন্যে মাত্র একটি আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর প্রয়োগ করা হয় রূপান্তরসূত্র। এমন রূপান্তর 'এক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর'-এর নিদর্শন। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৬১) ক মেয়েটি বই পড়ে =নিষেধ রূপান্তর=> মেয়েটি বই পড়ে না।

খ মেয়েটি বই পড়ে =প্রশ্নাত্মক রূপান্তর=> মেয়েটি কি বই পড়ে ?

গ মেয়েটি বই পড়ে =প্রশ্নাত্মক রূপান্তর=> কে বই পড়ে ?

(৬১ক) -তে মাত্র একটি অভ্যন্তর সংগঠনের ('মেয়েটি বই পড়ে' বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের)ওপর 'নিষেধ-রূপান্তর' প্রয়োগ ক'রে পাওয়া গেছে একটি নিষেধাত্মক বাক্য। (৬১খ, গ)-তেও রূপান্তর প্রয়োগ করা হয়েছে মাত্র একটি আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর।

[খ] **একাধিক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর** : যে-সমস্ত রূপান্তর একাধিক আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর যুগপৎ প্রযুক্ত হয়, তাদের বলা হয় 'একাধিক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর'। এ-সমস্ত রূপান্তর একাধিক আভ্যন্তর সংগঠনকে নানাভাবে মিশিয়ে নতুন বাক্যসংগঠন সৃষ্টি করে। একাধিক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক-রূপান্তর ব্যাকরণকে দেয় বাক্যসৃষ্টির 'পৌনপুনিক শক্তি'। একাধিক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তরসমূহ তাদের সৃষ্ট সংগঠনসমূহের ওপর এমনভাবে প্রযুক্ত হ'তে পারে, যার ফলে গঠিত হ'তে পারে অসংখ্য বাক্যসংগঠন। মনে করা যাক, দুটি আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর প্রযুক্ত হলো একটি রূপান্তর, এবং ফলে গঠিত হলো একটি নতুন সংগঠন। এখন এ-নতুন সংগঠনটিকে ব্যবহার করা যায় ওই রূপান্তরটির আংশিক কাঁচামাল-রূপে, এবং গঠন করা যায় আরেকটি নতুন সংগঠন। এ-প্রক্রিয়া চালানো যায় অসংখ্যবার, এবং গঠন করা যায় অসংখ্য নতুন এবং দীর্ঘতর বাক্য।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অনুসারে দু'রকম বাক্যকে বিবেচনা করা হয় একাধিক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তরজাত ব'লে। এরা হচ্ছে (ক) 'যুগ্ম, বা যৌগিক বাক্য' : যা গঠিত হয় এক বাক্যের সাথে আরেক বাক্যের যোগে : এবং (খ) 'গ্রথিত, বা জটিল বাক্য' : যা গঠিত হয় এক বাক্যের শরীরে আরেক বাক্য গেঁথে দেয়ার ফলে। যৌগিক বাক্য গঠনের জন্যে যে-রূপান্তর ব্যবহার করা হয়, তাকে বলা যায় 'যৌগিক রূপান্তর' ; আর 'গ্রথিত' বা জটিল বাক্য সৃষ্টির জন্যে যে-রূপান্তর ব্যবহৃত হয়, তাকে বলা যায় 'গ্রন্থন-রূপান্তর', বা 'জটিল রূপান্তর'। রূপান্তরের প্রকৃতি অনুসারে ভাষার বাক্যসমূহকে ভাগ করা যায় তিন ভাগে। যে-সমস্ত বাক্য এক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর প্রয়োগে গঠিত, তা 'সরল বাক্য' ; যে-সমস্ত বাক্য যৌগিক রূপান্তর প্রয়োগে গঠিত, তা 'যৌগিক বাক্য' ; আর যে-সমস্ত বাক্য জটিল রূপান্তর প্রয়োগে গঠিত, তা জটিল বাক্য। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৬২) ক
মেয়েটি রূপসী
মেয়েটি নর্তকী
} =যৌগিক রূপান্তর=> মেয়েটি রূপসী এবং মেয়েটি নর্তকী।

খ
আমি জানি
হাসিনা রূপসী
} =গ্রন্থন-রূপান্তর=> আমি জানি যে হাসিনা রূপসী।

(৬২ক)-তে দুটি আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর যৌগিক রূপান্তর প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাচ্ছে তৃতীয় একটি বাক্য ; এবং (৬২খ)-তে দুটি আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর গ্রন্থন রূপান্তর প্রয়োগ ক'রে—অর্থাৎ প্রথমটির শরীরে দ্বিতীয়টিকে গেঁথে— পাওয়া যাচ্ছে তৃতীয় একটি বাক্য।

"সিস্ট্রা"-কাঠামোর ব্যাকরণে রূপান্তরসূত্র বাক্যের অর্থবদল ঘটায়। যেমন : 'মেয়েটি বই পড়ে' বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ ক'রে 'মেয়েটি বই পড়ে না' গঠন করার সময় বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হ'য়ে যায়। রূপান্তর ব্যাকরণের সম্প্রসারণের সাথেসাথে রূপান্তর সম্পর্কে যোগ করা হয়েছে নতুন ধারণা, এবং পরিত্যাগ করা হয়েছে অনেক পুরোনো ধারণা। সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণে 'আবশ্যিক' ও 'ঐচ্ছিক' রূপান্তরের ভেদ স্বীকার করা হয় না, এবং 'এক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক' ও 'একাধিক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক' রূপান্তরের ভেদও স্বীকার করা হয় না। "সিস্ট্রা"-কাঠামোতে রূপান্তরসূত্র অতি শক্তিমান, এবং তার সাহায্যে যে-কোনো আভ্যন্তর সংগঠন থেকে আহরণ করা যায় যেমন-ইচ্ছা বাক্য। "সিস্ট্রা"-কাঠামো সংশোধনের সময় রূপান্তরসূত্রের শক্তি বিপুল পরিমাণে হ্রাস করা হয়েছে (দ্র Φ ১.৬.১)। সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণে মৌলনীতি হিশেবে গ্রহণ করা হয়েছে যে 'রূপান্তর অর্থ সংরক্ষণশীল' ; অর্থাৎ রূপান্তরসূত্র আভ্যন্তর বাক্যের অর্থ বদল ঘটাবে না। তাই বর্তমানে 'মেয়েটি বই পড়ে' বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন থেকে 'মেয়েটি বই পড়ে না', বা 'মেয়েটি কি বই পড়ে?', বা 'কে বই পড়ে?' প্রভৃতি বাক্য আহরণ করা যায় না।

১.৫.১.৩ রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ।

রূপান্তরসূত্রের প্রয়োগে বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন রূপান্তরিত হয়, এবং সৃষ্ট হয় 'আহরিত সংগঠন'। কিন্তু আহরিত সংগঠনে পাওয়া যায় না গঠিত বাক্যের ধ্বনিরূপ, এবং অনেক সময়, পাওয়া যায় না বাক্যের শব্দরাশির গ্রহণযোগ্য বাস্তব রূপ। রূপান্তর সূত্র সৃষ্টি করে নতুন পদচিত্র, বা পদসংগঠন, এবং উপহার দেয় নতুন অন্তগ্রন্থি। তাই রূপান্তরসূত্র প্রয়োগে সৃষ্ট অন্তগ্রন্থির ওপর প্রয়োগ করতে হয় 'রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র', যা বাক্যের শব্দরাশিকে দেয় বাস্তবসম্মত রূপ, এবং নির্দেশ করে বাক্যের ধ্বনিরূপ। আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর প্রয়োজনীয় সমস্ত রূপান্তরসূত্র প্রয়োগের পর পাওয়া যেতে পারে (৬৩)-র মতো একটি গ্রন্থি :

(৬৩) [# [# মেয়ে+টি # #বই# #পড়+এ# # না#] #]

(৬৩)-গ্রন্থিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ নয় ;—এতে দেখানো দরকার বাক্যটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য (বাক্যটির পদসাংগঠনিক রূপ কি, এর কোন ধ্বনির কি বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি (দ্র চমস্কি ও হাল (১৯৬৮, ৮ (৪, ৫ সংখ্যক উদাহরণ)))। (৬৩)-গ্রন্থিটির ওপর প্রয়োজনীয় রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ করলে পাওয়া যাবে বাক্যটির ধ্বনিরূপ, বা লিখিত রূপ :

'মেয়েটি বই পড়ে না'। (৬৩)-কে বলতে পারি 'বাক্যিক বহিঃসংগঠন', আর এর ওপর রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে এর চূড়ান্ত রূপ : ধ্বনিরূপ, অথবা লিখিত রূপ।

(৫৯)-চিত্রে "সিন্‌ট্যা"-কাঠামোর ব্যাকরণের সরল সংগঠন দেখানো হয়েছে। (৫৯)-তে ব্যাকরণকে বিভক্ত করা হয়েছে তিনটি কক্ষে, কিন্তু সহজেই এ-কক্ষ তিনটিকে পরিণত করা যায় দু'কক্ষে। 'পদসাংগঠনিক কক্ষ', ও 'রূপান্তর কক্ষ'কে বিবেচনা করা

(৬৪)

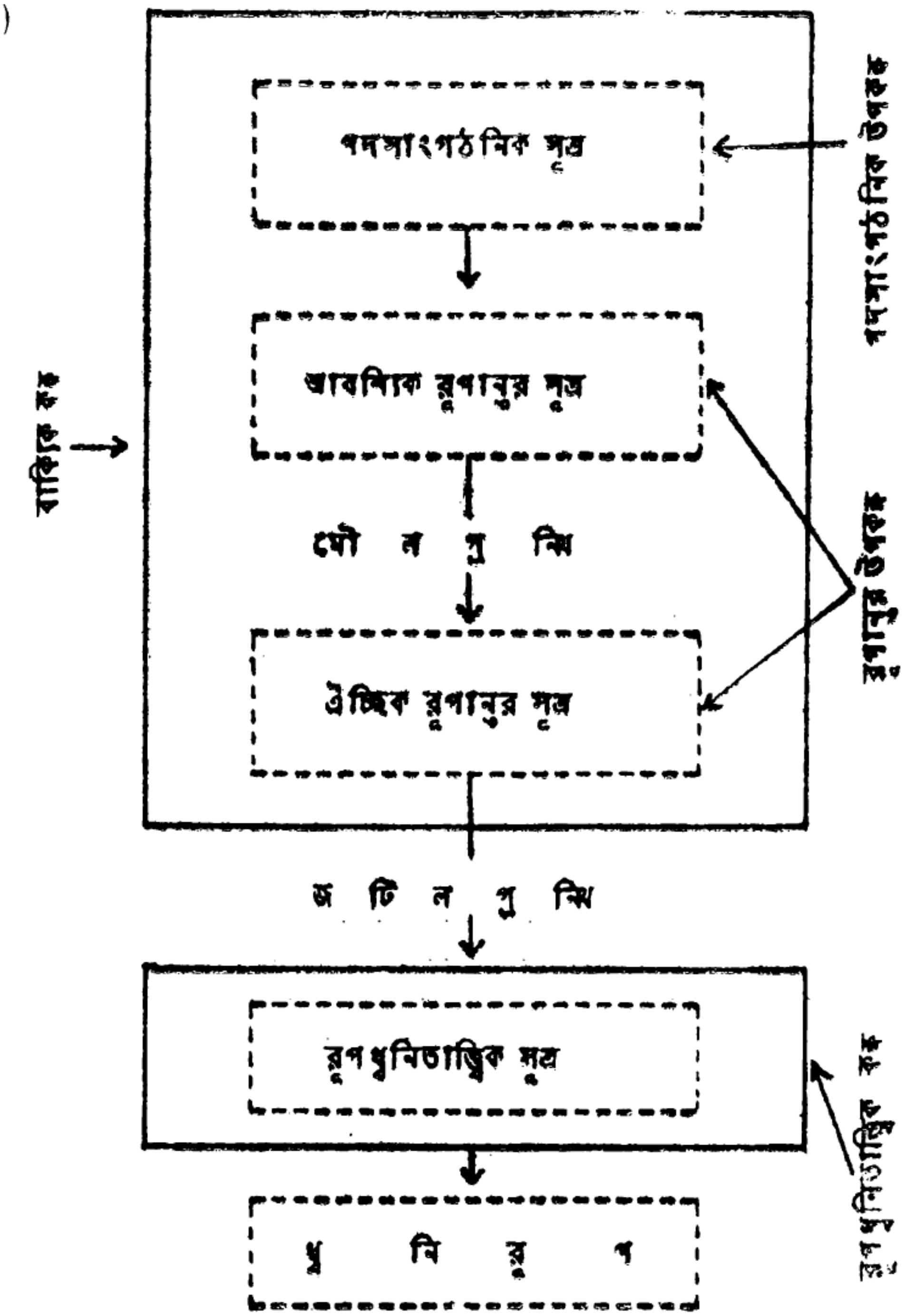

যায় 'বাক্যিক কক্ষ'-এর দুটি উপকক্ষ ব'লে। ɸ ১'৫'১'১'-১'৫'১৩ পরিচ্ছেদাংশসমূহে "সিন্‌ট্যা"-কাঠামোর ব্যাকরণের কলাকৌশলের যে-বিবরণ দেয়া হয়েছে, সে-অনুসারে এ-ব্যাকরণের পূর্ণ রূপ দেখানো যায় (৬৪)-রূপে।

বাক্যিক কক্ষ এ-ব্যাকরণের প্রাণ। বাক্যিক কক্ষের ভিত্তি হচ্ছে পদসাংগঠনিক উপকক্ষ, যা একগুচ্ছ পুনর্লিখন সূত্রের সমষ্টি। পদসাংগঠনিক সূত্রাবলি কর্তৃক গঠিত আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর প্রযুক্ত হয় রূপান্তর সূত্র, এবং পাওয়া যায় আহরিত সংগঠন। আহরিত সংগঠনের ওপর রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যায় বাক্যের ধ্বনিরূপ।

১'৫'২ 'রূপান্তর ব্যাকরণ [[এক]]'-এর প্রণালিতে বাক্যবিশ্লেষণ

চমস্কির "সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচারস" (১৯৫৭) প্রকাশের পর এ-গ্রন্থে প্রস্তাবিত ব্যাকরণকাঠামোর ভিত্তিতে রচিত হয় ইংরেজি ও অন্যান্য অনেক ভাষার খণ্ডিত ব্যাকরণ (দ্র গ্লিটম্যান (১৯৬১), ক্লিমা (১৯৬৪), লিজ (১৯৬০), ম্যাথিউজ (১৯৬৪))। কিন্তু ১৯৫৭-১৯৬৫ সময়কালে এ-ব্যাকরণকাঠামো সংশোধিত ও সম্প্রসারিত হ'তে থাকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে (দ্র ক্যাটজ ও ফোদোর (১৯৬৩), ক্যাটজ ও পোস্টাল (১৯৬৪), চমস্কি (১৯৬৫)), এবং ভাষা সৃষ্টি বা বর্ণনার জন্যে এ-কাঠামোকে আর ব্যবহার করা হয় না। এখন আর "সিস্ট্রা"-কাঠামোর ব্যাকরণের সাহায্যে ভাষাসৃষ্টি বা বর্ণনার চেষ্টা করা হয় না কোথাও। "সিস্ট্রা"-ব্যাকরণকাঠামো বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত। তবে এ-কাঠামোকে ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে উঠেছে চমস্কীয় রূপান্তর ব্যাকরণের নতুন কাঠামো, যার নাম "আস্পেকটস"-কাঠামোর ব্যাকরণ (দ্র Φ ১.৬)। "সিস্ট্রা"-কাঠামোর ব্যাকরণ বর্তমানে যদিও পরিত্যক্ত, তবু এ-ব্যাকরণের বাক্যসৃষ্টির কৌশল দেখানোর জন্যে বাঙলা ভাষার এক অতি তুচ্ছ খণ্ডাংশ, এ-পরিচ্ছেদাংশে, "সিস্ট্রা"-কাঠামোর প্রণালিতে বর্ণনা করা হবে। প্রথম নেয়া যাক উপাত্ত (৬৫):

(৬৫) ক একটি মেয়ে বই পড়ছে।
ক' মেয়েটি বই পড়ছে।
খ একটি মেয়ে বই পড়ছে না।
খ' মেয়েটি বই পড়ছে না।
গ দুটি মেয়ে বই পড়ছে।
গ' মেয়ে দুটি বই পড়ছে।
ঘ দুটি মেয়ে বই পড়ছে না।
ঘ' মেয়ে দুটি বই পড়ছে না।

(৬৫)-উপাত্তে আছে আটটি বাক্য। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এ-উপাত্তের ব্যাকরণ রচনা করা। এ-উপাত্ত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যেও সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু এখানে আমাদের দায়িত্ব "সিস্ট্রা"-কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণের সাহায্যে এ-উপাত্ত সৃষ্টি। প্রথম স্থির করতে হবে (৬৫)-উপাত্তে 'মৌল বাক্য' কোনগুলো; এবং সে-বাক্যগুলোর আভ্যন্তর সংগঠন সৃষ্টি করতে হবে পদসাংগঠনিক উপকক্ষের পদসাংগঠনিক সূত্রের সাহায্যে। পরে পদসাংগঠনিক সূত্রের সাহায্যে রচিত আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করতে হবে 'অমৌল বাক্য'সমূহ। তাই (৬৫)-উপাত্ত সৃষ্টির জন্যে প্রথমে নিতে হবে দু'বিষয়ে সিদ্ধান্ত:

[ক] (৬৫)-উপাত্তে মৌল বাক্য কোনগুলো, অর্থাৎ শনাক্ত করতে হবে উপাত্তের মৌল বাক্যরাশি।

[খ] স্থির করতে হবে কি-কি রূপান্তর—আবশ্যিক, ও ঐচ্ছিক—বাক্যসমূহে ক্রিয়াশীল।

[ক] **উপাত্তের মৌল বাক্য** : (৬৫ক, ক´)-এর মধ্যে (৬৫ক)-কে ('একটি মেয়ে বই পড়ছে') গ্রহণ করা যায় মৌল বাক্য রূপে। এ-বাক্যটির সংগঠন হচ্ছে : 'নির্দেশক + বিশেষ্য + বিশেষ্য + ক্রিয়ারূপ'। এটিতে আছে দুটি বিপ ('একটি মেয়ে', 'বই'); তার মধ্যে প্রথম বিশেষ্যপদের বাঁয়ে আছে নির্দেশক। (৬৫ক´)-বাক্যটির সংগঠনও অনুরূপ, এবং আপাতদৃষ্টিতে সরলতর; তবে এটিতে নির্দেশকটি ('টি') বসেছে প্রথম বিপ-র ডানে। 'একটি মেয়ে' হচ্ছে একটি 'অনির্দিষ্ট বিপ' এবং 'মেয়েটি' হচ্ছে 'নির্দিষ্ট বিপ'। বাঙলায় অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদের বাঁয়ে বসে নির্দেশক এবং নির্দিষ্ট বিশেষ্য-পদের ডানে বসে নির্দেশক। অনির্দিষ্টতা ও নির্দেশকের বিশেষ্যের বাঁয়ে অবস্থানকে ধরছি সরল ব'লে; এবং নির্দিষ্টতা ও নির্দেশকের বিশেষ্যের ডানে অবস্থানকে ধরছি জটিল ব'লে। তাই (৬৫ক, ক´)-এর মধ্যে প্রথমটিকে ধরছি মৌল বাক্য ব'লে। (৬৫)-র অন্যান্য বাক্যের মধ্যে (৬৫গ)-বাক্যটি ('দুটি মেয়ে বই পড়ছে') অবিকলভাবে (৬৫ক)-র সমতুল্য : এ-বাক্য দুটির সংগঠন অভিন্ন। এদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে (৬৫ক)-তে যেখানে বসেছে 'এক', (৬৫গ)-তে সেখানে বসেছে 'দু'। এ-বাক্য দুটিকে গ্রহণ করতে পারি (৬৫)-উপাত্তের মৌল বাক্য ব'লে, এবং এদের আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ ক'রে আহরণ করা যায় অন্যান্য বাক্য। (৬৫খ, খ´)-বাক্য দুটি বেশ জটিল : এ-বাক্যযুগল নিষেধাত্মক। (৬৫ঘ, ঘ´)-বাক্যযুগলও নিষেধাত্মক। (৬৫গ´)-বাক্যটির প্রথম বিশেষ্যপদটি নির্দিষ্ট, এবং তাই এটি (৬৫ক, গ)-র চেয়ে জটিল। (৬৫ক, গ) বাক্য দুটি 'সরল, বিবৃতিধর্মী, হ্যাঁ-সূচক, অনির্দিষ্ট কর্তা-বিশেষ্যপদ সম্বলিত' বাক্য। এ-বাক্য দুটি উপাত্তের সরলতম, সুতরাং, মৌল বাক্য। অন্যান্য বাক্য অমৌল, বা রূপান্তরের সাহায্যে গঠিত।

[খ] **উপাত্তের বাক্যে ক্রিয়াশীল রূপান্তরসমূহ** : উপাত্তে থাকতে পারে 'আবশ্যিক রূপান্তরসূত্র', এবং 'ঐচ্ছিক রূপান্তরসূত্র'। বাঙলায় মাত্র একটি আবশ্যিক রূপান্তর সূত্র—কর্তা-ক্রিয়াসংগতি-সূত্র—রয়েছে। কিন্তু এ-উপাত্তে যেহেতু সব বাক্যেই 'তৃতীয় পুরুষ-সাধারণ শ্রেণী'র কর্তা-বিশেষ্যপদ ব্যবহৃত, তাই বাঙলা ভাষার সংগতিসূত্রটি এ-উপাত্তে ধরা পড়ে নি। তবু মনে করা যাক, এ-উপাত্তে কর্তা-ক্রিয়াসংগতির একটি আব-শ্যিক সূত্র রয়েছে ('সূত্রটি হচ্ছে : 'ক্রিয়ারূপ বাক্যের কর্তার পুরুষ(শ্রেণী)র সাথে সংগতিপূর্ণ হবে')। তাই এ-উপাত্তে পাওয়া যাচ্ছে একটি আবশ্যিক সূত্র। এখন দেখা যাক, এ-উপাত্তে কি-কি ঐচ্ছিক রূপান্তর সক্রিয়। দুটি ঐচ্ছিক রূপান্তর চোখে পড়ে এ-উপাত্তে। এদের মধ্যে একটি খুব স্পষ্ট; এবং সে-টির নাম দিতে পারি 'নিষেধ-রূপান্তর'। (৬৫খ, খ´, ঘ, ঘ´)-বাক্যগুলো নিষেধাত্মক। এ-বাক্যগুলোকে আহরণ করতে হবে মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর 'নিষেধ-রূপান্তরসূত্র' প্রয়োগ ক'রে। দ্বিতীয় ঐচ্ছিক রূপান্তরটি বেশ অস্পষ্ট, সহজে চোখে পড়ে না; এর নাম দিতে পারি 'নির্দিষ্টায়ন রূপান্তর'। (৬৫)-র বাক্যসমূহের কয়েকটি বাক্যের কর্তা অনির্দিষ্ট ('একটি মেয়ে', 'দুটি মেয়ে'), এবং কয়েকটি বাক্যের কর্তা নির্দিষ্ট ('মেয়েটি', 'মেয়ে দুটি')। অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে নির্দেশক ('একটি', 'দুটি') থাকে বিশেষ্যের বাঁয়ে, এবং নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে নির্দেশক থাকে বিশেষ্যের ডানে। সুতরাং অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদকে 'নির্দিষ্টায়ন রূপান্তরসূত্র' প্রয়োগ ক'রে নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে পরিণত করা যায়। পদসাংগঠনিক সূত্রের সাহায্যেই সৃষ্টি করা যায় অনির্দিষ্ট, ও নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদ। কিন্তু অমনভাবে সৃষ্টি করলে মনে হবে যে বাঙলা অনির্দিষ্ট ও নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু স্পষ্ট-ভাবে আমি বোধ করি যে বাঙলা অনির্দিষ্ট ও নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এদের সংগঠন প্রায় অভিন্ন : পার্থক্য শুধু এ যে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে নির্দেশক বসে বিশেষ্যের বাঁয়ে, এবং নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে বসে বিশেষ্যের ডানে। অনির্দিষ্ট ও নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদের এ-সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করা যে-কোনো বর্ণনাত্মক

যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যাকরণের কর্তব্য। সুতরাং এ-উপাত্তে ক্রিয়াশীল রূপান্তরসূত্র পাওয়া যাচ্ছে তিনটি :

[ক] কর্তা-ক্রিয়া(রূপ) সংগতিসূত্র : আবশ্যিক

[খ] নিষেধ-রূপান্তর }
[গ] নির্দিষ্টায়ন রূপান্তর } ঐচ্ছিক

আমরা জানি যে রূপান্তর ব্যাকরণে পদসাংগঠনিক ও রূপান্তর—উভয় প্রকার সূত্রই প্রযুক্ত হয় ক্রমানুসারে (দ্র Φ ১·৩·২ ; ১·৪·৩)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে উল্লিখিত সূত্র তিনটির প্রয়োগক্রম কি হবে ? 'সংগতিসূত্র'টি প্রযোজ্য সব বাক্যে, তাই এটিকে স্থান দেয়া যায় সবার শেষে। 'নিষেধ-রূপান্তর', ও 'নির্দিষ্টায়ন রূপান্তর'-এর মধ্যে কোনটি আগে প্রযুক্ত হবে ? সূত্রের ক্রমরক্ষা অবশ্য সর্বদা দরকারী নয় (এখানেও নয়), তবে অনেক সময়, বাহ্যিক ক্রমবিন্যস্ত সূত্রের ক্রম বিনষ্ট হ'লে ব্যাকরণবিরুদ্ধ বাক্য তৈরি হয়। এ-উপাত্তের 'নিষেধ-রূপান্তর' ও নির্দিষ্টায়ন রূপান্তর'-এর প্রয়োগের ক্রমও নির্ণয় করা যায়। (৬৫গ, ঘ) বাক্য দুটির তুলনা করা যাক : উভয় বাক্যের কর্তা-বিশেষ্য-পদই নির্দিষ্ট; কিন্তু (৬৫গ) বাক্যটি 'হ্যাঁ-সূচক', এবং (৬৫ঘ)-বাক্যটি 'না-সূচক'। আমরা স্থির করেছি যে 'হ্যাঁ-সূচক' বাক্য 'না-সূচক' বাক্যের চেয়ে সরল। উপাত্তে দেখা যায় যে নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদ 'হ্যাঁ-সূচক', ও 'না-সূচক'—উভয় রকম বাক্যেই থাকতে পারে। যদি উপাত্ত থেকে জটিল, না-সূচক বাক্য বর্জন করি, তবুও থাকে নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদ, এবং 'নির্দিষ্টায়ন রূপান্তর'। তাই 'নির্দিষ্টায়ন রূপান্তর' প্রযুক্ত হবে 'নিষেধ-রূপান্তর'-এর আগে। (৬৫)-উপাত্ত সৃষ্টির জন্যে, সুতরাং, রূপান্তরসূত্রক্রম হবে :

[ক] নির্দিষ্টায়ন রূপান্তর }
[খ] নিষেধ-রূপান্তর } ঐচ্ছিক

[গ] কর্তা-ক্রিয়া(রূপ) সংগতিসূত্র : আবশ্যিক

(৬৫)-উপাত্তের মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন সৃষ্টির জন্যে দরকার হবে পদ-সাংগঠনিক ব্যাকরণ (৬৬) :

(৬৬) ক বাক্য → বিপ + ক্রিপ

খ ক্রিপ → বিপ + ক্রিরূ

গ ক্রিরূ → ক্রিমূ + ক্রিস

ঘ ক্রিস → ক্রিরী + কাল + সংগতি

ঙ	বিপ	→	{ নি + $\text{বি}_{\text{মনুষ্য}}$ / # — $\text{বি}_{\text{বস্তু}}$ }
চ	নি	→	সংখ্যা + অনু
ছ	$\text{বি}_{\text{মনুষ্য}}$	→	{ বি-প্রপু বি-দ্বিপু বি-তৃপু }
ছ	বি-দ্বিপু	→	{ বি-দ্বিপু-সম্মান বি-দ্বিপু-সাধারণ বি-দ্বিপু-হীন }
জ	বি-তৃপু	→	{ বি-তৃপু-সম্মান বি-তৃপু-সাধারণ }
ঝ	ক্রিরী	→	{ সরল ঘটমান ঘটিত }
ঞ	কাল	→	বর্তমান
ট	ক্রিমূ	→	পড়
ঠ	$\text{বি}_{\text{বস্তু}}$	→	বই
ড	বি-প্রপু	→	আমি, আমরা
ঢ	বি-দ্বিপু-সম্মান	→	আপনি, আপনারা
ণ	বি-দ্বিপু-সাধারণ	→	তুমি, তোমরা
ত	বি-দ্বিপু-হীন	→	তুই, তোরা
থ	বি-তৃপু-সম্মান	→	তিনি তাঁরা
দ	বি-তৃপু-সাধারণ	→	মেয়ে, সে, তারা
ধ	সংখ্যা	→	এক, দু

ন	অনু	→	টি
প	সরল	→	φ
ফ	ঘটমান	→	ছ
ব	ঘটিত	→	এছ
ভ	বর্তমান	→	φ

এ-সূত্রসমূহ গঠন করবে (৬৫)-র মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন, এবং তার ওপর প্রয়োজনীয় রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করা যাবে অন্যান্য বাক্য (এ-সূত্রসমূহ উপাত্ত-অতিরিক্ত বহু বাক্য সৃষ্টি করবে। উপাত্তে আছে শুধু তৃতীয় পুরুষ-সাধারণ বিশেষ্য, কিন্তু এখানে বাঙলা ভাষার সব রকম বিশেষ্যপদ সৃষ্টির ব্যবস্থা রয়েছে। উপাত্তে শুধু ঘটমান ক্রিবী রয়েছে; কিন্তু (৬৬)-ব্যাকরণে তিন প্রকার—'সরল', 'ঘটমান', 'ঘটিত'—ক্রিবী সৃষ্টির ব্যবস্থা রয়েছে। ব্যাকরণটি প্রচুর শুদ্ধ বাক্য সৃষ্টির সাথেসাথে বেশ কিছু অশুদ্ধ বাক্যও সৃষ্টি করবে। (৬৬ঙ) সূত্রটি সংশোধনযোগ্য। সূত্রটি নির্দেশ করছে যে মনুষ্যবাচক বিশেষ্য বসতে পারে কর্তা-রূপে এবং বস্তুবাচক বিশেষ্য কর্ম-রূপে। সূত্রটিতে আরো একটি শর্ত আরোপ করা দরকার যে কর্তা যদি সর্বনাম হয়, তবে তার বাঁয়ে 'নি' (নির্দেশক) বসতে পারবে না, কিন্তু তা যদি বিশেষ্য হয়, তবে নির্দেশক বসবে। (৬৬)-ব্যাকরণের সূত্র প্রয়োগের সময় এ-বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।)। এ-ব্যাকরণের সাহায্যে বাক্যসৃষ্টির জন্যে একটি রূপান্তর অনিবার্যভাবে প্রয়োগ করতে হবে; এবং সে-রূপান্তরটি হচ্ছে 'কর্তা-ক্রিয়া(রূপ) সংগতি রূপান্তর'। ব্যাকরণটি (৬৭)-পদচিত্ররূপী আভ্যন্তর সংগঠন সৃষ্টি করবে :

(৬৭)

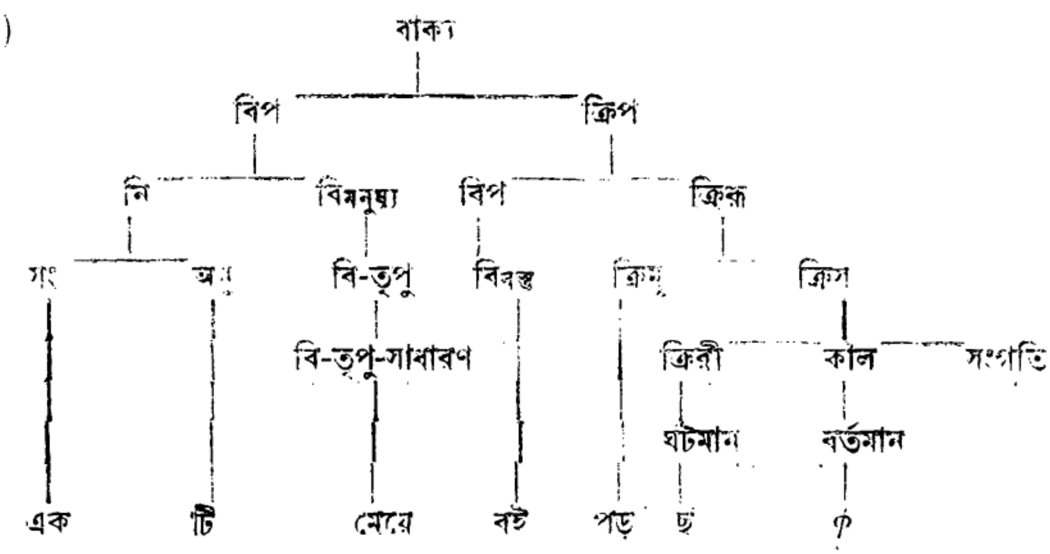

(৬৭)-র অন্তর্গ্রন্থিটি হচ্ছে : 'এক+টি+মেয়ে+বই+পড়+ছ+ φ'। (৬৭)-তে সংগতি রূপান্তর এবং রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ করলে পাওয়া যাবে 'একটি মেয়ে বই পড়ছে'; অর্থাৎ (৬৫ক)-বাক্যটি। (৬৭)-র আভ্যন্তর সংগঠনটির ওপর তিনটি রূপান্তর

সূত্র প্রযুক্ত হ'তে পারে ('নির্দিষ্টায়ন', 'নিষেধ', ও 'সংগতি' রূপান্তর)। এখন আমাদের কর্তব্য এ-রূপান্তরসমূহের সূত্ররচনা করা।

[ক] **নির্দিষ্টায়ন রূপান্তর সূত্র** : (৬৭)-র কর্তা-বিশেষ্যপদটির (বাক্য-গুরুর বিশেষ্য-পদটির) সংগঠন হচ্ছে 'নি, + বিমনুষ্য'। এটি একটি অনির্দিষ্ট বিপ। এ-বিশেষ্যপদে বিশেষ্যের বাঁয়ে আছে 'নি', যার সংগঠন হচ্ছে 'সং + অনু'। এ-অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদটিকে কি-ভাবে নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে পরিণত করা যায়? সামান্য অভিনিবেশেই বোঝা যায় যে বাঙলা অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে 'নি' থাকে বিশেষ্যের বাঁয়ে : যেমন—'একটি মেয়ে,' 'দুটি মেয়ে', 'পাঁচটি পাখি' প্রভৃতি। কিন্তু নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে 'নি' থাকে বিশেষ্যের ডানে : যেমন—'মেয়েটি', 'মেয়ে দুটি', 'পাখি পাঁচটি'। কিন্তু এর মধ্যে একটি চমৎকার ব্যাপার লুকিয়ে আছে। 'নি' যদি গঠিত হয় সংখ্যা 'এক' এবং 'টি'-তে, তবে নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে বিশেষ্যের ডানে 'নি' বসার সময় 'নি'-র 'এক' সংখ্যাটি লোপ পায়। লোপ পায়, কেননা 'এক' সংখ্যাটি 'পুনরুদ্ধারযোগ্য'। কিন্তু 'নি'-র সংখ্যাটি যদি হয় অন্য কোনো সংখ্যা—যেমন : 'দু', 'তিন', 'চার' প্রভৃতি—, তবে তা, পুনরুদ্ধারঅযোগ্য ব'লে, লোপ পায় না। যেমন : 'একটি মেয়ে'=>'মেয়ে একটি'=>'মেয়েটি', 'দুটি মেয়ে'=>'মেয়ে দুটি'। সুতরাং 'নির্দিষ্টায়ন সূত্র'কে গদ্যে পেশ করা যায় এ-ভাবে : 'অনির্দিষ্ট বিশেষ্য-পদে বিশেষ্যের বাঁয়ে অবস্থিত নির্দেশকটিকে স্থানান্তরিত করুন বিশেষ্যের ডানে; এবং নির্দেশকটির সংখ্যা যদি 'এক' হয়, তবে তা বিলোপ করুন, অন্যথায় রক্ষা করুন।' কিন্তু রূপান্তর ব্যাকরণসম্মত সূত্র রচনা করতে হ'লে (৬৭)-পদচিত্রটিকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, এবং সংগঠনটিকে বর্ণনা করতে হবে সূত্রটির জন্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে। দেখা যাবে যে-বিশেষ্যপদের ওপর নির্দিষ্টায়ন সূত্র প্রযোজ্য, সে-বিশেষ্যপদের ডান-বাঁয়ের কোনো উপাদান এ-সূত্র প্রয়োগে কোনো রকম শর্ত আরোপ করে না। এ-সূত্রটি প্রয়োগের সময় বাক্যের অন্যান্য পদের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া যায়। 'নির্দিষ্টায়ন সূত্র'টি হবে নিম্নরূপ :

[৬৮] **নির্দিষ্টায়ন রূপান্তরসূত্র (ঐচ্ছিক)**

[ক] ঙ — সং + অনু — বি — ঙ => ঙ — বি — সং+অনু—ঙ

[খ] ঙ — বি — সং + অনু — ঙ => ঙ — বি + অনু — ঙ

শর্ত : যদি সংখ্যা = 'এক'

সূত্রটি দুটি অংশে—'ক', ও 'খ'—বিভক্ত। সূত্রটিতে তীরের বাঁ-পাশে আছে আভ্যন্তর সংগঠনের বর্ণনা, এবং ডানে দেখানো হয়েছে সাংগঠনিক রূপান্তর। (৬৮ক) নির্দেশ দিচ্ছে যে 'সং + অনু — বি'-রূপী সংগঠন পাওয়া গেলে (সংগঠনের বাঁয়ে-ডানে যা-ই থাকুক (কভারপ্রতীক 'ঙ'-দ্বারা নির্দেশিত)) তাকে 'বি-সং+অনু'-রূপী সংগঠনে রূপান্তরিত করতে হবে। (৬৮খ) নির্দেশ করছে আরো রূপান্তর। এটি প্রযুক্ত হবে (৬৮ক)-সূত্রের উৎপাদনের ওপর। এটি নির্দেশ করছে যে যদি 'বি-সং+অনু'-রূপী কোনো সংগঠনে 'সং' হয় 'এক', তবে তাকে পরিত্যাগ ক'রে সংগঠনটিকে 'বি+অনু'-রূপ দিতে হবে। (৬৮ক) সূত্রটি (৬৯ক) পদচিত্রকে (অর্থাৎ ৬৭-র কর্তা-বিশেষ্য-পদটিকে) রূপান্তরিত করবে (৬৯খ)-তে; এবং (৬৮খ)-সূত্রটি (৬৯খ)-কে রূপান্তরিত করবে (৬৯গ)-তে।

(৬৯)

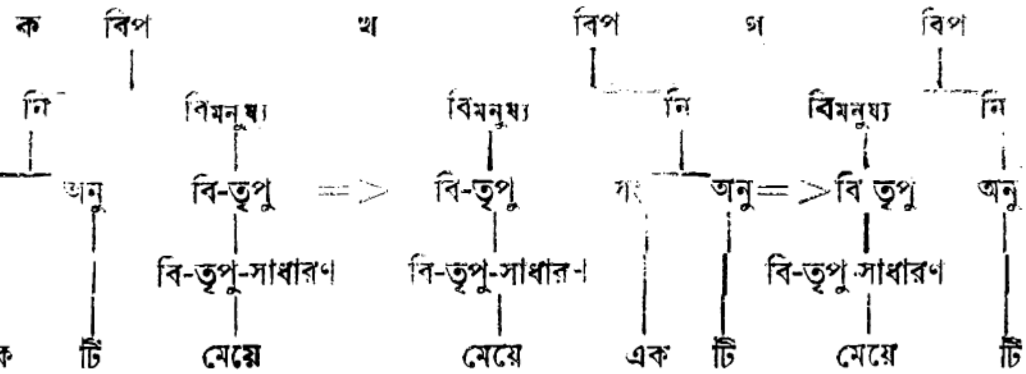

(৬৮) সূত্রের সাহায্যে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদকে নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে পরিণত করা যায়।

[খ] **নিষেধ রূপান্তরসূত্র** : নিষেধ রূপান্তরের কাজ হলো হ্যাঁ-সূচক বাক্যকে না-সূচক বাক্যে রূপান্তরতি করা। (৬৬)-ব্যাকরণের সূত্ররাশি গঠন করে হ্যাঁ সূচক বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন (দ্র (৬৭))। এ সংগঠনের ওপর রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ ক'রে একে না-সূচক বাক্যসংগঠনে রূপান্তরিত করতে হবে। (৬৫)-র উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ক'রে বুঝি যে হ্যাঁ-সূচক বাক্যের ডান প্রান্তে 'নিষেধ-চিহ্ন' 'না' যোগ ক'রে গঠন করতে হয় নিষেধাত্মক বাক্য। নিষেধাত্মক বাক্যগঠনের সূত্রটি, সরল গদ্যে, হবে এমন : 'হ্যাঁ-সূচক বাক্যের ডান প্রান্তে 'না' যোগ করুন।' এ-নির্দেশের রূপান্তর ব্যাকরণসম্মত সূত্র হবে (৭০) :

(৭০) **নিষেধ রূপান্তরসূত্র (ঐচ্ছিক)**

≠ বিপ − ক্রিপ # => # বিপ − ক্রিপ − না #

(৭০)-সূত্রটি আভ্যন্তর সংগঠনে যোগ করে একটি নতুন ভাষাবস্তু—'না'; এবং এটি যুক্ত হয় বাক্যের ডান প্রান্তে। সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণের পদচিত্রে রূপান্তরসূত্রের সাহায্যে কোনো রকম ভাষাবস্তু যোগ করা নিষিদ্ধ, তবে "সিন্ট্যা"-ব্যাকরণে পদচিত্রে ভাষাবস্তু-যোগ-করা রূপান্তর ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। (৭০)-সূত্রটি (৬৭)-পদচিত্রটিকে রূপান্তরিত করবে (৭১)-এ :

(৭১)

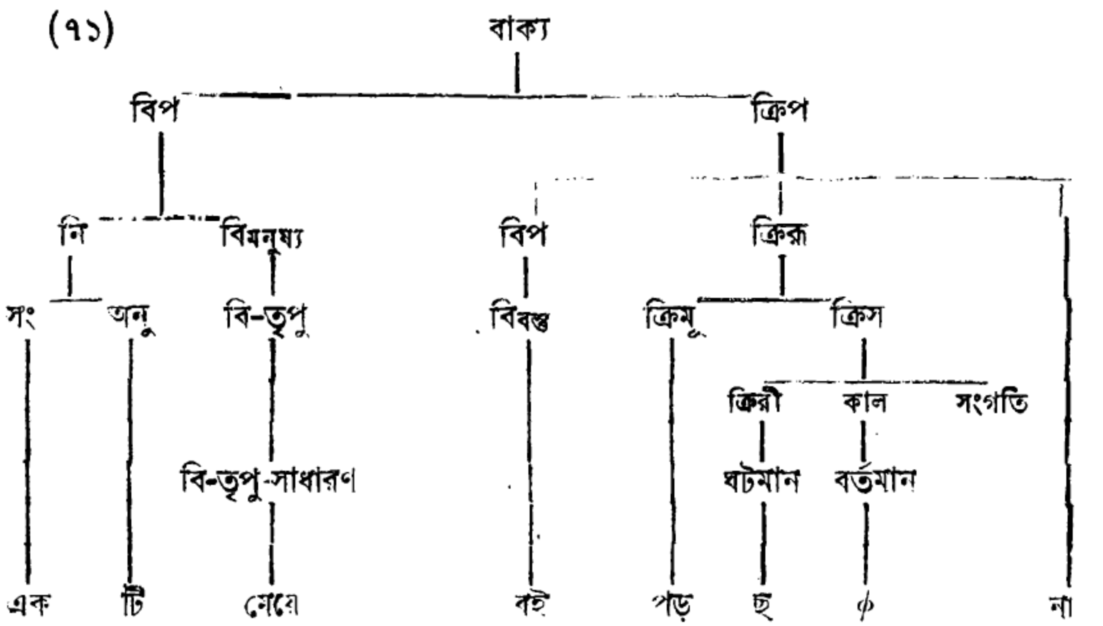

(৭১)-এর অন্তর্গ্রন্থি হচ্ছে # এক + টি + মেয়ে + বই + পড় + ছ + ϕ + না #।

(৭১)-এ কর্তা-ক্রিয়া সংগতিসূত্র প্রয়োগ করা দরকার গ্রহণযোগ্য বাক্য গঠনের জন্যে। সংগতিসূত্র প্রয়োগের পর যে-আহরিত সংগঠন পাওয়া যাবে, তার ওপর প্রয়োগ করতে হবে রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র—বাক্যের ধ্বনিরূপ পাওয়ার জন্যে। যদি সংগতিসূত্র প্রয়োগ ছাড়াই (৭১)-এর ওপর প্রয়োগ করি রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র, তবে পাওয়া যাবে ব্যাকরণবিরুদ্ধ বাক্য '*একটি মেয়ে বই পড়ছ না'।

[গ] কর্তা-ক্রিয়া(রূপ) সংগতিসূত্র (আবশ্যিক)

(৬৫)-উপাত্তে যদিও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়নি, তবুও আমরা জানি যে বাঙলার ক্রিয়ারূপ কর্তার সাথে পুরুষ(শ্রেণী)-গত সংগতি রক্ষা করে (দ্র Φ ১.৪.১)। এ-সূত্রটিকে, সরল গদ্যে, পেশ করা যায় এ-ভাবে : 'কর্তা-বিশেষ্য যে-পুরুষ(শ্রেণী)র, ক্রিয়া-রূপও হবে সে-পুরুষ(শ্রেণী)র'। সূত্রটির সারকথা যতো সহজসরল, বাস্তবে সূত্রটি ততো সহজসরল নয়। কেননা ব্যাকরণে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে হবে কেমন কর্তার জন্যে কেমন, বা কি ভাষাবস্তু ব্যবহৃত হবে সংগতি-জ্ঞাপনের জন্যে। সূত্রটি নানাভাবে রচনা করা যায় : (ক) রূপান্তর-সূত্রের মধ্যেই দেখিয়ে দেয়া যায় কোন পুরুষশ্রেণী)র কর্তার সাথে সংগতির জন্যে কি ভাষাবস্তু ব্যবহৃত হবে; (খ) সূত্রে শুধু সংগতির সারকথা নির্দেশ করা যায়, এবং সহায়ক একটি সূত্রে সংগতিজ্ঞাপক বস্তুরাশির বিরাট তালিকা দেয়া যায়। দ্বিতীয় প্রণালি অনুসারে সূত্রটি হবে নিম্নরূপ :

(৭২) কর্তা-ক্রিয়া(রূপ) সংগতিসূত্র (আবশ্যিক)

সাংগঠনিক বর্ণনা : [৪ — সংগতি — ৫]

সাংগঠনিক রূপান্তর :

[ক] সংগতি ==> { সং-প্রপু#প্রপু—
সং-দ্বিপু-সম্মান#দ্বিপু-সম্মান —
সং-দ্বিপু-সাধারণ#দ্বিপু-সাধারণ—
সং-দ্বিপু-হীন/ # দ্বিপু-হীন—
স-তৃপু-সম্মান/ # তৃপু-সম্মান—
সং-তৃপু-সাধারণ/ # তৃপু-সাধারণ }

[খ] সং-প্রপু ==> ই

সং-দ্বিপু-সম্মান ==> { এন
সং-তৃপু-সম্মান }

সং-দ্বিপু-সাধারণ ==> ও

সং-দ্বিপু-হীন ==> ইস

সং-তৃপু-সাধারণ ==> এ

সংগতিসূত্রটিকে ভাগ করা হয়েছে দু ভাগে : (৭২ক) সূত্রটি নির্দেশ করছে যে কর্তা যদি হয় প্রথম পুরুষের, তবে সংগতিও হবে প্রথম পুরুষের; কর্তা যদি হয় দ্বিতীয় পুরুষ-সম্মানাত্মক শ্রেণীর, তবে সংগতিও হবে দ্বিতীয় পুরুষ-সম্মানাত্মক শ্রেণীর ইত্যাদি। (৭২খ) অংশটি নির্দেশ করছে সংগতির জন্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ভাষাবস্তু। প্রথম পুরুষ কর্তার সাথে সংগতির জন্যে দরকার 'ই'; দ্বিতীয় পুরুষ-সম্মানাত্মক ও তৃতীয় পুরুষ-সম্মানাত্মক কর্তার সাথে সংগতির জন্যে দরকার অভিন্ন ভাষাবস্তু—'এন' ইত্যাদি। (৭২ক, খ)-সূত্র (৭১)-সংগঠনের ওপর প্রয়োগ করলে পাওয়া যাবে (৭৩)-পদচিত্র :

(৭৩)

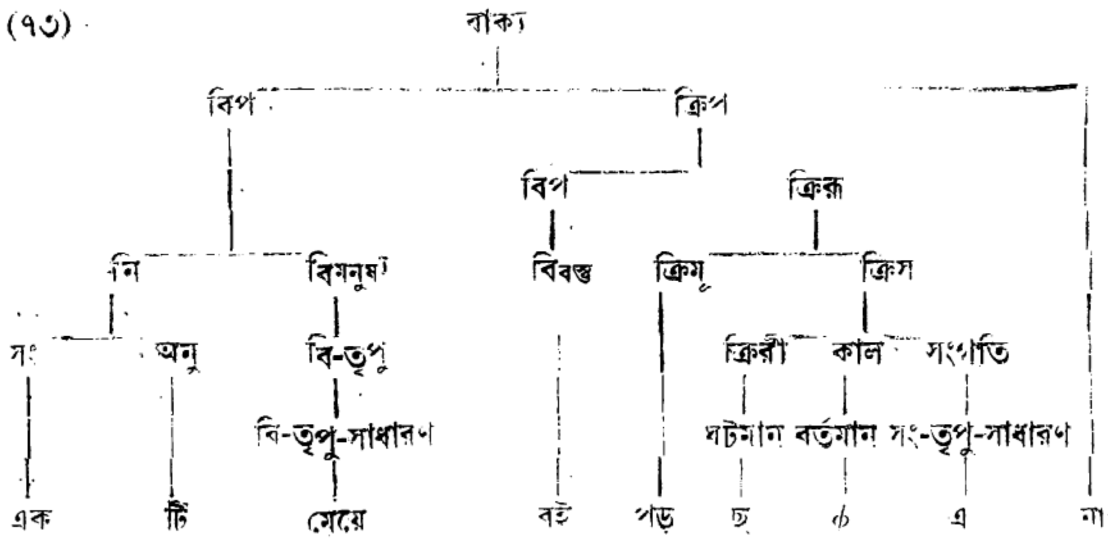

(৭৩)-পদচিত্রটি দুটি রূপান্তর 'নিষেধ' ও 'সংগতি'—প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট। রূপান্তর সূত্রের সাহায্যে এটিতে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে দুটি ভাষাবস্তু—'এ' ও 'না'। (৭৩)-এর অন্তর্গ্রন্থির ওপর রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে 'একটি মেয়ে বই পড়ছে না' বাক্যটি, অর্থাৎ (৬৫খ)-বাক্যটি।

(৬৬)-ব্যাকরণটি সৃষ্টি করবে (৬৫)-উপাত্তের মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন; এবং এটির ওপর শুধু কর্তা-ক্রিয়া সংগতিসূত্র, (৭২), এবং রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে (৬৫ক)। আভ্যন্তর সংগঠন (৬৭)-র ওপর নির্দিষ্টায়ন সূত্র (৬৮), এবং রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে (৬৫ক´)। আভ্যন্তর সংগঠন (৬৭)-র ওপর নিষেধ-রূপান্তর (৭০) প্রয়োগ ক'রে, এবং রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে (৬৫খ)। (৬৭)-র ওপর (৬৮) ও (৭০) ও (৭২) (এবং রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র) প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে (৬৫খ´)। (৬৭)-পদচিত্রে সংখ্যা-রূপে নির্বাচন করা হয়েছে 'এক'; কিন্তু এর বদলে 'দু'-কেও নির্বাচন করা যায়। (৬৬)-র সূত্র প্রয়োগের সময় সংখ্যা হিশেবে 'দু'-কে গ্রহণ ক'রে যে-পদচিত্র পাওয়া যাবে, তার ওপর প্রয়োজনীয় রূপান্তর প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে (৬৫ গ, গ´, ঘ, ঘ´) বাক্যসমূহ।

১'৫'৩ স্বায়ত্তশাসিত বাক্যতত্ত্ব : বাক্য ও অর্থ

চমস্কি পৌনপুনিকভাবে ঘোষণা ও দাবি করেছেন যে 'বাক্যতত্ত্ব স্বায়ত্তশাসিত' (দ্র চমস্কি (১৯৫৭, ১৩-১৭, ৯২-১০৫)), এবং তিনি বাক্যসৃষ্টি ও বর্ণনায় অর্থের ভূমিকাকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর এ-দাবি ও ঘোষণা প্রচণ্ডভাবে প্রকাশিত হয়েছে "সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচারস" (১৯৫৭) গ্রন্থে। এ-গ্রন্থে তিনি যে-ব্যাকরণকাঠামো পেশ করেন, তাতে আছে মাত্র দুটি কক্ষ—বাক্য-কক্ষ ও রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ (দ্র Ф ১.৫.১; ১.৫.১.৩); তাতে কোনো আর্থ কক্ষ নেই। চমস্কির চিন্তায় বাক্য ভাষার কেন্দ্রবস্তু; এবং তিনি বাক্যের সৃষ্টিপ্রক্রিয়াসূত্র রচনা করতে চেয়েছেন বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিহার ক'রে। তাঁর তত্ত্বে বাক্যগঠনপ্রক্রিয়া অর্থ-স্বাধীন। রূপান্তর ব্যাকরণের দ্বিতীয় পর্যায়ে রূপান্তর ব্যাকরণে যুক্ত হয় একটি আর্থকক্ষ, কিন্তু তাতেও অর্থ অধিকার ক'রে থাকে অপ্রধান ভূমিকা (দ্র ক্যাটজ ও ফোদোর (১৯৬৩), ক্যাটজ ও পোস্টাল (১৯৬৪), চমস্কি (১৯৬৫), ভাইনরেইস (১৯৬৬))। চমস্কিকে বলা যায় 'সাংগঠনিক রূপান্তর-বাদী'; তাঁর অর্থচিন্তার সাথে সাংগঠনিকদের অর্থচিন্তার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। সাংগঠনিকেরা অর্থনিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন ভাষা-উপাত্ত, চমস্কিও অর্থমুক্ত-ভাবে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন বাক্য, অর্থাৎ উভয় ব্যাকরণই 'ফর্মাল', বা 'রূপগত'। এ-বিষয়ে তিনি সাংগঠনিকদের সাথে তাঁর আদিসম্পর্ক কোনোদিন ছিন্ন করতে পারেন নি। অর্থ ও বাক্যের যে-হিংস্র দাঙ্গা চ'লে আসছিলো বহু দিন ধ'রে, তিনি তা থামাতে পারেন নি। যেহেতু তিনি ব্যাকরণকে মনে করেন অর্থ-স্বাধীন; তাই তাঁর ধারার রূপান্তর ব্যাকরণকে বলা হয় 'স্বায়ত্তশাসিত বাক্যতত্ত্ব' 'অ্যাটনম্যাস সিনট্যাক্স'। অর্থকে তিনি সংশ্লিষ্ট মনে করেছেন ভাষাব্যবহারের সাথে, এবং ব্যাকরণের দায়িত্ব ব'লে স্থির করেছেন ভাষার সমস্ত ব্যাকরণসম্মত বাক্যসৃষ্টি। ভাষার আধার-আধেয়র বৈপরীত্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন চমস্কি, এবং দাবি করেছেন যে আধারের বিশ্লেষণ চলা উচিত আধেয়রিক্তভাবে। "সিস্ট্রা"-এ তিনি যে-ব্যাকরণকাঠামো গঠন করেছেন, সে-সম্পর্কে চমস্কির মত হচ্ছে যে ওই ব্যাকরণকাঠামো 'সম্পূর্ণভাবে রূপগত, এবং অর্থ-বিরহিত' (দ্র চমস্কি (১৯৫৭, ৯৩))। "সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচারস" (১৯৫৭), ও অন্যান্য রচনায় তিনি শুদ্ধ বাক্য সৃষ্টি করাকে ব্যাকরণের দায়িত্ব ব'লে মনে করেন। চমস্কি-উত্তর রূপান্তরবাদীরা অর্থরিক্তভাবে বাক্যসৃষ্টিকে ভ্রান্ত ব'লে মনে করেন (দ্র ফিলমোর (১৯৬৮), ল্যাকফ (১৯৬৫, ১৯৭১), ম্যাককলি (১৯৬৮, ১৯৭০,); Ф ১.৭))। ভাষার 'রূপ' বা 'আধার'কে যদিও আমি অর্থনিরপেক্ষভাবে বর্ণনার পক্ষপাতী নই, এবং মনে করি যে অর্থই ভাষার প্রাণবস্তু, এবং বাক্য ও অর্থ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ; তবুও ভাষার রূপ, বা 'আধার'-কে যে অর্থনিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করা যায়, তা নিচের অনুচ্ছেদসমূহে দেখানো হলো।

প্রচলিত ব্যাকরণে বহুলব্যবহৃত দুটি ভাষিক বোধ হচ্ছে 'বিশেষ্য' ও 'কর্তা'। প্রচলিত ব্যাকরণে 'বিশেষ্য'-এর সংজ্ঞা দেয়া হয় এ-ভাবে : 'কোনো ব্যক্তি, বস্তু, বা স্থানের নামকে বিশেষ্য বলে।' 'বিশেষ্য' একটি বাক্যিক ক্যাটেগরি, কিন্তু প্রচলিত ব্যাকরণে তার দেয়া হয় আর্থ সংজ্ঞা। কিন্তু এ-আর্থ ও মুক্ত সংজ্ঞার সাহায্যে কোনো একটি শব্দ বিশেষ্য কি-না, তা সুষ্ঠুভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। যদি বিশেষ্যের সংজ্ঞায় উল্লেখিত 'বস্তু' বলতে আমরা 'বাস্তব পদার্থ' বুঝি, তবে বিশেষ্যরূপে পরি-গণিত বহু বিশেষ্যকে বিশেষ্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। যেমন : 'প্রেম', 'স্নেহ', 'স্বপ্ন', 'সরলতা' প্রভৃতি বিশেষ্য অ-পদার্থ। পুনরায়, 'বস্তু'র পরিধিকে যদি এমনভাবে বাড়িয়ে দিই যে বিশ্বের সমস্ত কিছুকেই 'বস্তু' বলা যায়, তবে সংজ্ঞাটি হ'য়ে ওঠে বৃত্তাকার ও আসার। যেহেতু 'বস্তু' কি, তা নির্ণয়ের কোনো স্বাধীন মাণদণ্ড নেই, তাই বিশেষ একটি শব্দ কোনো বস্তু নির্দেশ করছে কি-না, তা বোঝার জন্যে আমাদের

আগেই জেনে নিতে হয় ওই বিশেষ শব্দটি বিশেষ্য কি-না। এমন কোনো আর্থ বৈশিষ্ট্য নেই, যা সমস্ত বিশেষ্যে, বা অন্যান্য পদে, উপস্থিত। বিশেষ্য কোনো আর্থ ক্যাটেগরি নয়। তাই বিশেষ্য-নির্ণয়ের জন্যে শরণ নিতে হয় সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের একটি বোধের, যার নাম 'বণ্টন'। শুদ্ধ বাক্যের যে-সমস্ত 'প্রতিবেশ'-এ কোনো একটি ভাষাবস্তু ব্যবহৃত হ'তে পারে, সে-সমস্ত প্রতিবেশের সমষ্টি হচ্ছে ওই ভাষাবস্তুটির 'বণ্টন'। 'বণ্টন' নির্ণয়ের জন্যে সাহায্য নেয়া হয় 'প্রতিকল্পন' প্রণালির। নিচের উদাহরণটি লক্ষণীয় :

(৭৪) একটি {ছেলে মেয়ে, / কুকুর, বেড়াল, / ঘোড়া, যুবতী,} তখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো।

(৭৪)-বাক্যে দেখা যায় যে নির্দেশক 'একটি'-র পরে 'ছেলে, মেয়ে, কুকুর, বেড়াল, ঘোড়া, যুবতী' প্রভৃতি ভাষাবস্তু ব্যবহৃত হ'তে পারে; কিন্তু (৭৪)-বাক্যে 'একটি'-র পরে—অর্থাৎ 'একটি— 'প্রতিবেশে'—চমৎকার', 'ভয়াবহভাবে', 'অত্যন্ত' প্রভৃতি ভাষা-বস্তু বসতে পারে না। তাই সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায় যে বাঙলায় এমন একটি ভাষা বস্তু-শ্রেণী রয়েছে, যা 'একটি'-র পরে ব্যবহৃত হ'তে পারে; এবং ওই ভাষাবস্তু-শ্রেণীর নাম দেয়া যায় 'বিশেষ্য'। বণ্টনিক প্রণালিতে 'বিশেষ্য', 'বিশেষণ', 'ক্রিয়া' প্রভৃতি পদনির্ণয়ের তাৎপর্য হচ্ছে যে ব্যাকরণের ভাষাবস্তুরাশির ভূমিকা বিচার না ক'রে ওই ভাষাবস্তুসমূহের পদনির্ণয় অসম্ভব। 'বিশেষ্য'-এর সংজ্ঞা দেয়া যায় এ ভাবে : 'যে-সমস্ত ভাষাবস্তু 'একটি'-র পরে ব্যবহৃত হ'তে পারে, তাই বিশেষ্য।' এমন সংজ্ঞায়ও বিপত্তি দেখা দিতে পারে। যেমন : আমরা বলতে পারি 'আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি'; তাই 'স্বপ্ন'কে' গ্রহণ করতে হয় বিশেষ্যরূপে; কিন্তু আমরা বলতে পারি না '*একটি স্বপ্ন তখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো'। আমরা বলতে পারি' / ক / একটি 'ধ্বনিমূল'; তাই 'ধ্বনিমূল' শব্দটিকে গ্রহণ করতে হয় বিশেষ্যরূপে; কিন্তু আমরা বলতে পারি না '*একটি ধ্বনি-মূল তখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো'। তাই বিশেষ্যরূপে গ্রহণ করতে হবে একটি ব্যাপক শ্রেণীকে, যার সদস্যসমূহকে আবার বিন্যস্ত করতে হবে, বণ্টনিক প্রণালিতে, নানা উপশ্রেণীতে। এমন শ্রেণীকরণ ও শ্রেণীনির্ণয়ে অর্থের কোনো ভূমিকা নেই।

'কর্তা'-বিষয়ক উদাহরণের সাহায্যেও দেখানো যায় যে বাক্যিক ও আর্থ বোধের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। 'বিশেষ্য', বা 'বিশেষ্যপদ' হচ্ছে 'বাক্যিক ক্যাটে-গরি', এবং 'কর্তা' হচ্ছে 'ভূমিকাগত ক্যাটেগরি'। একএকটি বাক্যিক ক্যাটেগরি পালন করে নানাবিধ ভূমিকাগত ক্যাটেগরির দায়িত্ব। (৭৫)-এর উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৭৫) ক হাসান হাসিনাকে ভালোবাসে।

খ হাসান হাসিনাকে খুন করেছে।

ওপরের বাক্য দুটিতে 'হাসান', ও 'হাসিনা'-কে, বিশেষ রকম বণ্টন অনুসারে, শনাক্ত করতে হয় 'বিশেষ্যপদ'রূপে; কিন্তু বাক্য দুটিতে তাদের ভূমিকাগত পরিচয় অন্যরকম। উভয় বাক্যেই 'হাসান' 'কর্তা', এবং 'হাসিনা' 'কর্ম'। প্রচলিত বাঙলা ব্যাকরণে 'কর্তা'র সংজ্ঞা দেয়া হয় এ-ভাবে : 'বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ

ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহাই ক্রিয়ার কর্তা (দ্র চৌধুরী ও অন্যান্য (১৯৭২, ২৮৫))। 'কর্তা'-র এ-সংজ্ঞা আর্থ, এবং বিভ্রান্তিকর। অনেক বাক্যে কর্তা যদিও ক্রিয়া সম্পন্ন করে, কিন্তু প্রচুর বাক্যে কর্তা কোনো ক্রিয়া সম্পন্ন করে না। (৭৫ক)-বাক্যের কর্তা 'হাসান' কোনো ক্রিয়া সম্পাদন করে না ; কিন্তু (৭৫খ)-বাক্যের কর্তা 'হাসান' সত্যই ক্রিয়া সম্পন্ন করে। বাঙলার কর্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগত ক্যাটেগরি, কিন্তু আর্থসংজ্ঞার সাহায্যে কর্তানির্ণয় অসম্ভব। বাঙলা বাক্যের কর্তা, সম্পূর্ণরূপে, আর্থ নয়, বাক্যিক। বাঙলা ভাষায় লক্ষ্য করা যায় যে বাক্যের ক্রিয়ারূপ বাক্যের বিশেষ একটি বিশেষ্যপদের সাথে পুরুষ(শ্রেণী)তে সংগতি রক্ষা করে (দ্র Φ ১.৪.১)। যে-বিশেষ্যপদটির সাথে ক্রিয়ারূপ পুরুষ(শ্রেণী)তে সংগতি রক্ষা করে, সে-বিশেষ্যপদটিই বাক্যের কর্তা। কর্তার এ-সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে অর্থবিরহিত। প্রশ্ন উঠতে পারে : বাক্যের কোন বিশেষ্যপদের সাথে ক্রিয়ারূপ সংগতি রক্ষা করবে? এ-প্রশ্নেরও উত্তর দেয়া সম্ভব (দ্র আজাদ (১৯৮০))।

বাক্য ও অর্থের দাঙ্গা ভাষাবিজ্ঞানের এক বড়ো সমস্যা। সাংগঠনিকেরা ভাষাবর্ণনা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন অর্থকে ; এবং চমস্কিও অর্থরহিতরূপে বাক্যসৃষ্টির পক্ষপাতী। ফোদোর ও ক্যাটজ (দ্র ফোদোর ও ক্যাটজ (১৯৬৩)) একটি শ্লোগান চালু করেছিলেন যে 'ভাষাবর্ণনা থেকে ব্যাকরণ বিয়োগ করলে যা থাকে, তাই অর্থতত্ত্ব'। রূপান্তর ব্যাকরণের বিবর্তনের সাথে তরুণ রূপান্তরবাদীদের অভিনিবেশ আকৃষ্ট হয় অর্থতত্ত্বের দিকে। ফিলমোর প্রস্তাব করেন আর্থ 'কারক ব্যাকরণ' (দ্র ফিলমোর (১৯৬৬খ, ১৯৬৮ক), আজাদ (১৯৭৬)), এবং আরো পরে 'সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদী'রা দাবি করেন যে অর্থই ভাষার মূলবস্তু (দ্র ল্যাকফ (১৯৬৫, ১৯৭১), ম্যাককলি (১৯৬৮, ১৯৭০) ; Φ ১.৭.))। ফলে ভাঙন ধরে রূপান্তরবাদীশিবিরে। চমস্কি ও তাঁর অনুসারীরা অর্থনিরপেক্ষ সীমিত শক্তিসম্পন্ন রূপান্তর ও 'বাক্যিক গভীর তল' নিয়ে বাক্যসৃষ্টি করতে থাকেন, এবং উপাধি পান 'স্বায়ত্তশাসিত বাক্যতত্ত্ববাদী,' এবং 'শব্দবাদী' (দ্র চমস্কি (১৯৭০খ), জ্যাকেনডফ (১৯৭২))। যাঁরা অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে, 'বাক্যিক গভীর তল' পরিহার ক'রে, শক্তিশালী রূপান্তর সূত্রের সাহায্যে বাক্যসৃষ্টির সাধনা করতে থাকেন, তাঁরা অভিধা পান 'সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদী', এবং 'রূপান্তরবাদী'। চমস্কি রূপান্তর ব্যাকরণের স্রষ্টা, এবং সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আদি-বিপ্লবী, কিন্তু তিনি তাঁর পরিণততম রচনায়ও লালন করেন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রভাব (অর্থতত্ত্ব বিষয়ে)। রূপান্তর ব্যাকরণের তীব্র অগ্রগতির সাথে রূপান্তর ব্যাকরণের প্রথম ও প্রধান তাত্ত্বিকই হ'য়ে ওঠেন 'সংশোধনবাদী' ; এবং অতিতীব্র তত্ত্ব নিয়ে সামনের দিকে এগোতে থাকেন তরুণ বিপ্লবীরা।

১. ৬ রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ [[দুই]]

১. ৬. ১ রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ [[দুই]] -এর উদ্ভব

১৯৫৭-উত্তরকালে রূপান্তর ব্যাকরণের অতি দ্রুত সংশোধন, সংস্কার ও সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। এ-তে প্রধান ভূমিকা নেন চমস্কি নিজে ; এবং তাঁর সাথে যুক্ত হন আরো কয়েকজন প্রতিভাবান ভাষাবিজ্ঞানী, যাঁরা ''সিন্ট্যা''-কাঠামোর ব্যাকরণ উন্নয়নে পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। রূপান্তর ব্যাকরণ [[এক]]-এর কাঠামোয় রচিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে রবার্ট বি লিজ-এর ''দি গ্রামার অফ ইংলিশ নোমিনালাইজেশনস'' (১৯৬০)। ১৯৬৩-১৯৬৪ বছর দুটি রূপান্তর ব্যাকরণের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয় ক্যাটজ ও ফোদোর-এর বিখ্যাত নিবন্ধ

"দি স্ট্রাকচার অফ এ সিম্যানটিক থিওরি" (১৯৬৩); এবং ১৯৬৪ সালে বেরোয় ক্যাটজ ও পোস্টাল-এর গ্রন্থ "এ্যান ইণ্টেগ্র্যাটেড থিওরি অফ লিংগুইস্টিক ডেসক্রিপশনস" (১৯৬৪), যার ওপর ভিত্তি ক'রে গঠিত হয় 'রূপান্তর ব্যাকরণ [[দুই]]'-এর আর্থকক্ষ। ক্যাটজ ও ফোদোর-এর নিবন্ধ (১৯৬৩) রচিত হয় "সিন্ট্যা"-কাঠামোর ব্যাকরণকে আর্থকক্ষ দিয়ে সাহায্য করার জন্যে। এ-নিবন্ধের একটি অংশের নাম 'ভাষিক বর্ণনা থেকে ব্যাকরণ বাদ দিলে যা থাকে, তাই অর্থতত্ত্ব'; অর্থাৎ ব্যাকরণ＝বাক্যতত্ত্ব＋ধ্বনিতত্ত্ব। তাঁদের নিবন্ধে দুটি স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় যে (ক) অর্থতত্ত্ব ভাষিক বর্ণনার অপরিহার্য অঙ্গ, এবং (খ) বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব, ব্যাকরণের দু'অংশ হ'লেও, পরস্পরপৃথক, ও স্বায়ত্তশাসিত। ক্যাটজ ও পোস্টাল-এর গ্রন্থে (দ্র ক্যাটজ ও পোস্টাল (১৯৬৪)) সম্প্রসারিত করা হয় ক্যাটজ ও ফোদোর-এর (১৯৬৩) বক্তব্য, এবং একটি সুষ্ঠু, যোগ্য ব্যাকরণকাঠামো গঠনের জন্যে পেশ করা হয় মূল্যবান বিশ্লেষণ ও প্রস্তাব। এ গ্রন্থের যে-সব প্রস্তাব চমস্কি তাঁর "আস্পেকটস অফ দি থিওরি অফ সিনট্যাকস" (১৯৬৫) গ্রন্থে গ্রহণ করেন, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে

[ক] সমস্ত ঐচ্ছিক এক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর পরিত্যাগ করা হয় (অর্থাৎ 'প্রশ্ন-রূপান্তর', 'নিষেধ-রূপান্তর' 'আদেশ-রূপান্তর', প্রয়োগের "সিন্ট্যা"-সম্মত রীতি পরিত্যাগ করা হয়)। এ-সমস্ত রূপান্তর প্রয়োগের জন্যে বাক্যের 'গভীর তল'-এ স্থাপন করা হয় 'প্রশ্ন', 'নিষেধ', 'আদেশ' প্রভৃতি বিমূর্ত বস্তু, এবং এ-সমস্ত রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ নির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে উল্লিখিত বিমূর্ত বস্তুরাশির বাক্যের গভীর তলে উপস্থিতির ওপর। এ-বিমূর্ত বস্তুরাশি অর্থবহ: যেমন—কোনো বাক্যের গভীর তলে 'প্রশ্ন' বিমূর্ত বস্তুটি উপস্থিত থাকলে বুঝতে হবে যে বাক্যটি প্রশ্নবোধক; তাই ওই গভীর সংগঠনটির ওপর প্রয়োগ করা হবে 'প্রশ্ন-রূপান্তর' সূত্র। এ-গ্রন্থের প্রস্তাব-'রূপান্তরসূত্র অর্থসংরক্ষক' বা 'রূপান্তরসূত্র বাক্যার্থ পরিবর্তন করবে না'—মৌল নীতিরূপে গৃহীত হয় "আস্পেকটস"-কাঠামোর ব্যাকরণে, বা 'রূপান্তর ব্যাকরণ [[দুই]]'-এ।

[খ] তাঁরা যে অর্থতত্ত্ব পেশ করেন, তাকে ব্যাকরণের অংশ করার জন্যে তাঁরা প্রস্তাব করেন এক নতুন ব্যাকরণকাঠামো, যা পূর্ণ রূপ পায় চমস্কির "আস্পেকটস" (১৯৬৫) গ্রন্থে। এ-ব্যাকরণকাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ব্যাকরণের সমস্ত রূপান্তরসূত্র অর্থসংরক্ষক। সুতরাং এতে বাক্যের সমগ্র অর্থ নির্ণীত হয় বাক্যের গভীর তলে।

১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয় চমস্কির "আস্পেকটস অফ দি থিওরি অফ সিনট্যাকস"; সংক্ষেপে "আস্পেকটস"। এ-গ্রন্থের প্রস্তাবিত ব্যাকরণকাঠামো পরিচিত "স্ট্যানডার্ড থিওরি' নামে (দ্র চমস্কি (১৯৭২, ৬৬))। "সিন্ট্যা", ও "আস্পেকটস" ব্যাকরণ-কাঠামোর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান: উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যই বেশি, এবং একমাত্র সাদৃশ্য হচ্ছে উভয় কাঠামোই রূপান্তরবাদী। "আস্পেকটস"-ব্যাকরণকাঠামো অনেক বেশি শক্তিসম্পন্ন, এবং ভাষাসৃষ্টির জন্যে অনেক বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন। "আস্পেকটস"-এ গৃহীত প্রধান পরিবর্তনসমূহ:

[ক] রূপান্তরসূত্র বাক্যার্থ সংরক্ষক।

[খ] ভাষায় কোনো স্বাধীন মূল্য নেই ব'লে 'মৌল বাক্য' ধারণাকে পরিত্যাগ করা হয় [ϕ ১. ৫. ১. ১.]।

[গ] ব্যাকরণের 'পৌনপুনিক শক্তি'-র অধিকার অর্পিত হয় পদসাংগঠনিক সূত্রের ওপর (অর্থাৎ ক→ক জাতীয় সূত্র গ্রহণ করা হয় (দ্র Φ ১'৩.২.))।

[ঘ] যেহেতু পদসাংগঠনিক সূত্রের ওপর অর্পিত হয় 'পৌনপুনিক শক্তি', তাই ব্যাকরণ থেকে পরিত্যাগ করা হয় একাধিক-আভ্যন্তর সাংগঠনিকসূত্র (দ্র Φ ১.৫.১.২)। 'চক্রাবর্তন নীতি' অনুসারে আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর প্রয়োগ করা হয় রূপান্তরসূত্র (দ্র Φ ১.৬.১১.২)।

চমস্কির ''আস্পেকটস''-ব্যাকরণকাঠামো ইংরেজি, ও অন্যান্য ভাষাবর্ণনায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ক্রমশ এ-কাঠামোর ব্যাকরণের বিরুদ্ধে দেখা দিতে থাকে তীব্র আপত্তি, এবং চমস্কি সামান্য পরিমাণে সংস্কার করেন তাঁর 'স্ট্যানডার্ড থিওরি'। চমস্কির 'স্ট্যানডার্ড থিওরি' মর্মমূলে বহন করেছে আত্মবিনাশের বীজ, আর এ-বীজ সরবরাহ করেছিলেন ক্যাটজ ও পোস্টাল (১৯৬৪)। তাঁদের প্রস্তাবিত, এবং চমস্কি কর্তৃক গৃহীত নীতি যে বাক্যের সমগ্র অর্থ নির্ণীত হবে বাক্যের গভীর তলে'— এ-ব্যাবরণকাঠামোকে ক'রে তুলেছে আত্মবিনাশী। যদি বাক্যের সমগ্র অর্থ গভীর তলে নির্ণয় করতে হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রে দরকার হয় অত্যন্ত গভীর ও বিমূর্ত তল, যা চমস্কি কল্পনা করেন নি, এবং কখনো মেনে নেননি। এমন সুগভীর ও বিমূর্ত তল হ'য়ে ওঠে বাক্যের অর্থের বিমূর্ত ও অ-বাক্যিক উপস্থাপন। বাক্যের অর্থ চূড়ান্তরূপে গভীর তলে নির্ণয় করতে হ'লে পরিত্যাগ করতে হয় চমস্কীয় 'বাক্যিক গভীর তল', এবং গ্রহণ করতে হয় 'আর্থ গভীর তল'। 'সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদী'রা বিমূর্ত, সুগভীর, আর্থ তলের সন্ধানী। কিন্তু চমস্কি অতো গভীরে যেতে চান না, কেননা তাতে তাঁর বাক্য বিপদগ্রস্ত হয়। তীব্র চাপে চমস্কি তাঁর 'মানতত্ত্ব' সামান্য সংস্কার করেন, এবং ওই সংস্কৃত তত্ত্বের নাম দেন 'একসটেনডেড স্ট্যানডার্ড থিওরি' : 'সম্প্রসারিত মানতত্ত্ব' (দ্র চমস্কি (১৯৭২))। 'সম্প্রসারিত মানতত্ত্বে' তিনি যে-সংস্কার গ্রহণ করেন, তা সরলভাবে প্রকাশ করা যায় এ-ভাবে : 'কেবল গভীর তল নয়, বহির্তলও, অনেকাংশে, বাক্যের অর্থ নিয়ন্ত্রণ করে।' কিন্তু তাঁর 'সম্প্রসারিত মানতত্ত্ব বিশেষ সাড়া জাগায় নি। এ-তত্ত্বে তাঁর প্রধান অনুসারী জ্যাকেনডফ (দ্র জ্যাকেনডফ (১৯৭২))।

১'৬'২ রূপান্তর ব্যাকরণ [[দুই]]-এর সংগঠন

'রূপান্তর ব্যাকরণ [[দুই]]', বা ''আস্পেকটস''-কাঠামোর ব্যাকরণ ত্রিকক্ষিক : (ক) 'বাক্যিক কক্ষ' : (বাক্যস্রষ্টা সূত্রসমষ্টি ; (খ) 'আর্থকক্ষ' : সৃষ্ট বাক্যের অর্থনির্ণায়ক সূত্রসমষ্টি ; এবং (গ) 'ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ' : সৃষ্ট বাক্যের ধ্বনিরূপ-নির্ণায়ক সূত্রসমষ্টি। এ-ব্যাকরণকাঠামোর সরল রূপ (৭৬) (দ্র পৃষ্ঠা ১২৩)।

বাক্যিক কক্ষের সূত্ররাশি সৃষ্টি করে ভাষার সমস্ত বাক্য। এটি হচ্ছে রূপান্তর ব্যাকরণের প্রধান, এবং একমাত্র সৃষ্টিশীল, কক্ষ। আর্থকক্ষ, ও ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ সৃষ্টিশীল নয়, বাক্য-কক্ষের সৃষ্ট বাক্যের আর্থ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক ভাষ্য দেয়া এ-কক্ষ দুটির দায়িত্ব। তাই এ-কক্ষ দুটি ভাষ্যাত্মক। আর্থকক্ষের সূত্ররাশির দায়িত্ব হচ্ছে বাক্য-কক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট বাক্যের অর্থ নির্ধারণ ; আর ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষের সূত্ররাশির দায়িত্ব হচ্ছে সৃষ্ট বাক্যরাশির ধ্বনিরূপ নির্ণয়। বাক্য-কক্ষের সূত্রসমূহ প্রতিটি বাক্যের জন্যে নির্দেশ করে দুটি 'তল', বা 'সংগঠন' : এদের প্রথমটি হচ্ছে 'গভীর তল', বা 'গভীর সংগঠন', যা বহন করে বাক্যের সমগ্র অর্থ ; এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'বহির্তল', বা 'বহিঃ-

সংগঠন', যা নির্দেশ করে বাক্যের ধ্বনিরূপ। আর্থকক্ষের সূত্ররাজি প্রযুক্ত হয় বাক্যের 'গভীর তল'-এর ওপর, এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষের সূত্ররাজি প্রযুক্ত হয় বাক্যের

(৭৬)

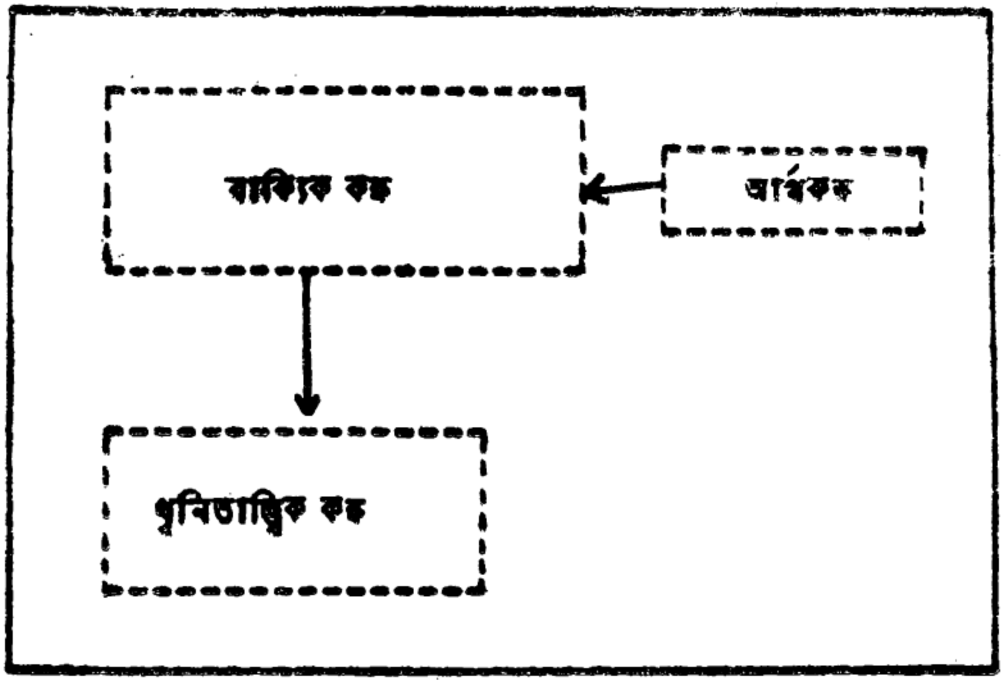

'বহির্তল'-এর ওপর। কোনো বাক্যের 'গভীর তল', ও 'বহিতল' যে অভিন্ন হবে, তা নয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'গভীর তল' ও 'বহির্তল' ভিন্ন হয়। বাক্যের গভীর তল সাধারণত হয় বেশ ব্যাপক, তা ধারণ করে বাক্যের অর্থের জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান; এবং গভীর তলের ওপর রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ করার ফলে বাক্যের সংগঠন বিচিত্রভাবে বদলে যায়। গভীর তলে প্রতিটি বাক্য অদ্ব্যর্থ; কিন্তু বহির্তলে তা দ্ব্যর্থ হ'তেও পারে।

'রূপান্তর ব্যাকরণ [[দুই]]'-এর কাঠামো তিনটি কক্ষে বিভক্ত; এবং এদের প্রধানতম কক্ষ—'বাক্য কক্ষ'—পুনরায় বিভক্ত দুটি উপকক্ষে

[ক] 'ভিত্তি উপকক্ষ'

[খ] 'রূপান্তর(মূলক) উপকক্ষ' (রূপান্তরসূত্রের সমষ্টি)

'ভিত্তি কক্ষটি', পুনরায়, বিভক্ত দু'ভাগে :

[ক] 'পদসাংগঠনিক উপকক্ষ' (গভীর তল স্রষ্টা পদসাংগঠনিক সূত্রের সমষ্টি)

[খ] 'আভিধানিক উপকক্ষ (ভাষার সমস্ত শব্দের তালিকা)

ভিত্তি কক্ষের পদসাংগঠনিক সূত্ররাশি বা 'ভিত্তিসূত্র' রাশি সৃষ্টি করে একরাশ ভিত্তিগ্রন্থি, এবং প্রতিটি ভিত্তিগ্রন্থির সাথে সংযুক্ত থাকে একটি ক'রে পদচিত্র। ভিত্তিসূত্রসমূহ প্রযুক্ত হওয়ার ফলে গঠিত হয় 'ভিত্তি পদচিত্র'; এবং ওই 'ভিত্তি পদচিত্রের' উপান্তগ্রন্থি'তে সরবরাহ করা হয় বিভিন্ন শব্দ। অভিধান থেকে যে-সমস্ত সূত্রের সাহায্যে পদচিত্রের উপান্তগ্রন্থিতে শব্দ সরবরাহ করা হয়, তাদের বলা হয় 'শাব্দসূত্র'। উপান্তগ্রন্থিতে শব্দ সরবরাহের ফলে রচিত হয় 'অন্তগ্রন্থি'। ভিত্তিসূত্র ও শাব্দসূত্র প্রয়োগের ফলে অন্তগ্রন্থিসম্বলিত যে-পদচিত্র পাওয়া যায়, তাই হচ্ছে বাক্যের 'গভীর

তল', বা 'গভীর সংগঠন'। গভীর তল নির্দেশক পদচিত্রকে বলা হয় 'ভিত্তি পদচিত্র'। বাক্যের এ-গভীর সংগঠনের ওপর প্রয়োগ করা হয় আর্থকক্ষের সূত্র, এবং নির্ণয় করা হয় বাক্যের অর্থ। এ-গভীর সংগঠন (বা তল)-এর ওপর প্রয়োগ করা হয় রূপান্তর কক্ষের রূপান্তরসূত্র; এবং বদলে যায় বাক্যের গভীর সংগঠন। গভীর তলের ওপর রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ ক'রে যে-আহরিত, বা রূপান্তরিত তল পাওয়া যায়, তাই হচ্ছে বাক্যের বহির্তল, বা বহিঃসংগঠন। বাক্যের গভীর তলকে বহির্তলে রূপান্তরিত করাই হচ্ছে রূপান্তরসূত্রাবলির কাজ। রূপান্তরসূত্রাবলি অবশ্য বাক্যের ধ্বনিরূপ নির্দেশ করে না; তা নির্দেশ করে বাক্যের 'বাক্যিক বহির্তল'—যা বাস্তবে অগ্রাহ্য। বাক্যিক বহির্তলের ওপর (রূপ)ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যায় বাক্যের ধ্বনিরূপ। 'রূপান্তর ব্যাকরণ [[দুই]]' এর বিস্তৃত সংগঠন নিম্নরূপ

(৭৭)

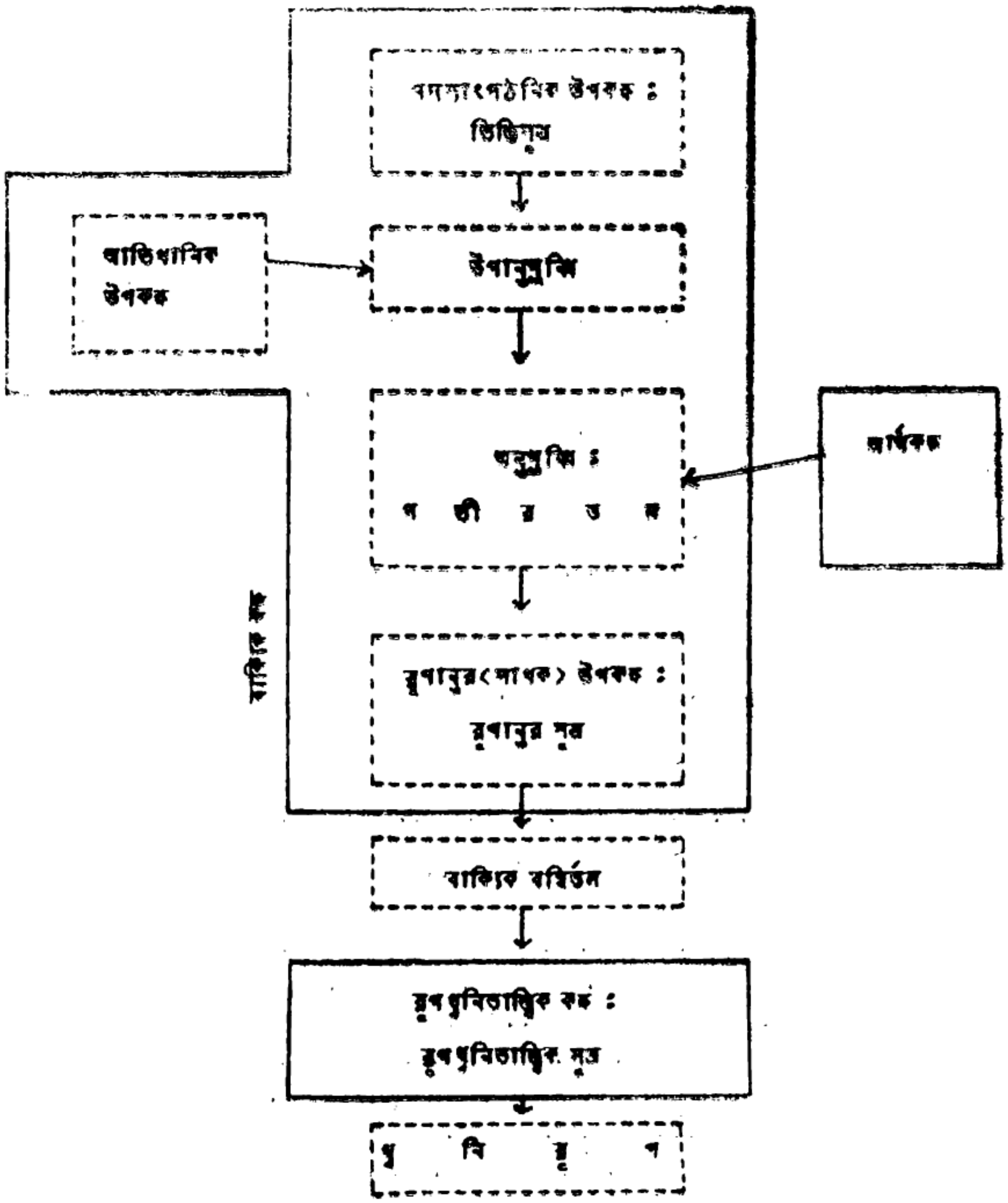

এ-ব্যাকরণও স্বায়ত্তশাসিত। এ-ব্যাকরণের সৃষ্ট বাক্যের গভীর তল স্বায়ত্তশাসিত, এবং বাক্যের গভীর তলই বাক্যের সমগ্র অর্থ, ও 'ব্যাকরণিক সম্পর্ক' নির্দেশ করে। এ-ব্যাকরণের আর্থ-ও ধ্বনি-সূত্রসমূহ ভাষ্যাত্মক। আর্থকক্ষ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে, যা নির্দেশ করে যে ধ্বনি ও অর্থের কোনো শাশ্বত ধ্রুব সম্পর্ক নেই। চমস্কীয় ''আস্পেকটস''-কাঠামোর ব্যাকরণেও বাক্য-কক্ষ প্রধান, ও সৃষ্টিশীল, কক্ষ।

১'৬'৩ ভিত্তিকক্ষ আভ্যন্তর, বা গভীর সংগঠনের (তলের) বৈশিষ্ট্য

রূপান্তর ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষ রূপান্তর ব্যাকরণের ভিত্তি : এ-কক্ষের (পদসাংগঠনিক : ভিত্তি)সূত্ররাশি গঠন করে ব্যাকরণ কর্তৃক সৃষ্টসমস্ত বাক্যের 'আভ্যন্তর সংগঠন (তল)', বা 'গভীর সংগঠন (তল)'। চমস্কি ভিত্তিকক্ষের সূত্রসমূহ কেমন হবে, তা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন ; এবং তিনি, অনেক ক্ষেত্রে, একই সমস্যা সমাধানের জন্যে পেশ করেছেন বিকল্প প্রস্তাব (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৬৩-১২৭))। ভিত্তিকক্ষের সূত্রসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ ; কেননা এ-সূত্ররাশিই গঠন করে বাক্যের গভীর তল, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ সাংগঠনিক বর্ণনা দেয় গভীর তলের ; এবং বাক্যের বিভিন্ন পদের ভূমিকা —'কর্তা', 'কর্ম' প্রভৃতি—নির্ণয় করে। পদসাংগঠনিক সূত্রের সুষ্ঠুতা ও সফলতার ওপরেই নির্ভর করে ব্যাকরণের মৌল সাফল্য। ''আস্পেকটস''-কাঠামোর ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষের স্বরূপ, বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনার জন্যে একটি উদাহরণ নেয়া যাক :

(৭৮) ছেলেটি একটি মেয়েকে ভালোবাসে।

(৭৮)-বাক্যটি বেশ সহজসরল। এখন প্রশ্ন করা যাক : প্রচলিত ব্যাকরণ এ-বাক্যটি সম্পর্কে কি-কি তথ্য পরিবেশন করবে ? প্রচলিত ব্যাকরণ, বাক্যটি বর্ণনা করতে যেয়ে, সম্ভবত পরিবেশন করবে (৭৯)-র তথ্যপুঞ্জ (দ্র চমস্কি (১৯৬০, ৬৩-৬৪)) :

(৭৯) [ক] (৭৮)-এর গ্রন্থিটি একটি বাক্য ('বা') ; 'একটি মেয়েকে ভালোবাসে' হচ্ছে (একটি) 'ক্রিয়াপদ' ('ক্রিপ'), এবং এ-টি গঠিত হয়েছে একটি 'ক্রিয়ারূপ' ('ক্রিরূ') 'ভালোবাসে' ও একটি 'বিশেষ্যপদ' ('বিপ') 'একটি মেয়েকে'-র সমবায়ে। 'ছেলেটি' একটি 'বিশেষ্যপদ' ('বিপ')। বিশেষ্যপদ 'ছেলেটি' গঠিত হয়েছে 'বিশেষ্য' 'ছেলে' ও অনুসর্গ ('অনু') 'টি'-র মিলনে। 'একটি মেয়েকে' বিশেষ্যপদটিতে' 'একটি' হচ্ছে 'নির্দেশক' ('নি'), যা গঠিত হয়েছে' 'সংখ্যাশব্দ' ('সং') 'এক', ও 'অনুসর্গ' 'টি'-র মিলনে। 'মেয়েকে' অংশটি গঠিত হয়েছে বিশেষ্য ('বি') 'মেয়ে', ও 'বিভক্তি' ('বিভ') 'কে'-র মিলনে।

[খ] (৭৮)-বাক্যে বিশেষ্যপদ 'ছেলেটি' পালন করছে বাক্যের 'কর্তা'-র ভূমিকা ; অর্থাৎ এ-টি 'কর্তা' ; এবং ক্রিয়াপদ 'একটি মেয়েকে ভালোবাসে' পালন করছে 'বিধেয়'-র ভূমিকা, অর্থাৎ এ-টি 'বিধেয়'। 'একটি মেয়ে (কে)' পালন করছে ক্রিয়াপদের 'কর্ম'-এর ভূমিকা, অর্থাৎ এ-টি 'কর্ম' ; এবং ক্রিয়ারূপ 'ভালোবাসে'-র ক্রিয়ামূল ('ক্রিমূ') রূপে কাজ করছে 'ভালোবাস' ; এবং 'এ' কাজ করছে 'ক্রিয়াসহায়ক' ('ক্রিস') রূপে। 'ব্যাকরণিক সম্পর্ক' 'কর্তা-ক্রিয়া' বিদ্যমান 'ছেলেটি' ও 'ভালোবাস'-এর মধ্যে ; এবং 'ক্রিয়া-কর্ম' সম্পর্ক বিদ্যমান 'ভালোবাস' ও 'একটি মেয়ে'-র মধ্যে। অর্থাৎ ব্যাকরণ বাক্যের বিভিন্ন পদের ভূমিকাগত পরিচয় নির্দেশ করে।

[গ] 'ছেলে' ও 'মেয়ে' 'মনুষ্যবাচক বিশেষ্য' (এরা পৃথক 'বেড়াল', 'কুকুর' প্রভৃতি বিশেষ্য থেকে) ; এবং এরা 'সাধারণ বিশেষ্য' (এরা ভিন্ন 'নামবাচক বিশেষ্য' 'হাসান', 'সুচিত্রা থেকে) ; এবং ভিন্ন 'সর্বনাম' 'সে', 'তিনি' প্রভৃতি থেকে)। এরা 'সংখ্যাবাচক বিশেষ্য' (অর্থাৎ এরা ভিন্ন 'তেল', 'পানি' প্রভৃতি 'অগণনীয় বিশেষ্য' থেকে ; এবং 'সরলতা', 'প্রীতি' প্রভৃতি 'বিমূর্ত বিশেষ্য' থেকে); এরা 'প্রাণীবাচক বিশেষ্য' (অর্থাৎ এরা পৃথক 'কলম', 'কাগজ' প্রভৃতি বস্তুবাচক বিশেষ্য' থেকে) ; এবং এদের মধ্যে 'ছেলে' 'পুংলিঙ্গ', আর 'মেয়ে' 'স্ত্রীলিঙ্গ'। 'ভালোবাস' একটি 'সকর্মক ক্রিয়ামূল' (এ-টি ভিন্ন 'অকর্মক ক্রিয়ামূল' 'কাঁদ' থেকে) ; এবং এটি কর্ম ছাড়াও ব্যবহৃত হ'তে পারে (এটিপৃথক সে-সব ক্রিয়ামূল থেকে, যারা সর্বদা 'সকর্মক') ; এবং এটি, সাধারণত, 'ঘটমান ক্রিয়ারীতি' গ্রহণ করে না (এটি ভিন্ন 'পড়', 'বল' প্রভৃতি ক্রিয়ামূল থেকে)। এটি সাধারণত 'প্রাণীবাচক', বিশেষভাবে, 'মনুষ্যবাচক' কর্তা গ্রহণ করে ; এবং মনুষ্যবাচক-বস্তুবাচক-প্রাণীবাচক-বিমূর্ত সব রকম কর্ম গ্রহণ করে।

(৭৯)-তে (৭৮)-বাক্যটি সম্পর্কে তিন প্রকার তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে : (৭৯ক) পরিবেশন করছে 'বাক্যিক ক্যাটেগরি'-গত, বা 'পদগত' তথ্য ; (৭৯খ) পরিবেশন করছে 'ভূমিকাগত তথ্য', এবং (৭৯গ) পরিবেশন করছে 'উপপদগত'—পদের আন্তর-বৈশিষ্ট্যবিষয়ক—তথ্য। (৭৮)- বাক্যটি বর্ণনার জন্যে এ-সব তথ্য অপরিহার্য। চমস্কি মনে করেন যে এ-সব তথ্য অতিশয় মূল্যবান ; তাই যে-কোনো ব্যাকরণের (৭৮)-বাক্যটি সম্পর্কে (৭৯)-র তথ্য পরিবেশন করা উচিত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে : উল্লিখিত তথ্যরাজি কি-ভাবে পরিবেশন করা সম্ভব বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনায়, এবং সুস্পষ্টভাবে সূত্রের সাহায্যে কি-ভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব এ-রকম সাংগঠনিক বর্ণনা ? এ-প্রশ্নের উত্তর দেয়া হচ্ছে, চমস্কীয় রীতিতে, নিম্নের কয়েকটি পরিচ্ছেদাংশে (দ্র Ф ১·৬·৪-১·৬·৬)।

১·৬·৪ পদশ্রেণীকরণ

(৭৮)-বাক্যটি সম্পর্কে (৭৯ক)-তে পরিবেশিত তথ্যসমূহ প্রণিধানযোগ্য : (৭৯ক)-তে (৭৮)-'গ্রন্থি'টিকে ভাগ করা হয়েছে ধারাবাহিক কয়েকটি 'উপগ্রন্থি'তে ; এবং প্রত্যেকটি উপগ্রন্থিকে দেয়া হয়েছে কোনো-না-কোনো 'পদ'-গত অভিধা (যেমন : 'ক্রিপ', 'বিপ', 'ক্রিরূ' প্রভৃতি'। (৭৯ক)-তে পরিবেশন করা হয়েছে যে-সব তথ্য, তা পরিবেশন করা যায় (৭৮)-গ্রন্থিটির 'বন্ধনীকরণ'-এর সাহায্যে ; এবং সে-সব তথ্য, অবিকলভাবে, উপস্থাপিত করা যায় (৮০)-রূপী পদচিত্রে।

(৮০)

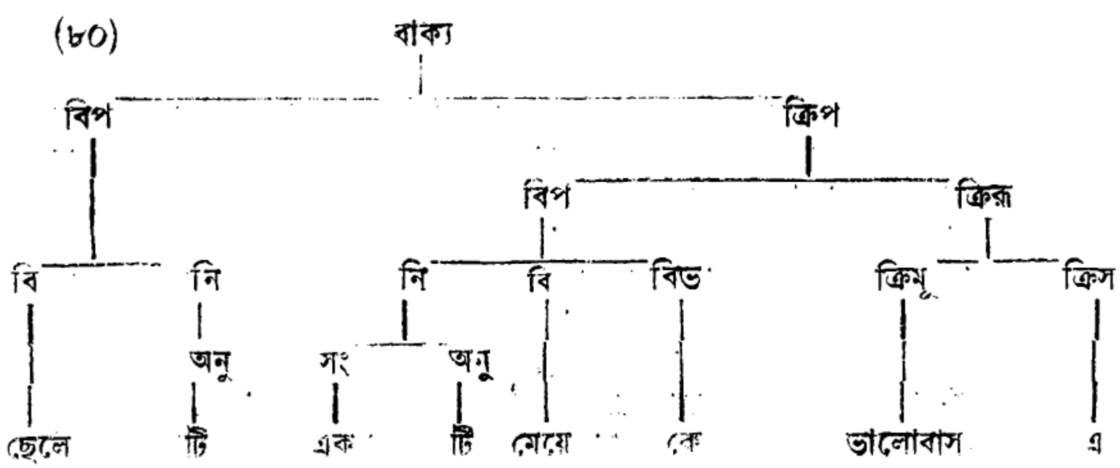

(৮০)-পদচিত্রটিকে বলা যায় (৭৮)-বাক্যের 'ভিত্তি পদচিত্র', বা মৌল পদচিত্র বা 'গভীর সংগঠন (তল)'। যে-পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করা হয়েছে (৮০), তাতে ব্যবহৃত হয় দু'ধরনের প্রতীক

[ক] 'ক্যাটেগরি প্রতীক' বা 'পদপ্রতীক' যেমন 'বাক্য', 'ক্রিপ', 'বিপ', 'বি', 'ক্রিমূ' প্রভৃতি।

[খ] 'শব্দপ্রতীক' : যেমন : 'ছেলে', 'মেয়ে', 'টি' প্রভৃতি ভাষাবস্তু নির্দেশক প্রতীক। শব্দপ্রতীকসমূহকে পুনরায় ভাগ করা যায় দু'ভাগে :

খ.১ 'শব্দ(বস্তু)' : যেমন : 'ছেলে', 'মেয়ে', 'ভালোবাস' প্রভৃতি।

খ.২ 'ব্যাকরণিক (বস্তু)' : যেমন : 'ঘটমান', 'সরল', 'ঘটিত' প্রভৃতি।

পদচিত্রে ব্যবহৃত (যেমন (৮০)-তে ব্যবহৃত) প্রতীকপুঞ্জ সম্পর্কে সরল ও স্বাভাবিক একটি প্রশ্ন জাগতে পারে মনে : প্রশ্নটি হচ্ছে—পদচিত্রে ব্যবহৃত শব্দ ও প্রতীক-সমূহের কোনো ভাষা-নিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে কি-না ; না-কি এরা বিশেষ ব্যাকরণের প্রয়োজনে তৈরি স্মৃতিসহায়ক সংকেত মাত্র ? এ-প্রশ্ন আমাদের ঠেলে দেয় ভাষার সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যের দিকে, এবং 'সর্বজনীন ব্যাকরণ'-এর দিকে (দ্র Φ ১.২.৯)।

পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে সৃষ্টি করা সম্ভব (৮০)-রূপী পদচিত্র (দ্র Φ ১.৩.২; ১.৪)। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে সৃষ্টি করে বাক্য। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ যদিও ভাষার সমস্ত বাক্য সুষ্ঠুভাবে সৃষ্টি করতে অক্ষম (দ্র Φ ১.৪.৩), তবুও পদসাংগঠনিক সূত্রের সাহায্যে বাক্যের সংগঠন সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য অত্যন্ত সহজ-সরল-স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করা যায়। তাই রূপান্তর ব্যাকরণের বাক্যিক কক্ষের 'ভিত্তি উপকক্ষ'-রূপে ব্যবহার করা হয় পদসাংগঠনিক সূত্র। অর্থাৎ রূপান্তর ব্যাকরণের 'ভিত্তিকক্ষ' হচ্ছে একগুচ্ছ পদসাংগঠনিক সূত্রের সমষ্টি। (৮০) পদচিত্রটি সৃষ্টি করার জন্যে ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষ ব্যবহার করবে (৮১)-র পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্রসমূহ :

(৮১) [ক]

বাক্য	→	বিপ + ক্রিপ
ক্রিপ	→	বিপ + ক্রিক্র নি(র্দেশক) + বি
বিপ	→	{ বি + নি(র্দেশক) }
ক্রিক্র	→	{ সংখ্যা + ক্রিস }
নি	→	{ অনু/বি— ; সংখ্যা + নি }

[খ]

বি	→	ছেলে, মেয়ে
ক্রিমূ	→	ভালোবাস
ক্রিস	→	এ

নি → টি

সংখ্যা → এক

(৮১)-র সূত্রসমূহকে দু'ভাগে সাজানো হয়েছে : (৮১ক) ও (৮১খ) ; কেননা এ-দু'ভাগের সূত্রের মধ্যে স্বাভাবিক পার্থক্য রয়েছে। (৮১ক)-র সূত্রগুলো হচ্ছে 'ক্যাটেগরিসূত্র'—'পদগত সূত্র'—, যা নির্দেশ করে বাক্যের উচ্চ ক্যাটেগরি ; (৮১খ)-র সূত্ররাশি হচ্ছে 'শাব্দসূত্র', যা বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ নির্দেশ করে। (৭৮)-বাক্যটি সম্পর্কে (৭৯ক)-তে যে-সমস্ত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে সে-সব তথ্য (৮১)-র ব্যাকরণটি পরিবেশন করেছে (৮১ক)-গোত্রের সূত্রের সাহায্যে, অর্থাৎ ক্যাটেগরি-সূত্রের সাহায্যে। তাই রূপান্তর ব্যাকরণের ভিত্তিকোণের পদসাংগঠনিক সূত্রের সাহায্যে দেয়া যায় বাক্যের ক্যাটেগরিগত বর্ণনা।

১.৬.৫ ভূমিকাগত পরিচয়

(৭৮)-বাক্যটি সম্পর্কে (৭৯খ) যে-সমস্ত তথ্য পরিবেশন করে, তা (৭৯ক)-তে পরিবেশিত তথ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। (৭৯ক)-তে পাওয়া যায় (৭৮)-বাক্যটির ক্যাটেগরিগত তথ্য, বা বর্ণনা ; (৭৯খ)-তে পাওয়া যায় বাক্যের কোন ক্যাটেগরি কোন ভূমিকা পালন করছে, তার বিবরণ। 'কর্তা' বোধটি জ্ঞাপন করে 'ব্যাকরণিক ভূমিকা' ; আর 'বিশেষ্যপদ' বোধটি জ্ঞাপন করে 'ব্যাকরণিক ক্যাটেগরি, বা পদ'। 'কর্তা' হচ্ছে একটি 'সাম্পর্কিক বোধ'। প্রচলিত ব্যাকরণ (৭৮)-বাক্যটির 'ছেলেটি' সম্পর্কে জানাবে যে এটি একটি বিশেষ্যপদ ('বিপ'), এবং এটি পালন করে বাক্যের 'কর্তা'-র 'ভূমিকা'। 'কর্তা-কর্ম-বিধেয়' প্রভৃতি হচ্ছে ভূমিকাগত বা সাম্পর্কিক বোধ, যা সুস্পষ্টভাবে পৃথক 'বিশেষ্যপদ-ক্রিয়াপদ' প্রভৃতি ক্যাটেগরিগত বোধ থেকে। বাক্যে কোনো বিশেষ্যপদ পালন করে কর্তা-ভূমিকা, কোনোটি পালন করে কর্ম-ভূমিকা ; এবং এক বা একাধিক বিশেষ্যপদ, ও একটি ক্রিয়ারূপ পালন করে বিধেয়-ভূমিকা। (৭৯খ)-তে (৭৮)-বাক্যটি সম্পর্কে পেশ করা হয়েছে যে-সব তথ্য, তা যদি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয় (৮১)-র সূত্রে, তবে (৭৮)-বাক্যের গভীর তলের পদচিত্র হবে (৮২) :

(৮২)

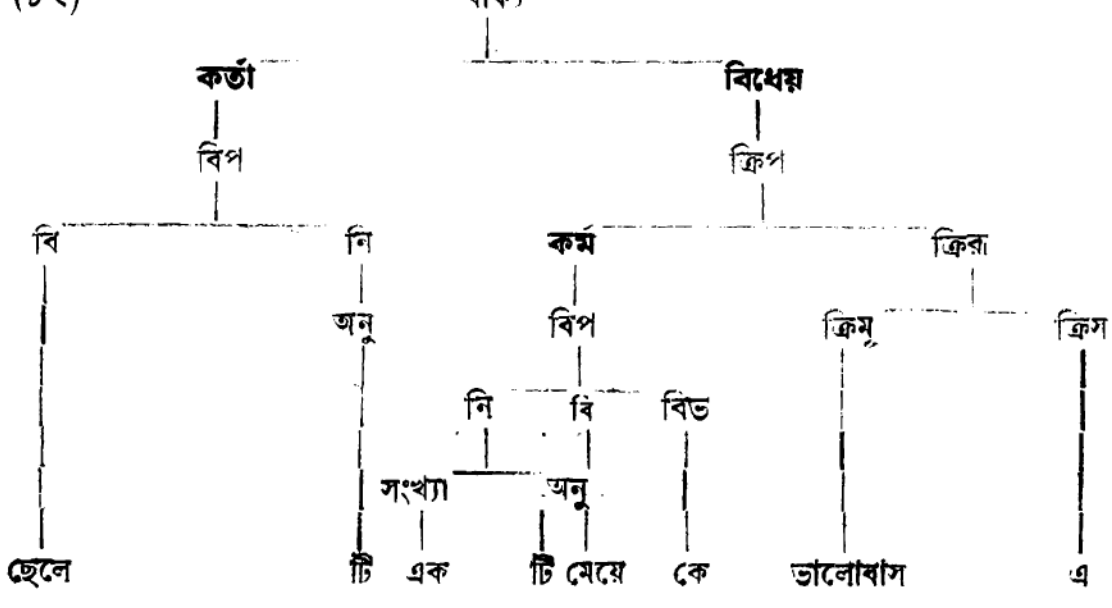

(৮২)-পদচিত্রটি বাক্যের 'কর্তা', 'বিধেয়', 'কর্ম' প্রভৃতি ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে। চমস্কির মতে (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৬৯)) উল্লিখিতরূপে পদচিত্রে বাক্যের ভূমিকাগত পরিচয় দেখানো ভুল বিশ্লেষণের উদাহরণ। কেননা এতে জট পাকিয়ে যায় বাক্যের ক্যাটেগরিগত বোধ এবং ভূমিকাগত বোধের মধ্যে : এতে 'কর্তা', 'কর্ম', 'বিশেষ্যপদ', 'ক্রিয়াপদ' প্রভৃতিকে মনে হয় এক-রকমের ক্যাটেগরি; এবং এর ফলে বাক্যের বিভিন্ন পদের ভূমিকাগত পরিচয় স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে না। অন্যদিকে এ-প্রণালিতে প্রশ্রয় পায় বাহুল্য। 'কর্তা', 'বিধেয়', 'কর্ম' বোধসমূহ যেহেতু সাম্পর্কিক, বা ভূমিকাগত বোধ, তাই এসব (৮০)-পদচিত্রেই প্রচছন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাই এ-সব বোধকে পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে নির্দেশ করা, এবং পদচিত্রে উপস্থিত করা একান্ত অপ্রয়োজনীয়। বিভিন্ন পদের ভূমিকাগত পরিচয় বাক্যের গভীর সংগঠনের পদচিত্রেই সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। চমস্কি বাক্যের বিভিন্ন পদের ভূমিকা পদচিত্রে উপস্থিত করতে চান না, কিন্তু তিনি তা নির্দেশ করতে চান পদচিত্রের বিশেষ ব্যাখ্যার সাহায্যে ((দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৭০-৭১)) । তাঁর মতে, বাক্যের গভীর তলীয় কর্তা হচেছ সে-বিশেষ্যপদটি, যে-টির ওপর ব্যাকরণের আদি-প্রতীক 'বাক্য' প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করে ; এবং কর্ম হচেছ সে-বিশেষ্যপদটি, যে-টির ওপর প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করে 'ক্রিয়াপদ'। যেমন : (৮০)-পদচিত্রে 'বাক্য' প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করছে 'ছেলেটি'—বিশেষ্যপদের ওপর ; তাই 'ছেলেটি' হচেছ বাক্যের কর্তা ; এবং 'ক্রিপ' প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করছে 'একটি মেয়ে (কে)'--বিশেষ্যপদের ওপর, তাই এ-বিশেষ্যপদটি হচেছ কর্ম। আধিপত্যনীতি-অনুসারে চমস্কি (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৭১)) বিভিন্ন ভূমিকার সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপে :

(৮৩)	]ক]	(বাক্যের)	কর্তা	[বিপ, বাক্য]
	[খ]	(বাক্যের)	বিধেয়	[ক্রিপ, বাক্য]
	[গ]	(ক্রিপ-র)	মুখ্যকর্ম	[বিপ, ক্রিপ]
	[ঘ]	(ক্রিপ-র)	মুখ্যক্রিয়া	[ক্রিম, ক্রিপ]

(৮৩ক) নির্দেশ করছে যে 'বাক্য'-এর প্রত্যক্ষ অধীন 'বিপ' হচেছ বাক্যের কর্তা, (৮৩খ) নির্দেশ করছে যে 'বাক্য'-এর প্রত্যক্ষ অধীন 'ক্রিপ' হচেছ বাক্যের বিধেয়, (৮৩গ) নির্দেশ করছে 'ক্রিপ'-র প্রত্যক্ষ অধীন 'বিপ' হচেছ ক্রিয়াপদের মুখ্যকর্ম, এবং (৮৩ঘ) নির্দেশ করছে যে 'ক্রিপ'-র প্রত্যক্ষ অধীন 'ক্রিম' হচেছ ক্রিয়াপদের মুখ্যক্রিয়া। এ-নীতি অনুসারে (৮০)-পদচিত্রের বিভিন্ন পদের ভূমিকা সহজে ও স্বাভাবিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। তাই ব্যাকরণের পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে বিভিন্ন পদের ভূমিকা নির্দেশ করা, এবং ভূমিকাসমূহকে পদচিত্রে উপস্থিত করা ভ্রান্ত বর্ণনা (যেহেতু তা ক্যাটেগরি ও ভূমিকার মধ্যে জট পাকায়, এবং ব্যাকরণে বাহুল্যকে প্রশ্রয় দেয়)। চমস্কির নির্দেশিত কর্তা হচেছ 'যৌক্তিক কর্তা', আর তা উপস্থিত থাকে বাক্যের গভীর তলে। চমস্কির আধিপত্যনীতি অনুসারে বাক্যের বিভিন্ন পদের ভূমিকা নির্ণয়ের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে। কারক-ব্যাকরণ অনুসারে বাক্যের গভীর তলে কর্তাকর্ম প্রভৃতি সম্পর্ক থাকে না ; এ-ব্যাকরণ অনুসারে ভূমিকাগত পরিচয়সমূহ হচেছ বাক্যের অগভীর তলের পরিচয় (দ্র ফিলমোর (১৯৬৮), আজাদ (১৯৭৬))।

১৬.৬. **বাক্যিক বৈশিষ্ট্য**

(৭৮)-বাক্যে যে-সমস্ত অন্তউপাদান, বা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের প্রকৃতির, বা বৈশিষ্ট্যের যে-বিবরণ দেয়া হয়েছে (৭৯গ)-তে, তা কি-পরিমাণে পরিবেশন করা উচিত ব্যাকরণের বাক্য-কক্ষে, সে-সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত নেয়া বেশ কঠিন। (৭৯গ)-তে করা হয়েছে শব্দের 'উপশ্রেণীকরণ'। এ-উপশ্রেণীকরণের দায়িত্ব কতোখানি বহন করবে বাক্য-কক্ষ, আর কতোটা বইবে আর্থকক্ষ, তা নির্ণয় করাও কঠিন। চমস্কি ন্যস্ত করতে চান এ-দায়িত্ব বাক্য-কক্ষের ওপরই, কেননা, তাঁর মতে, বাক্যার্থ নির্ণয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য সরবরাহ করা বাক্য-কক্ষের দায়িত্ব (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৭৫))। চমস্কীয় ব্যাকরণের আর্থকক্ষ ভাষ্যাত্মক। যখন সিদ্ধান্ত স্থির হয় যে উপশ্রেণীকরণের সমস্ত দায় বহন করবে বাক্য-কক্ষ, তখন মাথা তোলে নতুন সমস্যা। সমস্যাটি হচ্ছে: শব্দপুঞ্জ উপশ্রেণীকরণের সুষ্ঠুতম উপায় কি? চমস্কি লক্ষ্য করেছেন যে শব্দরাজির এমন উপশ্রেণীকরণের জন্যে প্রচলিত 'শাখায়নপ্রণালি' ব্যবহার করা অসম্ভব (নিচে দ্র); অর্থাৎ পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে শব্দপুঞ্জের উপশ্রেণীকরণ সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ শুধু 'বিশেষ্য' শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যাক। প্রচলিত ব্যাকরণে, সাধারণত, (৮৪)-র বৈশিষ্ট্য, বা বোধ-অনুসারে বিশেষ্যের 'উপবিভাগ', বা 'উপ-শ্রেণীকরণ' করা হয়:

(৮৪) **নাম** বিশেষ্য (সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য) বনাম **সাধারণ** বিশেষ্য (জাতিবাচক বিশেষ্য); **মূর্তবিশেষ্য** বনাম **বিমূর্ত বিশেষ্য**; **সংখ্যাবাচক** বিশেষ্য বনাম **পরিমাণ-বাচক** বিশেষ্য; **প্রাণীবাচক** বিশেষ্য বনাম **অপ্রাণী (বস্তু) বাচক** বিশেষ্য; **মনুষ্যবাচক** বিশেষ্য বনাম **অ-মনুষ্যবাচক** বিশেষ্য: **পুং** বনাম **স্ত্রী**-বনাম **ক্লীব** বিশেষ্য ইত্যাদি।

এখন অনুধাবন করা যাক (৮৫)-পদচিত্রটির চারিত্র্য (দ্র Φ ১.৩.১):

(৮৫)

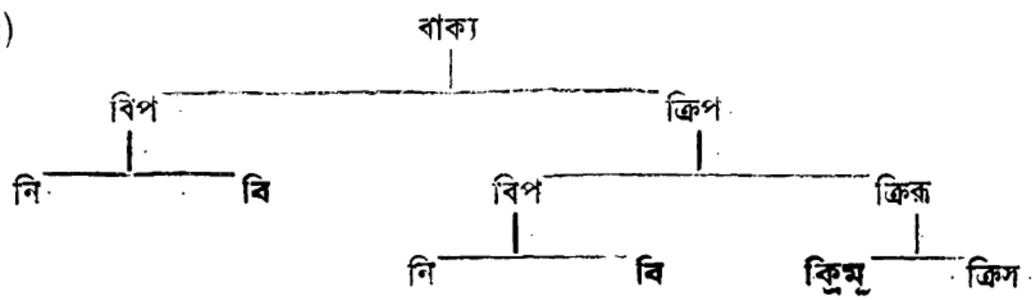

(৮৫)-পদচিত্রটিতে নিম্নরেখ বৃন্তসমূহ নির্দেশ করেছে শব্দপ্রতীক। (৮৫)-পদচিত্রটি নির্দেশ করছে 'ক্রমস্তরিক বিন্যাসনীতি': অর্থাৎ একটি বস্তুর নিচে আরেকটি বস্তু, এবং সে-টির নিচে আরেকটি ইত্যাদি। মনে করা যাক, (৮৪)-এর বৈশিষ্ট্যভিত্তিতে আমরা পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে উপশ্রেণীকরণ করতে চাই বিশেষ্যসমূহকে। যদি শব্দকে পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে উপশ্রেণীতে বিভক্ত করতে চাই, তাহলে আমাদের মেনে নিতে হবে যে শব্দের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যও, (৮৫)-পদচিত্রের মতো, ক্রমস্তরিকভাবে বিন্যস্ত। এ-প্রণালিতে শব্দসমূহকে বিভিন্ন উপশ্রেণীতে বিন্যস্ত করার জন্যে দরকার হবে (৮৬)-র সূত্রের মতো সূত্র:

(৮৬) ক বিশেষ্য → { বি-নামবাচক / বি-সাধারণ }

খ বি-নামবাচক → { বি-নামবাচক, প্রাণীবাচক / বি-নামবাচক, অপ্রাণীবাচক }

গ বি-সাধারণ → { বি-সাধারণ, প্রাণীবাচক / বি-সাধারণ, অপ্রাণীবাচক }

ঘ বি-নামবাচক, প্রাণীবাচক → { বি-নামবাচক, প্রাণীবাচক, মনুষ্যবাচক / বি-নামবাচক, প্রাণীবাচক, অ-মনুষ্যবাচক }

ঙ বি-সাধারণ, প্রাণীবাচক → { বি-সাধারণ, প্রাণীবাচক, মনুষ্যবাচক / বি-সাধারণ, প্রাণীবাচক, অ-মনুষ্যবাচক }

প্রভৃতি

(৮৬)-র সূত্রসমূহ 'ঢাকা', 'হাসান', 'পুশি', 'ছেলে', 'চিতাবাঘ', 'বই' বিশেষ্যসমূহের নিম্নরূপে 'স্তরক্রম' নির্দেশ করবে :

(৮৭)

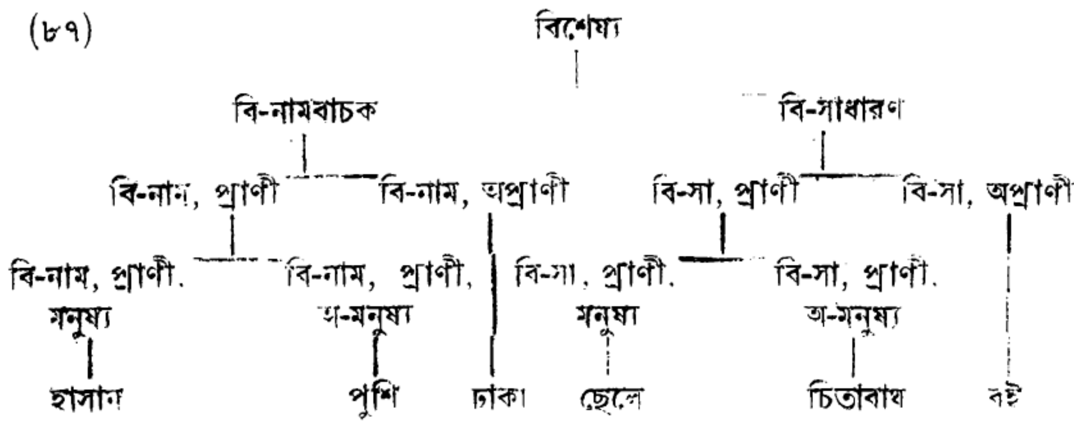

উল্লিখিত প্রণালির উপশ্রেণীকরণের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আপত্তিগুলো সহজে মনে আসে :

[ক] (৮৬)-এর পাঁচটি সূত্র নির্দেশ করছে অতি সামান্য কয়েকটি সম্পর্ক। বিশ্বের সমস্ত বিশেষ্য যদি এমন ক্রমান্তরিক প্রণালিতে উপশ্রেণীতে বিভক্ত করতে হয়, তবে পুনর্লিখন সূত্রের পরিমাণ হবে বিপুল, এবং সূত্রসমূহ হ'য়ে উঠবে অত্যন্ত জটিল।

[খ] 'স্তর'-এর—'হায়ারার্কি'-র—উচ্চতম বস্তর নির্বাচন করতে হবে চরম স্বেচ্ছাচারিতায়। (৮৬ক)-তে বিশেষ্যকে প্রথমে ভাগ করা হয়েছে 'বি-নামবাচক'

(নামবাচক বিশেষ্য) ও 'বি-সাধারণ' (সাধারণ বিশেষ্য) ভাগে। কিন্তু এ-বিভাজনের মানদণ্ড একান্তভাবে স্বেচ্ছাচারী : কোনো শাশ্বত ধ্রুব আদর্শ অনুসারে এ-উপশ্রেণীকরণ করা হয়নি---(কেননা কোনো ধ্রুব মানদণ্ড নেই। বিশেষ্যরাশিকে প্রথমে 'মূর্ত ও বিমূর্ত', বা 'প্রাণী ও অপ্রাণী', বা অন্য কোনোভাবেও দু'ভাগে ভাগ করা যেতো।

[গ] (৮৬ঘ, ঙ) সূত্রে নির্দেশ করা হয়েছে 'বি-নামবাচক, প্রাণীবাচক, মনুষ্যবাচক', 'বি-নামবাচক, প্রাণীবাচক, অ-মনুষ্যবাচক' প্রভৃতি উপশ্রেণী। এ-উপশ্রেণীসমূহের মধ্যে নানা রকম সাদৃশ্য আছে। কিন্তু পদসাংগঠনিক সূত্র এ-উপশ্রেণীসমূহকে এমনভাবে বিভক্ত করেছে, যাতে মনে হয় এদের মাঝে কোনো সাদৃশ্য নেই : যেনো এরা সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে পৃথক। এমন নির্দেশ বোধবিরোধী।

[ঘ] মনে করা যাক, ব্যাকরণের কোনো একটি সূত্র প্রযোজ্য সমস্ত প্রাণীবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে। কিন্তু (৮৬)-র রীতিতে বিশেষ্যসমূহের উপশ্রেণীকরণ করলে সহজসরলভাবে উক্ত সূত্র রচনা করা যাবে না। সূত্রটিতে বলতে হবে যে এ-সূত্র প্রযোজ্য 'বি-নামবাচক, প্রাণীবাচক, মনুষ্যবাচক', 'বি-নামবাচক, প্রাণীবাচক, অ-মনুষ্যবাচক', 'বি-সাধারণ, প্রাণীবাচক, মনুষ্যবাচক', 'বি-সাধারণ, প্রাণীবাচক, অ-মনুষ্যবাচক' প্রভৃতি বিশেষ্যের ক্ষেত্রে। এতে ব্যাকরণ হ'য়ে উঠবে বাহুল্যভারাক্রান্ত, এবং তাৎপর্যপূর্ণ সাধারণীকরণের শক্তিহীন। পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে 'তির্যক-শ্রেণীকরণ' অসম্ভব।

এ-সমস্ত কারণে পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে উপশ্রেণীকরণ করা সম্ভব নয়।

উপশ্রেণীকরণের উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের জন্যে চমস্কি গ্রহণ করেন ধ্বনিতত্ত্বে ব্যবহৃত 'স্বাতন্ত্রিক ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ম্যাট্রিকস'-এর সাহায্য (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৮০-৮১))। ইয়াকবসন-অনুসারী ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনি-এককসমূহের 'তির্যক-শ্রেণীকরণ' করা হয় বিভিন্ন স্বাতন্ত্রিক ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। এতে একএকটি ধ্বনি-একককে বিবেচনা করা হয় একগুচ্ছ স্বাতন্ত্রিক ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের সমষ্টিরূপে, এবং এর ফলে কোনো এককের এমনকি একটি বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রযোজ্য সূত্রও স্পষ্টভাবে রচনা করা যায়। চমস্কি, অনুরূপভাবে, ভাষায় ব্যবহৃত এক-একটি শব্দকে গ্রহণ করেন একগুচ্ছ বাক্যিক, আর্থ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টিরূপে। এ-বৈশিষ্ট্যসমূহের সমষ্টিকে চমস্কি বলেন 'মিশ্র-প্রতীক' (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৮২))। এখানে আমরা সীমাবদ্ধ থাকবো কেবল বাক্যিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনায়। বাক্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে নিম্নরূপে উপবিভক্ত করা যায় :

(৮৮) বাক্যিক বৈশিষ্ট্য

- **পদগত, বা ক্যাটেগরিগত বৈশিষ্ট্য**
- **আন্তর বা সহজাত বৈশিষ্ট্য**
- **প্রতিবেশিক বৈশিষ্ট্য**
  - **সূক্ষ্ম উপশ্রেণীকরণ বৈশিষ্ট্য**
  - **সংগতি বৈশিষ্ট্য**

পদগত বা ক্যাটেগরিগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে শব্দের পদগত পরিচয়। তাই 'বিশেষ্য', 'ক্রিয়া', বা 'বিশেষণ'-এর 'পদগত বৈশিষ্ট্য' হচ্ছে [+বি], [+ক্রি], এবং [+বিণ] (ভাষাবিজ্ঞানের প্রচলিত রীতি হচ্ছে বাক্যিক, আর্থ, ধ্বনিতাত্ত্বিক বা অন্যান্য যে-কোনো বৈশিষ্ট্যকে চতুষ্কোণ বন্ধনিতে আবদ্ধ করা (যেমন [+বি])। শব্দের দ্বিতীয় বাক্যিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'আন্তর, বা সহজাত বৈশিষ্ট্য'। এখানে বিশেষ্যের সহজাত বৈশিষ্ট্যবিষয়ক আলোচনাতেই আমি সীমিত থাকবো। (৮৪)-র 'বৈশিষ্ট্য'-সমূহের প্রতি অভিনিবেশী দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় যে এ-বৈশিষ্ট্যগুলোর অনেকগুলো 'দ্বিমুখি'—'বাইনারি': অর্থাৎ বিশেষ কোনো একটি 'বৈশিষ্ট্য' কোনো বিশেষ্যের আছে-কি-নেই, তা + (যোগ), ও — (বিয়োগ)-চিহ্নের সাহায্যে নির্দেশ করা যায়। এ-প্রণালিতে নামবাচক বিশেষ্য ও সাধারণ বিশেষ্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায় [± সাধারণ] রূপে। অর্থাৎ যে-বিশেষ্যের আছে [+ সাধারণ] বৈশিষ্ট্য, তা 'সাধারণ বিশেষ্য' এবং যে-বিশেষ্যের আছে [–সাধারণ] বৈশিষ্ট্য, তা 'নামবাচক বিশেষ্য'। এমন দ্বিমুখি বৈপরীত্যজ্ঞাপক সহজাত বৈশিষ্ট্যের আরো উদাহরণ হচ্ছে: [±মূর্ত], [± প্রাণী], [± পুং], [± মনুষ্য], [± সংখ্যা] ইত্যাদি। কিছুকিছু বৈশিষ্ট্য পরস্পরের সাথে 'স্তরক্রমিকভাবে' অন্বিত; অর্থাৎ কোনো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য [+ক] যুক্তিসংগতভাবে জ্ঞাপন করে অন্য একটি বৈশিষ্ট্য [+খ]। নিচের উদারহরণ লক্ষণীয়:

(৮৯)	চ	ছ	জ
ক	[+মনুষ্য]	[+প্রাণী]	[+বিমূর্ত]
খ	[+বিমূর্ত]	[—প্রাণী]	[—মনুষ্য]

(৮৯)-উদাহরণে চ জ্ঞাপন করে 'ছ' ও 'জ'; অর্থাৎ যদি জানা যায় যে কোনো একটি বিশেষ্য মনুষ্যবাচক [+ মনুষ্য], তবে সংগতভাবে বোঝা যায় যে সেটি অবশ্যই প্রাণীবাচক [+ প্রাণী], এবং মূর্ত [— বিমূর্ত]; যদি জানা যায় যে বিশেষ্যটি বিমূর্ত [+ বিমূর্ত], তবে সংগতভাবেই বোঝা যায় যে ওটি অবশ্যই অপ্রাণীবাচক [— প্রাণী], এবং অ-মনুষ্যবাচক [— মনুষ্য)। এ-ব্যাপারটি অভিধানের 'বাহুল্য সূত্রে'র সাহায্যে সহজেই নিম্নরূপে নির্দেশ করা যায়:

(৯০) ক [+ মনুষ্য] → [—বিমূর্ত, +প্রাণী, +মনুষ্য]

খ [+ বিমূর্ত] → [—মনুষ্য, —প্রাণী, +বিমূর্ত]

(৯০)-রূপী বাহুল্যসূত্র ব্যাকরণকে মুক্তি দেয় অপ্রয়োজনীয় তথ্যভার, ও জটিলতা, বহন করার দায় থেকে। নিচের সহজাত বৈশিষ্ট্যের ম্যাট্রিকসটি লক্ষণীয় ('বাহুল্য বৈশিষ্ট্য-সমূহ গোলাকার বন্ধনিতে ঘিরে দেয়া হয়েছে):

(৯১)	মেয়ে	হাসিনা	বেড়াল	প্রেম
বি	+	+	+	+
সাধারণ	+	—	+	+
সংখ্যাবাচক	(+)	(—)	(+)	—
বিমূর্ত	(—)	(—)	(—)	+
প্রাণীবাচক	(+)	(+)	(+)	(—)
মনুষ্যবাচক	+	+	—	(—)

কিন্তু অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য এমন স্তরক্রমিকভাবে অন্বিত থাকে না। (৯২)-র উদাহরণগুলোতে [± মনুষ্য] ও [± পুং] বৈশিষ্ট্যসমূহের সম্পর্ক বিচার্য :

(৯২) ক [+মনুষ্য] [+পুং] : 'ছেলে', 'ভদ্রলোক' প্রভৃতি।

খ [+মনুষ্য] [—পুং] 'মেয়ে', 'মহিলা' প্রভৃতি।

গ [—মনুষ্য] [+পুং] 'সিংহ', 'ষাঁড়' প্রভৃতি।

ঘ [—মনুষ্য] [—পুং] : 'গাভী', 'বাঘিনী' প্রভৃতি।

(৯২)-র বিশেষ্যসমূহের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সহজাত বৈশিষ্ট্যের দ্বিমুখিতার সাহায্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে : 'ছেলে' ও 'মেয়ে'-র মধ্যে সাদৃশ্য [+মনুষ্য] বৈশিষ্ট্যে, এবং বৈসাদৃশ্য [±পুং] বৈশিষ্ট্যে ; এবং 'ছেলে'-র সাথে 'সিংহ'-এর সাদৃশ্য [+পুং] বৈশিষ্ট্যে, বৈসাদৃশ্য [±মনুষ্য] বৈশিষ্ট্যে ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে 'বৈশিষ্ট্য' ভিত্তি ক'রে ভাষার শব্দপুঞ্জ বর্ণনা করলে শব্দপুঞ্জের 'স্তরক্রমিক' ও 'তির্যক শ্রেণী'গত সম্পর্ক সহজেই নির্দেশ করা যায়। বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে সহজেই নির্দেশ করা যায় কাঙ্খিত শ্রেণীটিকে, এবং বিরত থাকা যায় অবাঞ্ছিত কোনো শ্রেণীর উল্লেখ থেকে। যেমন : যদি উল্লেখ করতে হয় মনুষ্যবাচক বিশেষ্যরাশিকে, তবে শুধু [+মনুষ্য] বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলেই সমগ্র মনুষ্যবাচক বিশেষ্যশ্রেণী পাওয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'প্রতিবেশিক বৈশিষ্ট্য', যার একটি হচ্ছে 'সূক্ষ্ম উপশ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য', এবং অন্যটি হচ্ছে 'সংগতি বৈশিষ্ট্য'। 'সূক্ষ্ম উপশ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য' নির্দেশ করে কি-রকম বাক্যকাঠামোতে কোনো একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহৃত হ'তে পারে। (৯৩)-র উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৯৩) ক *ছেলেটি মারামারি করছে।

খ *তিনি তিন ঘণ্টাব্যাপী মারা গেলেন।

ওপরের বাক্যদুটি ব্যাকরণবিরুদ্ধ : (৯৩ক)-বাক্যটি ব্যাকরণবিরুদ্ধ, কেননা 'মারামারি কর' ক্রিয়ার জন্যে দরকার [+বহুবচন] বিশেষ্যপদ, কিন্তু এটিতে বসেছে [—বহুবচন] বিশেষ্যপদ। (৯৩খ)-বাক্যটি ব্যাকরণবিরুদ্ধ ; কেননা 'মারা যা' ক্রিয়া কালব্যাপ্তিবোধক ক্রিয়াবিশেষণের সাথে ব্যবহৃত হ'তে পারে না ; কিন্তু এ-বাক্যে তা উপস্থিত হয়েছে ওই নিষিদ্ধ ক্রিয়াবিশেষণের সাথে ('তিন ঘণ্টাব্যাপী')। বাক্যে বিভিন্ন পদের সহা-বস্থানের নীতি নির্দেশ করে 'সূক্ষ্ম উপশ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য'। তাই ব্যাকরণে প্রতিটি পদের 'সূ-উ-বৈশিষ্ট্য' নির্দেশ করা দরকার। 'মারামারি কর' ক্রিয়ার জন্যে দরকার বহুবচনসূচক কর্তা-বিশেষ্যপদ ; তাই এটির 'সূ-উ-বৈ' হচ্ছে [+বিপ বহুবচন] 'মারা যা' ক্রিয়া যেহেতু কাল ব্যাপ্তিবোধক ক্রিয়াবিশেষণের সাথে ব্যবহৃত হ'তে পারে না, তাই এর 'সূ-উ-বৈ' হচ্ছে [—ক্রিবিণ কালব্যাপ্তি]। সূ-উ-বৈ-কে নির্দেশ করা হয় 'স্থানিক বৈশিষ্ট্য ব'লে। 'স্থানিক' কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে : যদি কোনো ক্যাটেগরিপ্রতীক 'খ' প্রত্যক্ষভাবে 'অধীন' হয় কোনো অ-অন্ত্যপ্রতীক 'ক'-এর, তবে 'ক' (এবং কেবল 'ক') অন্য যে-সব ক্যাটেগরির ওপর প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করে, তাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সূক্ষ্ম উপশ্রেণীকরণ করা হবে 'খ'-এর। (৯৪)-চিত্রটি লক্ষণীয় :

(৯৪)

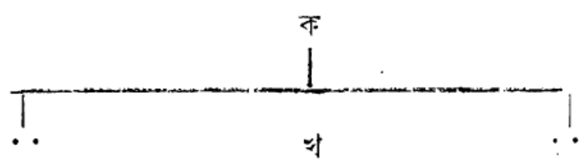

(৯৪)-তে 'ক' প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করছে 'খ'-র ওপর। 'খ'-র সূক্ষ্ম উপ-শ্রেণীকরণ করা হবে 'ক' অন্য যে-সব ক্যাটেগরির ওপর আধিপত্য করে, তাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে (অর্থাৎ নির্দেশ করা হবে 'খ' অন্য ক্যাটেগরির সাথে সহাবস্থান করতে পারে কি-না)। সাধারণত ক্রিয়ার উপশ্রেণীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে 'সূ-উ-বৈ'; তবে বিশেষ্যের উপশ্রেণীকরণেও এ-বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগানো হয়। উপশ্রেণীকরণে পদের গুরুত্ব সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। চমস্কির মতে বিভিন্ন ক্যাটেগরি, বা পদের মধ্যে বিশেষ্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ; তাই বাক্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য অনুসারে করতে হবে ক্রিয়া, বা অন্য পদের সূক্ষ্ম উপশ্রেণীকরণ (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ১১৬))। কিন্তু চমস্কির এ-মত ইদানীং মানা হয় না। এ-কথা সম্প্রতি সর্বজনস্বীকৃত যে বাক্যে ক্রিয়াই সবচেয়ে শক্তিমান ও গুরুত্বপূর্ণ ; তাই ক্রিয়া-অনুসারে সূক্ষ্ম উপশ্রেণী-করণ করতে হবে বিশেষ্যের, ও অন্যান্য পদের (দ্র স্টকওয়েল ও অন্যান্য (১৯৭৩, ৭১৮—৭৪৭))।

'সংগতি বৈশিষ্ট্য-রাশি আর্থ বৈশিষ্ট্য, এবং এগুলো বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদের 'আর্থ সংগতি' নির্দেশ করে। বর্তমানে এ-বৈশিষ্ট্যসমূহ বিচারের ভার দেয়া হয় আর্থ-কক্ষের ওপর, কিন্তু চমস্কি ব্যাকরণের বাক্য-কক্ষের সূত্রের সাহায্যে সংগতি-নিয়ন্ত্রণ করতে চান। 'সংগতি বৈশিষ্ট্যে'র বিপর্যয়ে জন্মে বিসংগত বাক্য। কতিপয় উদাহরণ :

(৯৫) ক *টাইপরাইটারটি স্বপ্ন দেখছে।

খ *ডক্টর হক হাত দিয়ে লাথি মারলেন।

গ *আমি একটি যুবতী গাইবো।

ঘ *এ-গাধাটি অর্থনীতিতে পিএইচডি।

ঙ *হাসিনা অস্তমিত হচ্ছে।

(৯৫)-এর বাক্যগুলো বিসংগতির নিদর্শন, এবং প্রচলিত ব্যাকরণ ও চমস্কীয় "আস্পেকটস"-কাঠামোর ব্যাকরণ অনুসারে ত্রুটিপূর্ণ। বাক্যগুলোতে কোনো বাক্যিক ত্রুটি নেই, যা আছে তা আর্থ ত্রুটি : কবিতায় এমন বাক্য অবিরল পাওয়া যায়। (৯৫ক)-বাক্যটি ত্রুটিপূর্ণ; কেননা 'স্বপ্ন দেখ' ক্রিয়ার জন্যে দরকার [+মনুষ্য] কর্তা, কিন্তু এতে ব্যবহৃত হয়েছে [—প্রাণীবাচক], অর্থাৎ বস্তুবাচক কর্তা; তাই বাক্যটি হয়েছে বিসংগত। অন্যান্য বাক্যও বিসংগত কোনো-না-কোনো 'সংগতি বৈশিষ্ট্য' বিপর্যয়ের জন্যে। চমস্কির মতে (৯৫)-ধরনের বাক্য ব্যাকরণ কিছুতেই সৃষ্টি করবে না; তাই ব্যাকরণের বাক্য-কক্ষ 'সংগতি সূত্রে'র সাহায্যে এমন বাক্য সৃষ্টি রোধ করবে। কিন্তু চমস্কি-উত্তরদের মতে এমন বাক্য ব্যাকরণ অবশ্যই সৃষ্টি করবে, এবং বাক্যের সংগতি-বিসংগতি নির্ণয় করবে ব্যাকরণের আর্থ কক্ষ, কেননা এ-বিচ্যুতি বাক্যিক নয়, আর্থ (দ্র ম্যাককলি (১৯৭০))। এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য *Φ* ১.৬.৯.৫।

অভিধানে প্রতিটি শব্দকে স্থান দেয়া হবে তার সমস্ত বাক্যিক, আর্থ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সমবায়ে : চমস্কির ভাষায় 'মিশ্রপ্রতীক' রূপে (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৮২), *Φ*১.৬.৮))। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে 'পাখি' শব্দটির নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যগত বিবরণ দেয়া হবে অভিধানে :

(৯৬) **পাখি** [অর্থাৎ শব্দটির ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য]

[+বিশেষ্য, +সাধারণ, +সংখ্যাবাচক, —মনুষ্য]

[+···(এর সূ-উ-বৈ)]

[+···(সংগতি বৈশিষ্ট্য)]

[+···(আর্থ বৈশিষ্ট্য)]

১.৬.৭ ভিত্তিকক্ষের সংগঠন : পদসাংগঠনিক উপকক্ষের বৈশিষ্ট্য

"আস্পেকটস"-কাঠামোর ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষ দুটি সুস্পষ্ট উপকক্ষে বিভক্ত : (ক) 'পদসাংগঠনিক উপকক্ষ'; এবং (খ) 'আভিধানিক উপকক্ষ'। পদসাংগঠনিক উপকক্ষটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এ-কক্ষের সূত্ররাশি সৃষ্টি করে বাক্যের আদিরূপ। পদসাংগঠনিক উপকক্ষে আছে দু'ধরনের সূত্র :

[ক] পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্র

[খ] 'মিশ্রপ্রতীক'-গঠনকারী সূত্র

[ক] **পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্র** "আস্পেকটস"-কাঠামোর ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্রসমূহ সরল পুনর্লিখন সূত্র (দ্র *Φ* ১'৩'২ ; *Φ* ১'৫'১'১ ;)। এ-সূত্রসমূহ বাক্যকে উচ্চ ক্যাটেগরি সমূহ পর্যন্ত পুনর্লিখনের সাহায্যে সম্প্রসারিত করে। উদাহরণস্বরূপ (৭৮)-এর 'ছেলেটি একটি মেয়েকে ভালোবাসে' বাক্যটিকে পুনরায় নেয়া যাক। এ-বাক্যটি সৃষ্টির জন্যে রচিত হয়েছিলো ব্যাকরণ (৮১)। এ-ব্যাকরণের সূত্রসমূহ দু ভাগে—(৮১ক) ও (৮১খ)—বিভক্ত করা হয়েছিলো। (৮১ক)-সূত্রগুলোকে বলা হয় 'পদগত সূত্র', এবং (৮১খ)-সূত্রগুলোকে বলা হয় 'শব্দ সূত্র'। "আস্পেকটস"-কাঠামোর ব্যাকরণ বাক্যসৃষ্টির জন্যে (৮১ক)-রূপী সূত্র ব্যবহার করে ; কিন্তু (৮১খ)-রূপী সূত্র ব্যবহার করে না। আলোচনার সুবিধার জন্যে (৮১ক)-সূত্রগুলোকে (৯৭)-রূপে নিম্নে উপস্থিত করা হলো

(৯৭) বাক্য → বিপ ক্রিপ

ক্রিপ → বিপ ক্রিক্ত

বিপ → { নি + বি বিভ ; বি + নি }

ক্রিক্ত → ক্রিন্ ক্রিস

নি → { অনু / বি— ; সং + অনু }

(৯৭)-এ সূত্রগুলো 'বাক্য'-কে সরল পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে উচ্চ ক্যাটেগরি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছে। এর পরে ক্যাটেগরিগুলোকে পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে সম্প্রসারিত করতে হ'লে সে-সব সূত্রে নির্দেশ করা হবে বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন অন্তক্যাটেগরি। কিন্তু "আস্পেকটস"-ব্যাকরণ তা থেকে বিরত থাকবে। পদসাংগঠনিক সূত্রের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব তুলে নেবে পদসাংগঠনিক উপকক্ষের দ্বিতীয় শ্রেণীর সূত্র—'মিশ্রপ্রতীক-গঠনকারী সূত্র'।

[খ] **মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সূত্র** : শব্দের বাক্যিক, আর্থ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টিকে চমস্কি বলেন 'মিশ্রপ্রতীক' (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৮৪), *Φ* ১'১'৬))। মিশ্রপ্রতীক-গঠনকারী সূত্রসমূহ বিভিন্ন উচ্চ ক্যাটেগরিকে এক গুচ্ছ বৈশিষ্ট্যের সমষ্টিরূপে গঠন করে। মিশ্রপ্রতীক সৃষ্টি করতে হ'লে বিভিন্ন শব্দকে ভাঙতে হবে তাদের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে, এবং এক প্রকার জটিল পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে বিভিন্নভাবে গুচ্ছাবদ্ধ করতে হবে ওই বৈশিষ্ট্যরাশিকে। উদাহরণস্বরূপ 'বিশেষ্য'-কে ভাঙা যায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যে (দ্র *Φ* ১'৬'৬) :

(৯৮) [বিশেষ্য] : [সাধারণ] : [সংখ্যা] : [প্রাণী] : [মনুষ্য] : [বিমূর্ত]

এ-বৈশিষ্ট্যসমূহের 'দ্বিমুখি' বিন্যাসের সাহায্যে এদের আবদ্ধ করা যায় বিভিন্ন গুচ্ছে (দ্র ৫ ১'৬'৬)। শব্দের বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্য গুচ্ছিত, বা মিশ্রিত করার জন্যে যে-সূত্র ব্যবহৃত হয়, তাই 'মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সূত্র'। (৯৮)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহকে নিম্নরূপ সূত্রের সাহায্যে গুচ্ছিত করা যায় মিশ্রপ্রতীকে :

(৯৯) ক বি → [+বি. ±সাধারণ]

খ [+সাধারণ] → [±সংখ্যা]

গ [+সংখ্যা] → [±প্রাণী]

ঘ [—সাধারণ] → [±প্রাণী]

ঙ [+প্রাণী] → [±মনুষ্য]

চ [—সংখ্যা] → [±বিমূর্ত]

(৯৯)-র সূত্রগুলো একরকম জটিল পুনর্লিখন সূত্র, যা ব্যাখ্যার রয়েছে বিশেষ বিধি। (৯৯ক)-সূত্রটি নির্দেশ করছে যে 'বি'-কে দুটি মিশ্রপ্রতীক [+বি, +সাধারণ] ও [+বি, —সাধারণ]-এর মধ্যে যে-কোনো একটি দ্বারা প্রতিকল্পিত করতে হবে, বা যে-কোনো একটি রূপে সম্প্রসারিত করতে হবে। যদি 'বি'-কে সম্প্রসারিত করা হয় [+বি, +সাধারণ]-রূপে, তবে (৯৯খ)-সূত্রের সাহায্যে একে পুনরায় সম্প্রসারিত করতে হবে নিম্নের দুটি মিশ্রপ্রতীক রূপে : [+বি, +সাধারণ, +সংখ্যা], এবং [+বি, +সাধারণ, —সংখ্যা]। এ-প্রণালিতে প্রয়োগ করতে হবে (৯৯চ) অবধি প্রযোজ্য সমস্ত সূত্র, এবং ফলে রচিত হবে নানা মিশ্রপ্রতীক : বিশেষ্যের বৈশিষ্ট্যগুচ্ছ। (৯৯)-র সূত্রসমূহ প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে (১০০)-র মিশ্রপ্রতীকসমূহ :

(১০০) ক [+বি, +সাধারণ, +সংখ্যা, +প্রাণী, +মনুষ্য,] : 'ছেলে', 'মেয়ে' প্রভৃতি।

খ [+বি, —সাধারণ, +প্রাণী, +মনুষ্য] : 'হাসান', 'হাসিনা' প্রভৃতি।

গ [+বি, +সাধারণ, —সংখ্যা, +বিমূর্ত] : 'কবিত্ব', 'সরলতা' প্রভৃতি।

ঘ [+বি, +সাধারণ, —সংখ্যা, +বিমূর্ত] : 'মদ', 'পানি' প্রভৃতি।

ঙ [+বি, +সাধারণ, +সংখ্যা, —প্রাণী] : 'বই', 'কলম' প্রভৃতি।

চ [+বি, —সাধারণ, —প্রাণী] : 'ঢাকা' 'রাড়িখাল' প্রভৃতি।

ছ [+বি, —সাধারণ, +প্রাণী, —মনুষ্য] : 'পুশি', 'মহেশ' প্রভৃতি।

(১০০)-র মিশ্রপ্রতীকসমূহ অভিনিবেশের সাথে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে এগুলো হচ্ছে শব্দের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের গুচ্ছ।

"আস্পেকটস"-কাঠামোর ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক উপকক্ষের পদসাংগঠনিক সূত্রসমূহ ব্যাকরণের আদিপ্রতীক 'বাক্য'-কে সম্প্রসারিত করে উচ্চ ক্যাটেগরিসমূহ পর্যন্ত, এবং তার পরে মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সূত্ররাশি গঠন করে উচ্চ ক্যাটেগরিসমূহের মিশ্রপ্রতীক। পদসাংগঠনিক সূত্র ও মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সূত্রের সাহায্যে যে-গ্রন্থি রচিত হয়, তার নাম 'উপান্তগ্রন্থি'। ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক উপকক্ষের দায়িত্ব শেষ হয় উপান্তগ্রন্থি সৃষ্টি ক'রেই। এ-কক্ষের সূত্রের সাহায্যে অন্তগ্রন্থি সৃষ্টি করা হয় না। এ-ব্যাকরণে অন্তগ্রন্থি সৃষ্টির ভার অর্পণ করা হয়েছে ভিত্তিকক্ষের আরেক উপকক্ষ 'আভিধানিক উপকক্ষ'-এর ওপর (দ্র Φ ১'৬'৮)। মনে করা যাক (৭৮)-এর 'ছেলেটি একটি মেয়েকে ভালোবাসে' বাক্যটি সৃষ্টি করতে হবে "আস্পেকটস"-কাঠামোর ব্যাকরণের সাহায্যে। কি-রকম সূত্র দরকার হবে বাক্যটি সৃষ্টির জন্যে ? এ-ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক উপকক্ষের পদসাংগঠনিক সূত্রসমূহ হবে, (৯৭) (অবশ্য ভিন্ন বিশ্লেষণে ভিন্ন পদসংগঠনও দেখানো সম্ভব)। এ-সূত্রের পরে মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সূত্রের সাহায্যে মিশ্রপ্রতীকে পরিণত করতে হবে সমস্ত উচ্চ ক্যাটেগরিকে, অর্থাৎ 'বি', 'ক্রিমূ', 'সং', 'অনু', 'বিভ', 'ক্রিস' প্রভৃতি ক্যাটেগরিকে। এ-সমস্ত ক্যাটেগরিকে মিশ্রপ্রতীকে পরিণত করা হবে নিম্নরূপ সূত্রের সাহায্যে (এখানে ক্যাটেগরিসমূহকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে না ভেঙে শুধু 'মিপ্র'-সংকেতের সাহায্যে মিশ্রপ্রতীক বোঝানো হলো) :

(১০১) বি → মিপ্র

ক্রিমূ → মিপ্র

সং → মিপ্র

অনু → মিপ্র

বিভ → মিপ্র

ক্রিস → মিপ্র

(৯৭) ও (১০১)-এর সাহায্যে "আস্পেকটস"-কাঠামোর ব্যাকরণ 'ছেলেটি একটি মেয়েকে ভালোবাসে' বাক্যের নিম্নরূপ পদচিত্র এবং উপান্তগ্রন্থি সৃষ্টি করবে :

(১০২)

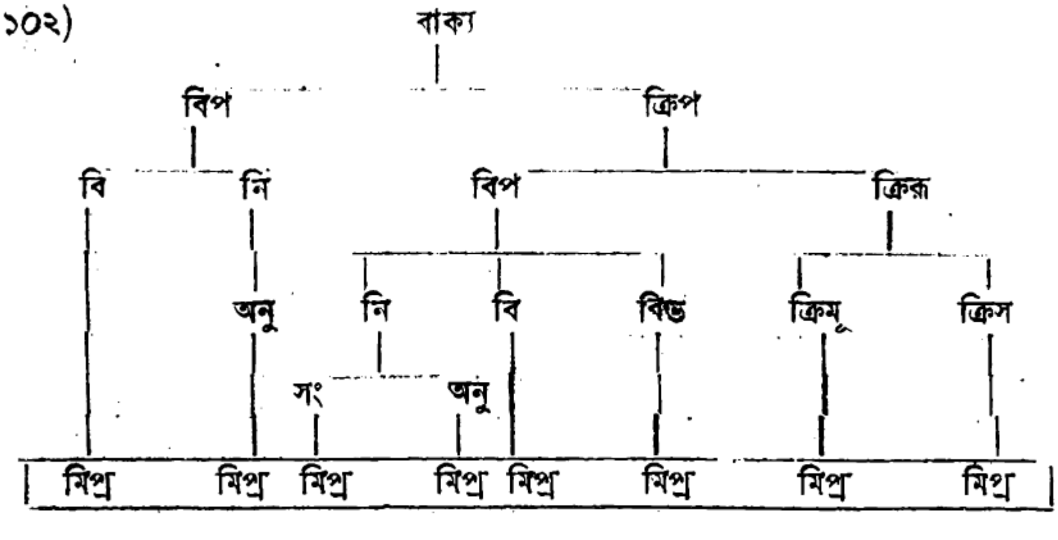

(১০২)-এর রেখায় আবদ্ধ গ্রন্থিটি উপান্তগ্রন্থি। এতে কোনো অন্তপ্রতীক, বা 'শব্দ' নেই ; যা আছে তা হচ্ছে বিভিন্ন ক্যাটেগরির সাথে যুক্ত গুচ্ছগুচ্ছ বৈশিষ্ট্য, বা মিশ্রপ্রতীক (ব্যাকরণে মিশ্রপ্রতীকসমূহকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে হয়)। একরাশ মিশ্রপ্রতীকসম্বলিত উপান্তগ্রন্থি সৃষ্টি ক'রে শেষ হয় ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক উপকক্ষের দায়িত্ব। এ-কক্ষের সূত্র উপান্তগ্রন্থিতে শব্দ প্রবিষ্ট করায় না। উপান্ত-গ্রন্থিতে শব্দসঞ্চার করার দায়িত্ব 'আভিধানিক উপকক্ষ'-এর (দ্র ✆ ১'৬'৮)।

১'৬'৮ আভিধানিক উপকক্ষ

'রূপান্তর ব্যাকরণ [[দুই]]'-এর —অর্থাৎ ''আস্পেকটস''-কাঠামোর ব্যাকরণের— একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপকক্ষ হচ্ছে 'আভিধানিক উপকক্ষ'। ''সিন্ট্রা''-কাঠামোর ব্যাকরণে পদসাংগঠনিক সূত্রের সাহায্যে নির্দেশ করা হয় অন্তউপাদান। ''সিন্ট্রা''-কাঠামোর ব্যাকরণে নিম্নরূপ পদসাংগঠনিক 'শব্দ সূত্র' ব্যবহৃত হয় (দ্র ✆ ১'৫'১'১) :

(১০৩) ক বি → ছেলে, মেয়ে

খ ক্রিম্ → ভালোবাস্, দেখ্

গ সং → এক, দুই

ঘ অনু → টি, টা

ঙ ক্রিস → এ, ছে

কিন্তু ''আস্পেকটস''-কাঠামোর ব্যাকরণে পদসাংগঠনিক উপকক্ষ থেকে বর্জন করা হয় এ-সব শব্দ সূত্র ; এবং এ-সব সূত্রের দায়িত্ব, নতুন প্রণালিতে, অর্পণ করা হয় আভিধানিক উপকক্ষের ওপর। আভিধানিক উপকক্ষের ওপর ন্যস্ত হয় বিপুল দায়িত্ব, যা আগে অনেক সরলরূপে বহন করতে হতো পদসাংগঠনিক সূত্ররাশিকে।

আভিধানিক উপকক্ষকে বলা যেতে পারে একটি ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ 'অভিধান' বা 'শব্দকোষ'। এ-অভিধান, বা শব্দকোষ হচ্ছে ভাষার শব্দরাশির তালিকা। তবে অভিধানে শব্দসমূহকে সন্নিবিষ্ট করতে হবে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৮৪, ১৬৪-১৯২), আজাদ (১৯৭৬))। 'অভিধান' সম্পর্কে চমস্কির সিদ্ধান্ত (দ্র চমস্কির (১৯৬৫, ৮৪) : 'অভিধান (বা শব্দকোষ) হচ্ছে একরাশ 'শব্দ-এন্ট্রি', যাতে প্রতিটি শব্দ-এন্ট্রি হচ্ছে (ধ্. ব)-র যুগল, যাতে 'ধ্' হচ্ছে শব্দটির ধ্বনিরূপ নির্দেশক স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের ম্যাট্রিকস, এবং 'ব' হচ্ছে একগুচ্ছ বাক্যিক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি (অর্থাৎ একটি মিশ্রপ্রতীক)।' অভিধানে সংকলিত হবে ভাষার সমস্ত শব্দ, এবং প্রতিটি শব্দের সাথে যুক্ত থাকবে তার ধ্বনিগত, আর্থ ও বাক্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ। রূপান্তর ব্যাকরণের সহযোগী অভিধানের রূপ কেমন হবে, তা বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষী (দ্র চমস্কি (১৯৬৫), উইনরাইস (১৯৬৬), ফিলমোর (১৯৬৯, ১৯৭১), বোথা (১৯৬৮), স্টকওয়েল ও অন্যান্য (১৯৭৩), আজাদ (১৯৭৬))। ''আস্পেকটস''-কাঠামোর ব্যাকরণে বাক্যসৃষ্টিতে অভিধান পালন করে ব্যাপক ভূমিকা। বলা যেতে পারে যে অভিধান ভাষার প্রতিটি শব্দের পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে, এবং ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক উপকক্ষ, বাক্যসৃষ্টির জন্যে, অভিধানের নির্দেশ অনু-

সারে ব্যবহার করে অভিধানভুক্ত শব্দপুঞ্জ। অভিধানের দায়িত্ব কেবল শব্দের তালিকা ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেই শেষ হয় না, অভিধাম সুস্পষ্ট নিয়মানুসারে পদসাংগঠনিক উপকক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট উপান্তগ্রন্থিতে শব্দ সরবরাহকরে (দ্র Φ ১.৬.৭)। উপান্ত-গ্রন্থিতে শব্দসংক্রামের ফলে গঠিত হয় 'অন্তগ্রন্থি'। অভিধান থেকে উপান্তগ্রন্থিতে শব্দ সংক্রামের দু'রকম প্রণালি নির্দেশ করেছেন চমস্কি (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৮৪; ১২২)। প্রণালি দুটি হচ্ছে :

[ক] মিশ্রপ্রতীক প্রতিকল্পন প্রণালি (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৮৪))

[খ] 'ডামি'-প্রতীক প্রতিকল্পন প্রণালি (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ১২২))

[ক] **মিশ্রপ্রতীক প্রতিকল্পন প্রণালি** : এ-প্রণালিটি চমস্কির প্রিয়, এবং 'আস্পেকটস'-এ গৃহীত, কিন্তু এটিকে, যেহেতু জটিল, পরিত্যাগ করেছেন চমস্কি-উত্তর রূপান্তরবাদীরা। Φ ১.৬.৭ পরিচ্ছেদাংশে দেখানো হয়েছে যে পদসাংগঠনিক উপকক্ষের পদসাংগঠনিক সূত্র ও মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সূত্র রচনা করে একরাশ মিশ্রপ্রতীকসম্বলিত উপান্তগ্রন্থি (দ্র পদচিত্র (১০২))। এ-জাতীয় পদচিত্রে বিভিন্ন ক্যাটেগরির সাথে সংলগ্ন হ'য়ে থাকে ক্যাটেগরিগুলোর বৈশিষ্ট্যগুচ্ছ, বা মিশ্রপ্রতীক। অভিধানে থাকে প্রতিটি শব্দের মিশ্রপ্রতীকসম্বলিত তালিকা। শব্দসূত্রের সাহায্যে উপান্তগ্রন্থির মিশ্রপ্রতীক, ও অভিধানে সন্নিবিষ্ট শব্দের মিশ্রপ্রতীকের অভিন্নতা যাচাই ক'রে অভিধান থেকে উপান্তগ্রন্থিতে সরবরাহ করা হয় বিভিন্ন শব্দ। এ-প্রণালিতে শব্দসংক্রামের রীতিই হচ্ছে 'মিশ্রপ্রতীক প্রতিকল্পন প্রণালি'। চমস্কি এ-প্রণালিতে শব্দসংক্রামের যে-সূত্র রচনা করেছেন, তা নিম্নরূপ (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৮৪)) :

> যদি 'ক' হয় কোনো উপান্তগ্রন্থির মিশ্রপ্রতীক, এবং (হব, ব) হয় কোনো শব্দ-এন্ট্রি, এবং 'ব' যদি ভিন্ন না হয় 'ক' থেকে, তবে 'ক'-এর বিকল্পে 'হব' ব্যবহার করা যাবে।

আপাতদুর্গম এ-সূত্রটির সরল অর্থ হচ্ছে যে পদচিত্রে ঝুলন্ত কোনো মিশ্রপ্রতীক যদি অভিধানে সন্নিবিষ্ট কোনো শব্দের মিশ্রপ্রতীকের সাথে অভিন্ন হয়, তবে পদচিত্রের মিশ্রপ্রতীকটির স্থানে ব্যবহার করা যাবে অভিধানের শব্দটি। উপান্তগ্রন্থিতে অভি-ধান থেকে শব্দসংক্রামের ফলে গঠিত হয় 'অন্তগ্রন্থি'। অন্তগ্রন্থিসম্বলিত পদচিত্র হচ্ছে বাক্যের গভীর সংগঠন, বা গভীর তল।

মনে করা যাক, অভিধানে 'ছেলে', 'মেয়ে', 'ভালোবাস', 'এক', 'টি', 'এ' প্রভৃতি শব্দের নিম্নরূপ এন্ট্রি আছে :

(১০৪) 'ছেলে' : [+বি, +সাধারণ, +সংখ্যা, +প্রাণী, +মনুষ্য, +পুং]

'মেয়ে' : [+বি, +সাধারণ, +সংখ্যা, +প্রাণী, +মনুষ্য, —পুং]

'ভালোবাস' : [+ক্রিমূ, +সকর্মক, + . .]

'এক' : [+সংখ্যা, +একবচন, + . .]

'টি' : [+অনু, —সম্মান, + . .]

'কে' : [+বিভ, +কর্ম, + . .]

'এ' [+ক্রিস, +সরল, +তৃপু, —সম্মান]

(১০১)-এর মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সূত্রসমূহ 'ছেলোটি একটি মেয়েকে ভালোবাসে' বাক্যটি সৃষ্টির জন্যে রচনা করবে (১০৪)-এর এন্ট্রিসমূহের সংলগ্ন মিশ্র-প্রতীক ((১০১)-এ শুধু 'মিপ্র' সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এ-সূত্রসমূহকে নির্দেশ করতে হবে মিশ্রপ্রতীকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈশিষ্ট্য)। (৯৭) ও (১০১) সূত্রের সাহায্যে রচিত হবে (১০৫)-র উপান্তগ্রন্থিসম্বলিত পদচিত্র :

(১০৫)

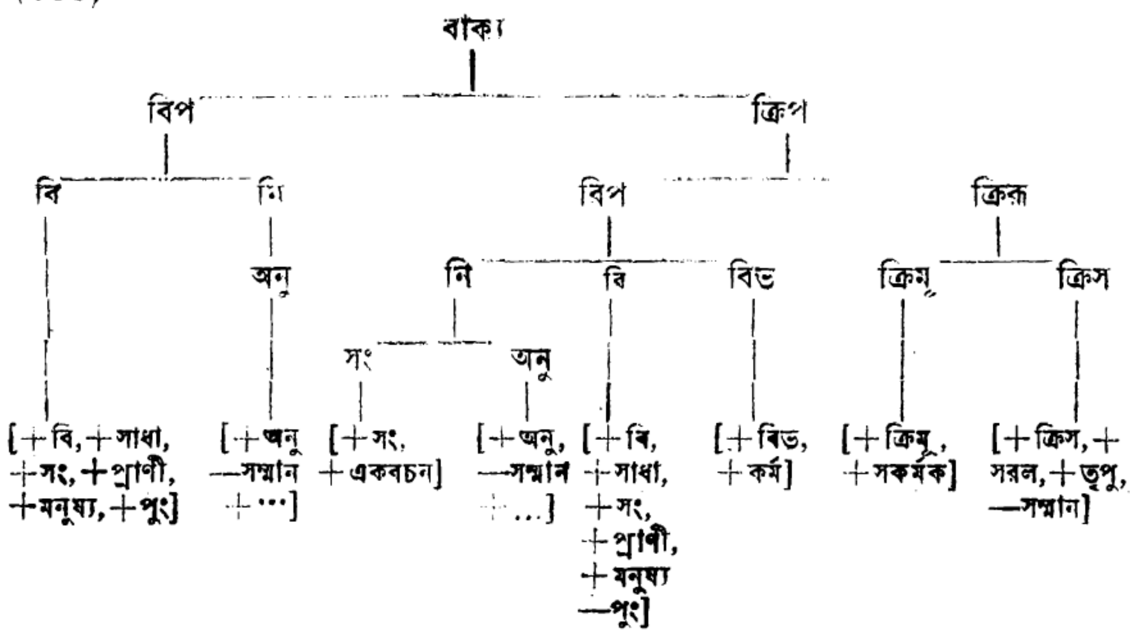

(১০৫)-পদচিত্রটিতে বিভিন্ন ক্যাটেগরির সাথে ঝুলছে বাক্যিক বৈশিষ্ট্যগুচ্ছ (মিশ্রপ্রতীক)। (১০৪)-অভিধানে আছে মিশ্রপ্রতীকসম্বলিত কয়েকটি শব্দের তালিকা। দেখা যাবে যে (১০৪)-এর 'ছেলে' শব্দের সাথে সংলগ্ন মিশ্রপ্রতীক ও (১০৫)-এর সর্ববামের 'বি'-র সাথে সংলগ্ন মিশ্রপ্রতীক অভিন্ন। সুতরাং 'বি'-র সাথে সংলগ্ন মিশ্রপ্রতীকের বদলে, চমস্কির মিশ্রপ্রতীক প্রতিকল্পন নীতি অনুসারে (ওপরে দ্রষ্টব্য), ব্যবহার করতে পারি 'ছেলে' শব্দটিকে। এ-ভাবে প্রতিকল্পিত করতে পারি (১০৫)-এর অন্যান্য মিশ্রপ্রতীক। এমন প্রতিকল্পনের ফলে (১০৫) পরিণত হবে (১০৬)-এতে :

(১০৬)

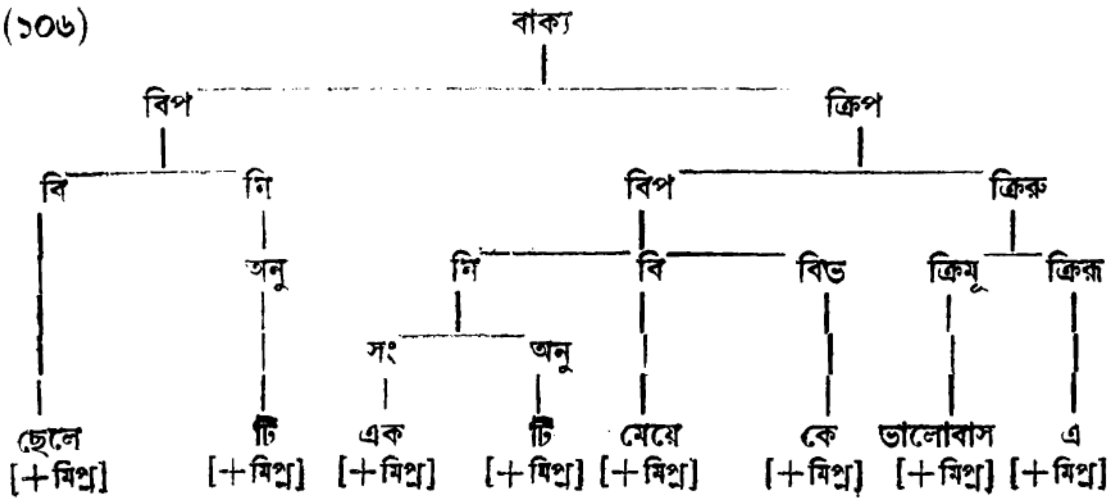

(১০৬)-এর শব্দসম্বলিত গ্রন্থিটি হচ্ছে অন্তগ্রন্থি, এবং (১০৬) একটি গভীর তল। এ-সংগঠনের ওপর প্রযুক্ত হবে রূপান্তর উপকক্ষের রূপান্তরসূত্র।

[খ] **'ডামি'-প্রতীক প্রতিকল্পন প্রণালি** : এ-প্রণালিটি গ্রহণ করলে ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষ সরল হ'য়ে ওঠে, কিন্তু অভিধানের দায়িত্ব বাড়ে অনেক গুণে। এ-প্রণালিটিকে গ্রহণ করলে ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষের রূপ বদলে যায়। এ-প্রণালিতে ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষ বিভক্ত দুটি উপকক্ষে : (ক) 'পদসাংগঠনিক উপকক্ষ' এবং (খ) 'আভিধানিক উপকক্ষ'। পদসাংগঠনিক উপকক্ষটি হচ্ছে একগুচ্ছ প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক সূত্রের সমষ্টি। মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সূত্র, যথাসম্ভব, পরিহার করা হয় পদসাংগঠনিক উপকক্ষ থেকে। তাই পদসাংগঠনিক সূত্রসমূহ পুনর্লিখনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করে 'বাক্য'কে—'উচ্চ ক্যাটেগরি পর্যন্ত—, এবং গঠন করে উপান্তগ্রন্থি। উচ্চ ক্যাটেগরি-গুলোকে মিশ্রপ্রতীক রূপে সম্প্রসারিত করা হয় না, সম্প্রসারিত করা হয় 'ডামি' প্রতীকরূপে (△) : এ-প্রতীকটি নির্দেশ করে বিভিন্ন ক্যাটেগরির অবস্থান। তাই এ-ব্যাকরণে (১০১)—এর মিশ্রপ্রতীকগঠনকারী সূত্রের বদলে ব্যবহার করা হয় (১০৭)-রূপী 'ডামি' প্রতীক নির্দেশক সূত্র :

(১০৭) ক বি → △

খ ক্রিমূ → △

গ সং → △

ঘ অনু → △

ঙ বিভ → △

চ ক্রিস → △

এ-ডামিপ্রতীকগুলো (△) বিভিন্ন পদ, বা ক্যাটেগরির অবস্থান নির্দেশ করে। (৯৭) ও (১০৭)-এর সূত্র প্রয়োগে পাওয়া যাবে ডামিপ্রতীকসম্বলিত উপান্তগ্রন্থি :

(১০৮)

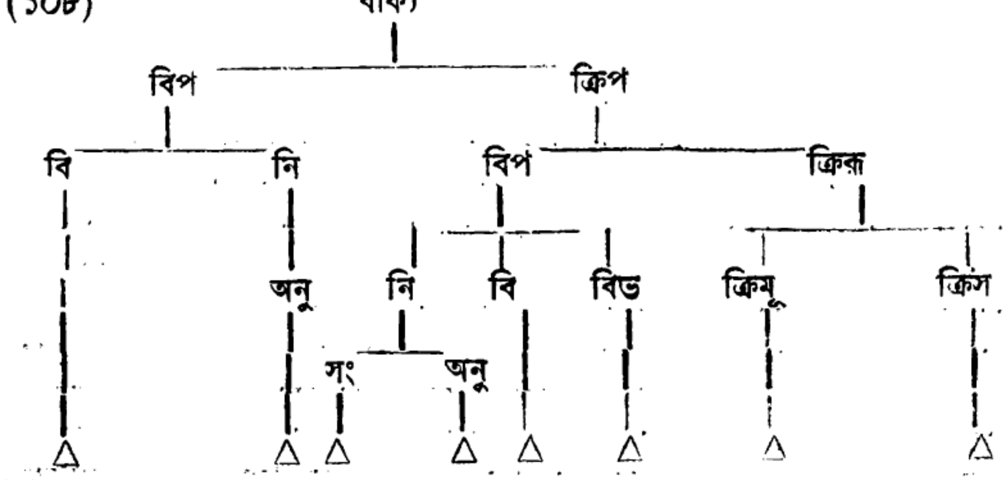

(১০৮)-এর ডামিপ্রতীকগুলো নির্দেশ করছে শূন্যস্থান, যেখানে ব্যবহৃত হ'তে পারে নানাবিধ শব্দ। অভিধান থেকে এ-শূন্যস্থানসমূহে সরবরাহ করতে হবে শব্দ; এবং গঠিত হবে অন্তগ্রন্থি (ও গভীর তল)। কিন্তু কি নীতি অনুসারে পদচিত্রে সরবরাহ করা হবে শব্দ ? এ-বিষয়ে চমস্কি-প্রস্তাবিত নীতি নিম্নরূপ (দ্র চমস্কি(১৯৬৫, ১২২))

> প্রতিটি শব্দ-এন্ট্রি হচ্ছে (ধ্ব, ব)—র যুগল, যেখানে 'ধ্ব' হচ্ছে ধ্বনি-তাত্ত্বিক ম্যাট্রিকস এবং 'ব' হচ্ছে মিশ্রপ্রতীক। মিশ্রপ্রতীক 'ব' বহন করে সমস্ত সহজাত বৈশিষ্ট্য ও প্রতিবেশিক বৈশিষ্ট্য। আমরা 'ব'—কে গ্রহণ করতে পারি বিশেষ একরকম প্রাতিকল্পনিক রূপান্তরের সাংগঠনিক বর্ণনা 'সাং-ব' রূপে। এ-রূপান্তর পদচিত্র 'প'-র অন্তর্গত যে-কোনো ডামিপ্রতীক △ —এর বদলে ব্যবহার করতে পারে (ধ্ব, ব), যদি পদচিত্র 'প' পূরণ করে 'ব'—র সাংগঠনিক বর্ণনাভুক্ত শর্তাবলি।

এ-নীতিঅনুসারে অভিধানে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি শব্দের সাথে যুক্ত থাকবে একটি ক'রে মিশ্রপ্রতীক, যাতে শব্দটির বাক্যিক, আর্থ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ দেয়া হবে, এবং সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হবে শব্দটি কি-রকম পদচিত্রের কোন স্থানে ব্যবহৃত হ'তে পারে (অর্থাৎ কি-রকম বাক্যের কোন স্থানে বসতে পারে)। প্রতিটি শব্দ বহন করবে সে-পদচিত্রের সাংগঠনিক বর্ণনা, যাতে শব্দটি ব্যবহৃত হ'তে পারে। যদি শব্দের মিশ্রপ্রতীকে নির্দেশিত সাংগঠনিক বর্ণনা, এবং ব্যাকরণ-সৃষ্ট কোনো পদচিত্রের সাংগঠনিক বর্ণনা অভিন্ন হয়, তবে শব্দটিকে, মিশ্রপ্রতীকে উল্লেখিত নির্দেশ অনুসারে, পদচিত্রের অন্তর্ভুক্ত যোগ্য ডামিপ্রতীকের △ বদলে ব্যবহার করা যাবে। এ-প্রণালিতে পদসাংগঠনিক কক্ষ সরল রূপ ধারণ করে, কিন্তু অভিধান বহন করে ব্যাপক দায়িত্ব। অভিধানে প্রতিটি শব্দের সমস্ত বাক্যিক, আর্থ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে হয়, এবং শব্দটি কোন প্রতিবেশে ব্যবহার যোগ্য, তাও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে হয়। এ-প্রণালি অনুসারে (১০৪)-অভিধানকে সরবরাহ করতে হবে সহজাত বৈশিষ্ট্যের সাথে সমস্ত প্রতিবেশিক বৈশিষ্ট্য। (১০৪) থেকে (১০৮)-এ শব্দসংক্রামের সময় বিচার করতে হবে কোন শব্দটি এ-পদচিত্রের কোন ডামিপ্রতীককে অপসারিত করতে পারে। দেখা যাবে (১০৮)-এর প্রথম 'বি'-র সাথে সংলগ্ন ডামিপ্রতীককে বদলানো সম্ভব 'ছেলে' দ্বারা, 'অনু' বদলানো সম্ভব 'টি' দ্বারা, 'সং' বদলানো সম্ভব 'এক' দ্বারা ইত্যাদি। এ-ভাবে △ প্রতিকল্পনের সাহায্যে রচিত হবে অন্তগ্রন্থিসম্বলিত পদচিত্র (১০৬)। সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণে এ-প্রণালিটি গৃহীত।

পদচিত্রের উপান্তগ্রন্থিতে শব্দসংক্রাম বিষয়ে নানা সমস্যা রয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে পদচিত্রের উপান্তগ্রন্থিতে কি একবারেই শব্দ সরবরাহ করা হবে, না বিভিন্ন রূপান্তর প্রয়োগের পরেও শব্দ সরবরাহ করা যাবে ? চমস্কি চান একবারে উপান্তগ্রন্থিতে সমস্ত শব্দ সরবরাহ করতে (যেমন : (১০৮)-এ, একবারে, প্রতিটি ডামিপ্রতীকের বদলে শব্দ বসিয়ে পাওয়া যায় (১০৬)), কিন্তু সাম্প্রতিক ব্যাকরণে পদচিত্রে একাধিকবার শব্দ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়। 'সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদী'রা চান অসংখ্যবার, প্রতিটি রূপান্তরের পরে, শব্দ সরবরাহ করতে, কিন্তু মধ্যপন্থীরা চান অন্তত দু'বার শব্দ সরবরাহ করতে (দ্র আজাদ (১৯৭৬))। তাই অভিধানকে ভাগ করা হয় দু'ভাগে : একভাগের শব্দ পদচিত্রে সরবরাহ করা হয় পদসাংগঠনিক সূত্র প্রয়োগের পরেই (এর নাম 'প্রথম শব্দসংক্রাম') ; এবং দ্বিতীয় ভাগের শব্দ সরবরাহ করা হয় সমস্ত রূপান্তরসূত্র

প্রয়োগের পরে ; এর নাম 'দ্বিতীয় শব্দসংক্রাম'। তবে এও দাবি করা হয় যে বাক্যের গভীর তলে শব্দসমূহ বাস্তব অবয়বে অবস্থান করে না, অবস্থান করে 'বৈশিষ্ট্যগুচ্ছ'-রূপে ; এবং সমস্ত রূপান্তর প্রয়োগের পর, বহির্তলে, তারা পরিগ্রহ করে বাস্তব রূপ।

১.৬.৯ আর্থকক্ষ

রূপান্তর ব্যাকরণের আর্থকক্ষ চমস্কির সৃষ্টি নয় ; এ-কক্ষ সৃষ্টি ও সংপ্রসারণের কৃতিত্ব অন্যদের। ''সিনট্যাক্টিক স্ট্রাকচার্স''-কাঠামোর ব্যাকরণের বাক্যিক কক্ষের সহায়ক কক্ষরূপে আর্থকক্ষের প্রস্তাব, সবার আগে, পেশ করেন ক্যাটজ ও ফোদোর (১৯৬৩)। তাঁরা বাক্যের অর্থ-নির্ণয়ের, বিশেষত দ্ব্যর্থতা নির্ণয়ের, কিছু কৌশলও বের করেন। রূপান্তর ব্যাকরণের অপরিহার্য অঙ্গরূপে আর্থকক্ষের প্রস্তাব দেন ক্যাটজ ও পোস্টাল (১৯৬৪), এবং তাঁদের প্রস্তাবানুসারে রূপান্তর ব্যাকরণ পরিগ্রহ করে নতুন—''আস্পেক্টস''-কাঠামোর—রূপ। রূপান্তর ব্যাকরণের আর্থকক্ষকে সুষ্ঠু ও শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন অন্যরা (দ্র উইনরাইখ (১৯৬৬), বিওয়াইরিশ (১৯৭০))। সাম্প্রতিক ভাষাবিজ্ঞানের একটি বড়ো সমস্যা হচ্ছে বাক্য ও অর্থের সম্পর্কের সমস্যা ; কোথায় যে এক কক্ষের সমাপ্তি এবং অন্য কক্ষের আরম্ভ তা নির্ণয় করা কঠিন। অর্থতত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার সুযোগ এখানে নেই, তাই নিচের পরিচ্ছেদাংশসমূহে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে (দ্র Φ ১'৬'৯'১–১'৬'১০)।

১'৬ ৯'১ আর্থজ্ঞান

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা অর্থতত্ত্বকে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার বিষয় ব'লে মনে করেন নি। ব্লুমফিল্ড মনে করতেন যে অর্থ নির্ণীত হয় সম্পূর্ণভাবে অভাষিক ব্যাপার দ্বারা; সুতরাং অর্থতত্ত্বকে বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্রে পরিণত করতে হ'লে, এবং তাকে ভাষা-বিজ্ঞানের অঙ্গরূপে গ্রহণ করতে হ'লে সমগ্র বিশ্বকে, প্রথমে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালিতে বর্ণনা করা দরকার। সাংগঠনিকেরা এ-ধারণা থেকে কখনো মুক্তি পান নি। চমস্কির সংগোপন মর্মে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রভাব সক্রিয়, তাই অর্থতত্ত্ব তাঁকে আকর্ষণ করে নি। তিনি রূপান্তর ব্যাকরণের ভাষ্যাত্মক কক্ষরূপে গ্রহণ করেছেন আর্থকক্ষকে, এবং এ-কক্ষের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন অন্যরা। 'অর্থের অর্থ কি?', বা 'অর্থ কি?'—এমন বড়ো প্রশ্নে না জড়িয়ে রূপান্তর-বাদীরা উত্থাপন করেছেন সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র প্রশ্ন, এবং চেষ্টা করেছেন তার উত্তর দিতে। তাঁরা বাক্যার্থ-নির্ণয়ের প্রণালি বের করতে চেয়েছেন, এবং জানতে চেয়েছেন—'সামর্থকতা কি?', 'দ্ব্যর্থতা কি?', 'স্ববিরোধিতা কি?', 'অসংগতি কি?', বা কাকে বলা যায় 'বিশ্লেষাত্মকতা', 'ব্যত্যয়' ইত্যাদি? এ-সব প্রশ্ন ভিত্তি ক'রে তাঁরা রচনা করতে চেয়েছেন যোগ্যতাসম্পন্ন অর্থতত্ত্ব।

১'৬'৯'২ শব্দের আর্থসংগঠন

রূপান্তরবাদীরা শব্দকে বিশ্লিষ্ট করেছেন বিভিন্ন আর্থ বৈশিষ্ট্যে, কেননা প্রতিটি শব্দ যে-অর্থ বহন করে, তা হচ্ছে একগুচ্ছ আর্থবৈশিষ্ট্যের সমষ্টি (দ্র Φ ১'৬'৬)। (১০৯)-এর বাক্যগুলো লক্ষণীয় :

(১০৯) ক 'কুমারী' হচ্ছে সাবালক, অবিবাহিত, স্ত্রীলিঙ্গবাচক, মনুষ্য।

খ *এ-গাভীটি কুমারী।

গ *ডক্টর হাসানের ছেলেটি কুমারী।

ঘ *ডক্টর হাসানের স্ত্রী কুমারী।

ঙ *হাসিনা বিবাহিত কুমারী।

চ *হাসিনা অবিবাহিত কুমারী।

(১০৯ক)-কে ধরতে পারি 'কুমারী' শব্দের আভিধানিক অর্থ ব'লে (এ-টি অবশ্য 'কুমারী' শব্দের অণুপুঙ্খ অর্থ নয়)। (১০৯ক) নির্দেশ করছে 'কুমারী' শব্দের চারটি সহজাত 'বৈশিষ্ট্য' : 'সাবালক', 'অবিবাহিত', 'স্ত্রীলিঙ্গবাচক', এবং 'মনুষ্য'। এ-বৈশিষ্ট্যরাশি ইংগিত করছে যে 'কুমারী' শব্দের অর্থ কোনো অবিভাজ্য ব্যাপার নয়। এ-শব্দটির অর্থ চারটি 'আর্থবৈশিষ্ট্য'-এর ('সাবালক', 'অবিবাহিত', 'স্ত্রীলিঙ্গবাচক', 'মনুষ্য') সমষ্টি। এ-ভাবে (১০৯খ-চ)-র অন্যান্য শব্দের অর্থও বিশ্লেষ্ট করা যায় বিভিন্ন 'আর্থবৈশিষ্ট্য'-এ, এবং তার সাহায্যে (১০৯খ-চ)-বাক্যসমূহের কিম্ভুতত্বের প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। (১০৯খ)-র কর্তা-বিশেষ্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে [--মনুষ্য], এবং বিধেয়-বিশেষ্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে [+মনুষ্য]; এবং কর্তা-বিশেষ্য ও বিধেয়-বিশেষ্যের [--মনুষ্য] ও [+মনুষ্য] বৈশিষ্ট্যের বিরোধিতায় বাক্যটি কিম্ভুত অর্থ ধারণ করেছে। (১০৯গ)-বাক্যের কিম্ভুতত্বের জন্যে দায়ী [+পুং] ও [--পুং] বৈশিষ্ট্যের বিরোধিতা; (১০৯ঘ)--র স্ববিরোধিতার জন্যে দায়ী (+বিবাহিত] ও [--বিবাহিত] বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধতা; (১০৯ঙ)-র স্ববিরোধিতার জন্যে দায়ী [+ বিবাহিত] ও [--বিবাহিত] বৈশিষ্ট্যের বিরোধিতা, এবং (১০৯চ)-র বাহুল্যের জন্যে দায়ী [--বিবাহিত] ও [--বিবাহিত] বৈশিষ্ট্যের একত্র সমাবেশ।

বিভিন্ন এককে 'বৈশিষ্ট্য'-এ ভাঙলে সুফল পাওয়া যায় প্রচুর : তাই রূপান্তর ব্যাকরণ ধ্বনিতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব সর্বত্র বিভিন্ন একককে ক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্যে ভাঙার পক্ষপাতী। নিচের 'আর্থবৈশিষ্ট্য-ম্যাট্রিকস'টি লক্ষণীয় (এতে × = 'বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত'; o = 'বৈশিষ্ট্যটি অনির্দেশিত'; +/-- = 'দ্বিমুখি বৈশিষ্ট্য নির্দেশক' (অর্থাৎ + পুং = 'পুরুষ', --পুং = 'স্ত্রী') : এবং ∫ = 'বাহুল্য বৈশিষ্ট্য' (যা অন্য বৈশিষ্ট্যের দ্বারা জ্ঞাপন করা যায়)) :

(১১০)

	অশ্ব	গবাদি	মনুষ্য	পুং	সাবালক
ঘোড়া	×	∫	∫	o	o
গাভী	∫	×	∫	--	+
ষাঁড়	∫	×	∫	+	+
মানুষ	∫	∫	+	o	o
পুরুষ	∫	∫	+	+	+
মহিলা	∫	∫	+	--	+
ছেলে	∫	∫	+	+	o
মেয়ে	∫	∫	+	--	o
শিশু	∫	∫	+	o	--

(১১০)-র ম্যাট্রিকসটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে যে আর্থবৈশিষ্ট্যভিত্তিক অর্থ-বিশ্লেষণ 'পরিমিতি নীতি'-র উজ্জ্বল নিদর্শন : ওপরে নটি শব্দ বিশ্লেষণ করা হয়েছে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ভিত্তি ক'রে। এদের মধ্যে আবার তিনটি বৈশিষ্ট্য পালন করছে প্রধান ভূমিকা, এবং তাদের সহায়তায় যে-কোনো শব্দকে অন্য শব্দ থেকে পৃথক ব'লে নির্দেশ করা সম্ভব হচ্ছে। এ-প্রণালিতে 'তির্যক-শ্রেণীকরণ'ও সহজ : বিভিন্ন শব্দের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখানো যায়। যেমন : 'গাভী' ও 'ষাঁড়'-এর পার্থক্য কেবল [±পুং]--ঘটিত, এবং 'পুরুষ' ও 'মহিলা'-র পার্থক্য কেবল [±পুং]-ঘটিত. এবং 'গাভী' ও 'মহিলা'-র পার্থক্য [×গবাদি, + মনুষ্য]-ঘটিত।

আর্থ বৈশিষ্ট্যরাশিকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, নির্দেশ করা সম্ভব 'দ্বিমুখি বৈপরীত্য' নীতির সাহায্যে। তাই 'ছেলে' ও 'মেয়ে'-র পার্থক্য নির্দেশ করা যায় শুধু [+পুং] ও [--পুং] বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্যসূত্রে। তবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে, দ্বিমুখি-বৈপরীত্য নীতি বিশেষ সাহায্য করতে পারে না। যেমন : 'আয়তন' বোঝানোর জন্যে দরকার হয়, কম পক্ষে, তিন রকম বৈশিষ্ট্য ['দৈর্ঘ, প্রস্থ, বেধ'] ; এবং দেখা যায় যে অনেক বৈশিষ্ট্য পরস্পরের সাথে জড়িত 'সাম্পর্কিক' সূত্রে। 'বোন' শব্দটির আর্থসংগঠন নির্দেশের জন্যে [+মনুষ্য,--পুং, ○ সাবালক] বৈশিষ্ট্যগুলোই যথেষ্ট নয়, এটির আর্থসংগঠন নির্দেশের জন্যে দরকার হবে এ-রকম সাম্পর্কিক বৈশিষ্ট্য : ['ক' সন্তান 'খ'-র] (দ্র বিওয়াইরিশ (১৯৭০)) ।

যোগ্যতাসম্পন্ন একটি আর্থতত্ত্ব কতগুলো 'আর্থবৈশিষ্ট্য' ব্যবহার করবে (দ্র ক্যাটজ (১৯৭২)) ? একটি যোগ্যতাসম্পন্ন 'আর্থতত্ত্ব কাঠামো' রচনার জন্যে সম্ভবত নিম্নের বৈশিষ্ট্যরাশিকে গ্রহণ করতে হবে :

(১১১) [±মনুষ্য, ±সাবালক, ±পদার্থ, ±বস্তু, ±নির্মিত বস্তু]

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যরাশি ব্যবহার করতে হয় 'ছেলে', 'মেয়ে', 'পুরুষ', 'নারী', 'জন্তু', 'চেয়ার', 'পাথর', 'স্বপ্ন' প্রভৃতি শব্দের আর্থ স্বাতন্ত্র্য নির্দেশের জন্যে। (১১১)-তে যে-বৈশিষ্ট্যতালিকা দেয়া হয়েছে, তা সুশৃঙ্খল, বা ক্রমবিন্যস্ত নয়। কিন্তু সামান্য অভিনিবেশে বোঝা যায় যে এ-বৈশিষ্ট্যরাশির কোনোকোনোটি, সংগত-বা যুক্তিগত-ভাবে নির্দেশ করে অন্য এক, বা একাধিক বৈশিষ্ট্য। যেমন বাক্যিক বৈশিষ্ট্যের বেলায়, তেমনি আর্থ বৈশিষ্ট্যের বেলায়ও এ-রকম যুক্তিগত নির্দেশন, সহজভাবে প্রকাশ করা যায় নিম্নরূপ 'বাহুল্য সূত্রে'র সাহায্যে (দ্র Φ ১'৬'৬) :

(১১২) ক [±মনুষ্য] → [+ প্রাণীবাচক, + পদার্থ, + বস্তু, ± মনুষ্য]

খ [±সাবালক] → [+ প্রাণীবাচক, + পদার্থ, + বস্তু, ± সাবালক]

গ [±পুং] → [+প্রাণীবাচক, +পদার্থ, +বস্তু, ±পুং]

ঘ [±নির্মিত বস্তু] → [−প্রাণী, +পদার্থ, +বস্তু, ±নির্মিত বস্তু]

ঙ [±প্রাণীবাচক] → [+পদার্থ, +বস্তু, ±প্রাণীবাচক]

চ [±পদার্থ] → [+বস্তু, ±পদার্থ]

(১১২)-র সূত্রসমূহের বক্তব্য উপস্থাপিত করা যায় (১১৩)-রূপী চিত্রে, এবং সুস্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব বৈশিষ্ট্যসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক :

(১১৩)

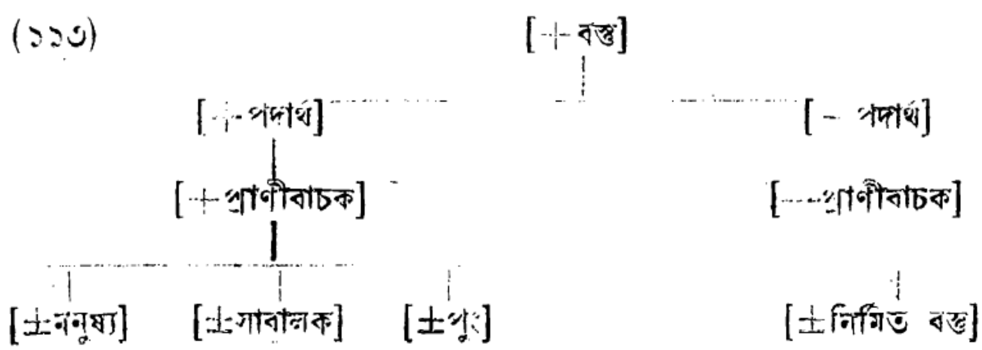

লক্ষণীয় যে (১১৩)-চিত্রের অন্তগ্রন্থির বৈশিষ্ট্যসমূহ (১১২)-র কোনো সূত্রে তীরের **ডান** দিকে উপস্থিত হয় না (শুধু যখন তা কোনো সূত্রে তীরের বাঁয়ে বসে, সে-সূত্রেই শুধু তীরের ডানে বসে, অন্য কোনো সূত্রে তীরের ডানে বসে না) : এ-বৈশিষ্টসমূহ 'তির্যক-বৈশিষ্ট্য', এবং, সুতরাং, তাদের কোনো সাধারণ সূত্রের সাহায্যে যৌক্তিক প্রণালিতে নির্দেশ করা যায় না। অন্যদিকে, [+বস্তু] বৈশিষ্ট্যটি কোনো সূত্রে তীরের বাঁয়ে বসেনি : এটি হচ্ছে (১১২)-র বৈশিষ্ট্যপুঞ্জের মধ্যে বিমূর্ততম বৈশিষ্ট্য। অন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ এ-টির সাথে 'স্তরক্রমিকভাবে' অন্বিত। [±প্রাণীবাচক] বৈশিষ্ট্যটি যুগপৎ তির্যক ও স্তরক্রমিক।

রূপান্তর ব্যাকরণে ভাষার শব্দরাজির আর্থসংগঠন নির্দেশ করা হয় বিভিন্ন আর্থ বৈশিষ্ট্যের সহায়তায়। এতে জটিলতা প্রচুর (ভাষা খুব সরল ব্যাপার নয়)। প্রশ্ন সহজেই উঠবে যে কোনো ভাষার সমগ্র শব্দভাণ্ডারের আর্থসংগঠন বর্ণনার জন্যে কতো-গুলো, এবং কি-কি বৈশিষ্ট্য দরকার ? এ-প্রশ্নের উত্তর দেয়া এ-রচনায় অসম্ভব (দ্র ক্যাটজ ও ফোদোর (১৯৬৩), উইনরাইস (১৯৬৬), বিওয়াইরিশ (১৯৭০), লিস (১৯৭৪), ল্যাংগেনডোয়েন (১৯৬৯), ক্যাটজ (১৯৭২))।

১.৬.৯.৩ আর্থ ও বাস্তব জ্ঞান

''আস্পেকটস''-কাঠামোর ব্যাকরণের সাথে সংলগ্ন 'আর্থতত্ত্ব-কাঠামো'-কে বলা যায় 'সমবায়ী কাঠামো' : পদচিত্রের বিভিন্ন ভাষাবস্তুর সমবায়ে সুস্পষ্ট সূত্রের সাহায্যে কি-ভাবে 'অর্থগতভাবে সুগঠিত' বাক্য সৃষ্টি করা যায়, তা ব্যাখ্যা করা এ-তত্ত্বের লক্ষ্য। এ-আর্থতত্ত্ব আমাদের ঠেলে দেয় একটি প্রশ্নের মুখোমুখি : 'আর্থজ্ঞান' ও 'বাস্তব (জাগতিক) জ্ঞান'-এর মধ্যে কোনখানে টানা যায় সুস্পষ্ট সীমারেখা ? নিচের বাক্যগুলো বিবেচ্য :

(১১৪) ক এ-গাধাটি সমরশাস্ত্রবিদ।

খ টাইপরাইটারটি ধ্রুপদী নর্তকী।

গ তোমার লাল পেনসিলটি গর্ভবতী।

(১১৪)-র বাক্য তিনটি আন্তরবিরোধগ্রস্ত। 'গাধা'-র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে [—মনুষ্য], 'সমরশাস্ত্রবিদ'-এর বৈশিষ্ট্য, সম্ভবত, [+মনুষ্য]; 'টাইপরাইটার'-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে [—প্রাণী], 'নর্তকী'-র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে [+মনুষ্য]; 'পেনসিল'-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে [—প্রাণী], আর 'গর্ভবতী'-র বৈশিষ্ট্য [—পুং]। এবার লক্ষণীয় (১১৫)-এর বাক্য তিনটি :

(১১৫) ক মেজর রহমান স্বপ্ন দেখেছেন যে এ-গাধাটি সমরশাস্ত্রবিদ।

খ আমি মনে করি যে টাইপরাইটারটি শুধু ধ্রুপদী নর্তকীই নয়, খাসা রাজনীতিবিদও।

গ কল্পনা করো যে তোমার লাল পেনসিলটি গর্ভবতী।

(১১৫)-র বাক্যগুলো (১১৪)-র বাক্যগুলোর মতো অতো উদ্ভট নয়; কেননা (১১৫)-তে (১১৪)-র বাক্যগুলোকে গেঁথে দেয়া হয়েছে 'কল্পজগত-রচয়িতা' ক্রিয়া 'স্বপ্ন দেখ', 'মনে কর', 'কল্পনা কর' ইত্যাদির সাথে। তাই আর্থতত্ত্বকে হ'তে হবে সে-শক্তিসম্পন্ন, যা বাস্তব, পরাবাস্তব, বা বাস্তব-পরাবাস্তব ইত্যাদি জগতের জন্যে সম্ভবপর বাক্যার্থ নির্ণয় করতে পারে, এবং তাদের 'সত্যতা', বা 'তাৎপর্যপূর্ণতা', নির্দেশ করতে পারে। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(১১৬) ক ডক্টর হাসান বাঙলাদেশের রাষ্ট্রপতি।

খ দুয়ে-দুয়ে পাঁচ।

এ-বাক্য দুটিতে কোনো আর্থ ত্রুটি নেই, আছে বাস্তব সত্যের বিরোধিতা। 'ডক্টর হাসান' বাঙলাদেশের রাষ্ট্রপতি কি-না, তা জানার দরকার আর্থতত্ত্বের নেই; তেমনি নির্ভুল যোগ অঙ্ক শেখার দায়িত্বও নেই আর্থতত্ত্বের। এ-টি জাগতিক জ্ঞানের অধীন, ভাষার অধীন নয়। যদিও তাৎপর্যপূর্ণ ভাষাব্যবহারের জন্যে দরকার ব্যাপক বাস্তব জ্ঞান, তবে বাস্তব জ্ঞান অপরিহার্য নয়। যদি বাস্তব জ্ঞান অপরিহার্য হতো, তবে সমগ্র জাগতিক জ্ঞানার্জনের আগে ভাষা ব্যবহারের অধিকার কেউ পেতো না।

১.৬.৯.৪ প্রজেকশন সূত্রাবলি

Φ ১.৬.৮ পরিচ্ছেদাংশে অভিধান থেকে পদচিত্রে দু'রকম প্রণালিতে—মিশ্রপ্রতীক প্রতিকল্পন ও 'ডামি'-প্রতীক প্রতিকল্পন—শব্দসংক্রামের কৌশল আলোচনা করা হয়েছে। মনে করা যাক, আমরা গ্রহণ করেছি শব্দসংক্রামের দ্বিতীয় প্রণালিটি। এ-প্রণালিতে পদচিত্রের △-প্রতীককে প্রতিকল্পিত করা হয় অভিধানের শব্দসংলগ্ন মিশ্রপ্রতীকের সাংগঠনিক বর্ণনা অনুসারে। ধরা যাক যে 'সংগতিসূত্র' (দ্র *Φ* ১.৬.৬ ; *Φ* ১.৬.৯.৫) আর্থ, তাই ক্যাটেগরি-প্রতীকের নিচে, সংগতিসূত্র বিবেচনা না ক'রেই, সরবরাহ করা যায় বিভিন্ন শব্দ। ক্যাটজ ও ফোদোর (১৯৬৩), এবং ক্যাটজ ও পোস্টাল (১৯৬৪) প্রস্তাব করেছিলেন এক-শ্রেণীর 'আর্থ প্রজেকশন সূত্র' যার সাহায্যে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহের আর্থসংগঠন ও পদচিত্রের (গভীর তলের) বাক্যিক সংগঠনের সংশ্লেষ সাধন ক'রে নির্ধারণ করা যায় বাক্যার্থ। (১১৭)-র বিমূর্ত পদচিত্রটি অবলম্বন ক'রে বর্ণনা করা যাক 'প্রজেকশন সূত্রে'র প্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপ। (১১৭)-র ব্যঞ্জনবর্ণগুলোকে মনে করতে হবে 'বাক্যিক ক্যাটেগরি', এবং স্বরবর্ণগুলোকে বিবেচনা করতে হবে 'আর্থবৈশিষ্ট্যগুচ্ছ', বা 'আর্থ-মিশ্রপ্রতীক' ব'লে। ধ'রে নিতে হবে যে 'অ-আ-ই-ঈ-উ'-কে পদচিত্রে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে তাদের বাক্যিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে। আর্থ প্রজেকশন সূত্রাবলির কাজ শুরু হয় পদচিত্রের

(১১৭)

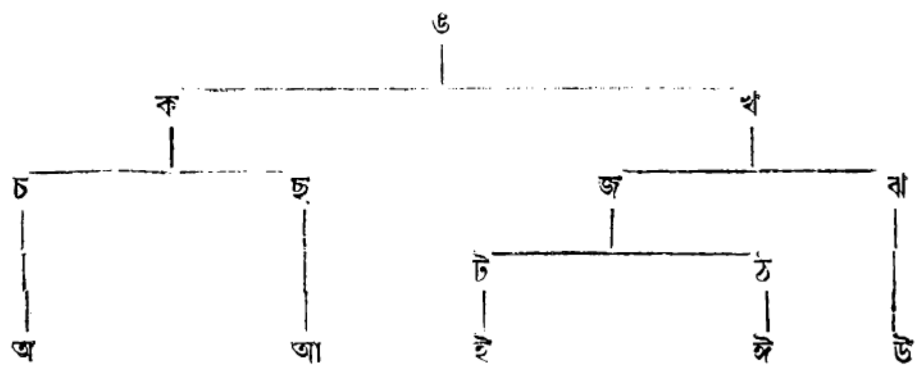

নিম্নতম বৃন্তে, এবং ক্রমশ ওঠে উচ্চতম বৃন্তে। (১১৭)-তে প্রজেকশন সূত্র ('? প্রক্ষেপণ সূত্র') প্রথমে কাজ শুরু করবে 'চ-ছ', ও 'ট-ঠ' বৃন্তে। 'চ-ছ' যে-আর্থবৈশিষ্ট্যের ওপর প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করছে, তাদের প্রক্ষেপ ও মেশানো হবে 'ক'-বৃন্তে (অর্থাৎ ক=চ (অ)+ছ (আ))। 'ট-ঠ' যে-আর্থবৈশিষ্ট্যের ওপর প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করছে, তাদের প্রক্ষেপ করা ও মেশানো হবে 'জ'-বৃন্তে (অর্থাৎ জ=ট (ই)+ঠ (ঈ))। এর ফলে পাওয়া যাচ্ছে 'ক', এবং 'জ'-র 'আহরিত অর্থ'। এর পর 'জ' ও 'ঝ' যে-আর্থবৈশিষ্ট্যের ওপর প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করছে, তাদের প্রক্ষেপ করা হবে ও মেশানো হবে 'খ'-বৃন্তে (অর্থাৎ খ=জ ((ট (ই))+(ঠ (ঈ)))+ঝ (উ)))। শেষে 'ক', ও 'খ'-র আহরিত অর্থকে প্রক্ষেপ করা ও মেশানো হবে সর্বোচ্চ বৃন্ত 'ঙ'-তে; এবং পাওয়া যাবে বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ (অর্থাৎ ঙ=ক+খ)। যে-প্রক্রিয়ায় (১১৭)-র অর্থ আহরণ করা হলো, তাকে বলা হবে (১১৭)-এর 'আর্থ উপস্থাপন'। কোনো বৃন্তে পৌঁছে যদি দেখা যায় যে বাক্যের সংগতি বিনষ্ট হচ্ছে, তখন বাক্যের অর্থ-আহরণপ্রক্রিয়া বন্ধ হয়। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(১১৮) ক আমি একটি নর্তকীকে পড়ছি।

খ কবিতাটি আমাকে খুন করেছে।

(১১৮ক)-তে 'বিপ' হচ্ছে 'আমি', আর 'ক্রিপ' হচ্ছে 'একটি নর্তকীকে পড়ছি'। এ-বাক্যে ক্রিয়াপদের অর্থ আহরণ করতে গেলেই দেখা যাবে সংগতি বিপন্ন হ'য়ে গেছে। 'একটি নর্তকীকে' সুগঠিত বাক্যিক ও আর্থ মানদণ্ডে, এবং 'পড়ছি'ও সুগঠিত; কিন্তু 'একটি নর্তকীকে' এবং 'পড়ছি'-র অর্থ মেশাতে গেলে দেখা যাবে ক্রিয়াপদটি আর্থ নীতি বিনষ্ট করেছে। 'পড়' ক্রিয়ামূলের সাথে ব্যবহৃত হ'তে পারে 'বই', 'কবিতা', 'গল্প' প্রভৃতি পাঠযোগ্য বিশেষ্য, কিন্তু এখানে অপাঠ্য বিশেষ্য ব্যবহারের ফলে বাক্যটি অর্থগতভাবে অস্বাভাবিক। তাই একে, গ্রহণ করার জন্যে, দিতে হবে সম্প্রসারিত ও আলঙ্কারিক ব্যাখ্যা। (১১৮)-তে ক্রিয়াপদটি 'আমাকে খুন করেছে' সুগঠিত বাক্যিক ও আর্থ মানদণ্ডে, কিন্তু বাক্যের কর্তা-বিশেষ্যপদের অর্থের সাথে ক্রিয়াপদের অর্থ মেশাতে গেলে ধরা পড়বে যে বাক্যটি আর্থরীতি বিরোধী। 'খুন কর' ক্রিয়ার সাথে দরকার [+মনুষ্য] বিশেষ্য, কিন্তু এতে আছে [—প্রাণীবাচক, ±বিমূর্ত] বিশেষ্য; তাই ঘটেছে আর্থ বিপত্তি।

১.৬.৯.৫ সিলেকশনাল রেস্ট্রিকশন : সংগতিবিধি

চমস্কির মতে (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ১১৩-১২০, ১৫৩-১৬৩) বাক্যের (আর্থ) সংগতি রক্ষা করা ব্যাকরণের বাক্যিক কক্ষের দায়িত্ব। চমস্কি বাক্যের সংগতি সম্পর্কে যে-মত পোষণ করতেন "সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচারস" (১৯৫৭) গ্রন্থে, তার সম্পূর্ণ বিপরীত মতে উপনীত হন তিনি "আস্পেকটস অফ দি থিওরি অফ সিনট্যাকস" (১৯৬৫) গ্রন্থে। ১৯৫৭-তে তিনি (১১৯)-এর বাক্য দুটিকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাকরণসম্মত মনে করেছেন, কিন্তু তাঁর ১৯৬৫-র মানদণ্ডে এ-বাক্য দুটি ব্যাকরণবিরোধী (বাক্য দুটি চমস্কির ইংরেজি বাক্যের নিষ্প্রভ বাঙলা অনুবাদ : এর মধ্যে প্রথম বাক্যটি বিশ্বজোড়া খ্যাতি আয় করেছে (দ্র চমস্কি (১৯৫৭, ১৫ : ১৯৬৫, ১৫৭)) :

(১১৯) ক রঙহীন সবুজ ভাবনাগুলো প্রচণ্ডভাবে ঘুমোচ্ছে।

খ জন আন্তরিকতাকে সন্ত্রস্ত করেছে।

তিনি মনে করেন যে এমন বিসংগত বাক্য সৃষ্টি বন্ধ করা ব্যাকরণের দায়িত্ব ; এবং তিনি এমন বাক্য সৃষ্টি রোধ করার বেশ জটিল প্রক্রিয়াও নির্দেশ করেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে চমস্কির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে উঠেছে প্রবল আপত্তি; এবং প্রায় সবাই মেনে নিয়েছে যে বিসংগত বাক্য যেহেতু ব্যাকরণগতভাবে সুষ্ঠু, তাই এমন বাক্য ব্যাকরণ অবশ্যই সৃষ্টি করবে। ব্যাকরণের আর্থ কক্ষ বিবেচনা করবে বিসংগতির প্রকৃতি ও মাত্রা। নিচের বাক্য দুটি লক্ষণীয় :

(১২০) ক হাসান স্বপ্ন দেখেছে যে শহীদ মিনার শ্লোগান দিচ্ছে।

খ হাসিনা মনে করে যে পরমাণুদের লাল ওষ্ঠ আছে।

"আস্পেকটস"-কাঠামোর ব্যাকরণ কিছুতেই উল্লিখিত বাক্য দুটির অন্তর্গত গ্রথিত বাক্য দুটি ('শহীদ মিনার শ্লোগান দিচ্ছে', 'পরমাণুদের লাল ওষ্ঠ আছে') সৃষ্টি করবে,

না। অভিধানে 'শহীদ মিনার' শব্দটির সাথে যে-মিশ্রপ্রতীক থাকবে, তাতে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ থাকবে যে এর সাথে 'শ্লোগান দে' ক্রিয়া বসতে পারবে না ; কেননা 'শহীদ মিনার'--এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে [--প্রাণী], এবং 'শ্লোগান দে'-র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে [+মনুষ্য]। এমন সংগতিসূত্রের সাহায্যে রোধ করা হবে 'পরমাণুদের লাল ওষ্ঠ আছে' বাক্যটি। কিন্তু (১২০)-এ দেখছি যে 'কল্পজগত-রচয়িতা' ক্রিয়ার সাথে বেশ স্বাভাবিকভাবেই 'শহীদ মিনার শ্লোগান দিচ্ছে' জাতীয় বিসংগত বাক্য ব্যবহার করা যায় (স্বপ্নের ওপর হাত আছে কার ? মনে করতেও বাধা কি ?)। তাই দাবি করতে পারি যে বিসংগত বাক্য ব্যাকরণ সৃষ্টি করবে অবশ্যই, এবং তার বিসংগতির প্রকৃতি ও মাত্রা পরিমাপ করবে ব্যাকরণের আর্থকক্ষ।

চমস্কি যে-প্রক্রিয়ায় বিসংগত বাক্য রোধ করতে চান, সে-প্রক্রিয়াও সুষ্ঠু নয়। তাঁর মতে সংগতি রক্ষা করতে হবে বিভিন্ন শব্দের মধ্যে ; যেমন বাক্যে ব্যবহৃত 'বিশেষ্য' ও 'ক্রিয়া'-র মধ্যে। কিন্তু দেখা যায় যে এ-সংগতি নীতি বিশেষ শব্দকে অতিক্রম ক'রে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র পদের মধ্যে। (১২১)-এর বাক্য দুটি বিবেচ্য :

(১২১) ক আমাদের প্রধান মন্ত্রী তিন সন্তানের পিতা।

খ আমাদের প্রধান মন্ত্রী, যিনি অত্যন্ত রূপসী, তিন সন্তানের পিতা।

প্রথম বাক্যটি অর্থগতভাবে সংগত ; কেননা 'মন্ত্রী' ও 'পিতা'-র মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্যগত বিসংগতি নেই। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটি বিসংগত, যদিও এখানে 'মন্ত্রী' ও 'পিতা'-র মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বিরোধ বেঁধেছে সম্বন্ধাত্মক বাক্যের ('যিনি অত্যন্ত রূপসী') স্ত্রীলিঙ্গসূচক বিশেষণটির উপস্থিতিতে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে সংগতি কেবল দুটি শব্দের মধ্যে রক্ষিত হ'লেই চলে না, তা রক্ষা করতে হয় আরো বড়ো এককের মধ্যে। (১২১খ)-তে সংগতি থাকা দরকার 'আমাদের প্রধান মন্ত্রী, যিনি অত্যন্ত রূপসী' এবং 'পিতা'-র মধ্যে। নিচের বাক্যগুলো লক্ষণীয় :

(১২২) ক ভালোবাসা আণবিক শক্তিচালিত সবুজ সাবমেরিন।

খ তিন শোক আগে আমি তোমাকে দেখেছিলাম।

গ হাসান বিশ্বাস করে যে স্বপ্ন হচ্ছে হলদে রঙের ছোটো পাখি, যা কলাভবনের সিঁড়ি দিয়ে প্রত্যেক দিন ওঠা-নামা করে।

এমন বিসংগত বাক্য, আমার ধারণা ব্যাকরণ অবশ্যই সৃষ্টি করবে, কিন্তু তা বিচারের ভার থাকবে ব্যাকরণের আর্থকক্ষের ওপর। ভাষা কেবল বাস্তব ও সুসংগত কথা প্রকাশের মাধ্যম নয়, তা অবাস্তব ও বিসংগতকেও প্রকাশ করে। আর সবাই যে অভিন্ন বাস্তবতার বসবাস করবে, তাও নয়। (১২২)-র মতো বাক্য যে বলে, তাকে ভাষা-সংশোধনের ক্লাশে পাঠানোর কোনো দরকার নেই, পাঠানো দরকার চেতনাচিকিৎসাশালায়।

১.৬.১০ শুদ্ধতার সূত্র : মাত্রা ও সীমা।

শুদ্ধতার সমস্যা ভাষাশাস্ত্রের সমান বয়সী। একরকম ঐশী শুদ্ধতার কামনায় প্রাচীন ভারতে উদ্ভূত হয়েছিলো ভাষাশাস্ত্র ('ব্যাকরণ' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'শুদ্ধ শব্দনির্মাণবিদ্যা

এবং পাশ্চাত্যেও ভাষাশাস্ত্র জন্মেছিলো শুদ্ধতাকাতরতা থেকে। পাশ্চাত্যের প্রথম ব্যাকরণের নাম ''গ্রাম্মাতিকি তেক্‌নি'', যার অর্থ হচ্ছে 'বর্ণকলা'। দিওনীসিউস থ্রাকস তাঁর ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন গ্রীক বর্ণমালার শুদ্ধ বিন্যাস শেখানোর জন্যে। প্রচলিত ব্যাকরণ ভাষার কথ্যরূপের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে লিখিত রূপের ওপর এবং লিখিত রূপকেই মনে করেছে শুদ্ধতর। দেশেদেশে, কালকালান্তরে, লিখিত ধ্রুপদী সাহিত্যের ভাষাকে মনে করা হয়েছে শুদ্ধতার 'মানরূপ'; এবং সাধারণ-অসাধারণ সব ভাষাভাষী শুদ্ধতার আদর্শ দেখার জন্যে তাকিয়েছে ধ্রুপদী সাহিত্যের ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাষার দিকে। এ-'ধ্রুপদী সাহিত্য ফ্যালাসি' দেখা গেছে পশ্চিমে-পুবে, অতীতে ও বর্তমানে: থ্রাকস-এর কাছে তাঁর সমকালীন আলেকজান্দ্রিয়ার লৌকিক কথ্যভাষার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট ও স্বর্গীয় মনে হয়েছে হোমারের ভাষাকে, সংস্কৃত ভাষাশাস্ত্রীগণ চারপাশের অপভ্রংশের অশ্লীল কোলাহলের চেয়ে অনেক বেশি শুদ্ধ (ও ঐশী) মনে করেছেন বৈদিক ভাষাকে। জনসন-এর কাছে উৎকৃষ্টতম ইংরেজির উদাহরণ হচ্ছে প্রাক-রেস্টোরেশন-যুগের সাহিত্যসম্রাটদের রচনা (স্যামুয়েল জনসন তাঁর ''অভিধানে'' লিখেছেন: 'আমি পরম আগ্রহে উদাহরণ আহরণের চেষ্টা করেছি রেস্টোরেশন-পূর্ব যুগের লেখকদের রচনা থেকে, যাঁদের রচনাবলিকে আমি মনে করি পরিশ্রুত ইংরেজির অমল উৎস, শুদ্ধশৈলীর অনিন্দ্য ঝর্না।'), আমাদের অনেকের কাছে বিদ্যা-সাগরই শুদ্ধতার অবিচল মানরূপ। যাঁরা শুদ্ধতার অবিচল মানদণ্ডে বিশ্বাসী, তাঁরা অগ্রাহ্য করেন ভাষাপরিবর্তন প্রক্রিয়াকে। বিদ্যাসাগরের ভাষার সাথে যখন কোনো মিল পান না পানের দোকানির ভাষার, যখন রবীন্দ্রনাথের ভাষার সাথে বিশাল বৈসাদৃশ্য দেখতে পান বিশ্ববিদ্যালয়ের হিশাবসংরক্ষণশাস্ত্রের অধ্যাপকের, তখন তাঁরা দ্বিতীয় জনের ভাষাকে 'অশুদ্ধ', 'হীন', 'প্রাকৃত', 'ভ্রষ্ট', 'ইতর' প্রভৃতি আখ্যা দেন। ইংরেজির ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক বেশ গুরুত্বপূর্ণ: এ-শতকে স্থির করা হ'তে থাকে ইংরেজির শুদ্ধ মান। তাঁরা চেয়েছিলেন ধ্রুপদী সাহিত্য ভিত্তি ক'রে শুদ্ধ ইংরেজির এক অবিচল পরম মান প্রতিষ্ঠা করতে। সুইফট-এর মতে ইংরেজি ভাষার মহান লেখকদের রচনাও পৃষ্ঠাপরম্পরায় অশুদ্ধ, ড্রাইডেন-এর মতে শুদ্ধ ইংরেজির পতন শুরু হয় চসার-উত্তর যুগে। পাদ্রী লোথ, যাঁর ব্যাকরণ ইংরেজি ভাষাকে সারা আঠারো শতকব্যাপী শাসন করেছে, ইংরেজিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন পুরোহিতের মতো: ইংরেজি ভাষা তাঁর বহুদীক্ষা আজো চিত্তে ও শরীরে বহন করছে। আমাদের অঞ্চলে শুদ্ধতার ঐশী ঝোঁক বেশ প্রবল। এ-দেশে ধর্মাঙ্গরূপে ভাষাশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিলো, তাই অনেকে ধর্মীয় উৎসাহে শুদ্ধতার বিগত মান অবিচল রাখতে চান। তবে আমাদের শুদ্ধতাবোধ, প্রধানত ও সাধারণত, রূপতত্ত্ব ও উচ্চারণতত্ত্ব নির্ভর। তবে শুদ্ধতার সমস্যাটি বেশ ব্যাপক ও জটিল: এক পণ্ডিত কর্তৃক আরেক পণ্ডিতের ভাষা সংশোধনে তা সমাপ্ত হয় না।

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা অনুশাসন ও ধ্রুপদী বিশুদ্ধতার বিরোধী। তাঁরা ভাষার কথ্যরূপকে প্রধান রূপ বলে গ্রহণ করেছিলেন; এবং 'শুদ্ধতা'-কে তাঁরা বিজ্ঞানসম্মত ধারণা ব'লে মনে করতেন না। সামান্য অভিনিবেশে বোঝা যায় যে সাহিত্যের ভাষা চারপাশের অবিরাম উচ্চারিত ভাষার প্রতিনিধি নয়। ভাষাবিজ্ঞানী যখন কোনো ভাষা-অঞ্চলে যান, তখন তিনি মুখোমুখি হন একরাশ 'উপভাষা'-র প্রাকৃত কোলাহলের; খুঁজে পান তিনি আঞ্চলিক ভাষারীতি, শ্রেণীক ভাষারীতি, ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞদের পরিভাষাকীর্ণ ভাষারীতি। গৃহকর্তা যে-ভাষা ব্যবহার করেন, গৃহিণী অবিকল সে-ভাষা ব্যবহার করেন না; ঝি যে-ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে, ভৃত্য সে-ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করে না। এতো ভাষারীতির মধ্যে শুদ্ধ কোনটি, অশুদ্ধ কোনগুলো? তবে সব-ভাষারই পাওয়া যায় একটি 'মানরূপ', যা ব্যবহৃত হয় বিশেষ পরিস্থিতিতে। ওই রূপটি

একত্রে সংযুক্ত ক'রে রাখে বিভিন্ন 'উপভাষা' ব্যবহারকারী জনগণকে। অনেক সমাজে দ্বিভাষা-ত্রিভাষাও দেখা যায়, যাদের একএকটি ব্যবহৃত হয় একএক কাজে। কোনো দেশে, বা ভাষা-অঞ্চলে ব্যবহৃত 'মানভাষা-রূপ'টি কোনো আন্তর বা সহজাত গুণে অন্য রূপের চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়। নানা সামাজিক-আর্থ-রাষ্ট্রিক কারণে বিভিন্ন প্রতিযোগী 'উপভাষা'-র মধ্যে একটি প্রাধান্য পায়, এবং গৃহীত হয় 'মানভাষা-রূপ' রূপে। ওই মানভাষা-রূপটিকে ভাষাভাষীরা 'উন্নত', 'শুদ্ধ' ভাষারূপ ব'লে মনে করে। (১২৩)-এর উদাহরণগুলো লক্ষণীয় :

(১২৩) ক আমি যাচ্ছি।

খ আমি যাইতাছি।

গ আমি যাইতে আছি।

এ-বাক্য তিনটি সমার্থক, কিন্তু ভাষাবস্তুতে ভিন্ন। এদের মধ্যে কোনোটির এমন কোনো আন্তর, বা সহজাত গুণ নেই, যার ভিত্তিতে একটিকে নির্দেশ করা যায় অন্য দুটির চেয়ে শুদ্ধতর ব'লে। তবে সামাজিকভাবে (১২৩ক)-কে মনে করা হবে অধিকতর উন্নত, কেননা এ-বাক্যটি যে-ভাষারীতির অন্তর্গত, তা রাষ্ট্রিক কারণে অন্য বাক্য দুটির ভাষারীতি থেকে সামাজিকভাবে উন্নত ব'লে বিবেচিত, এবং মর্যাদামণ্ডিত।

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান উপাত্তনির্ভর ; কিন্তু উপাত্তচয়নের বিভিন্ন রাস্তা খোলা আছে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীর সামনে। তিনি তাঁর উপাত্ত থেকে বিশেষ সমাজ- বা শ্রেণী-নিয়ন্ত্রিত লক্ষণগুলোকে পরিত্যাগ ক'রে রচনা করতে পারেন কোনো ভাষার 'সাংগঠনিক ব্যাকরণ'; আবার তিনি উপাত্তকে বিশ্বস্তভাবে রক্ষা ক'রে রচনা করতে পারেন ভাষার 'ব্যবহারিক ব্যাকরণ'। 'ব্যবহারিক ব্যাকরণ' রচনার সময় তাঁকে সাহায্য নিতে হবে সমাজবিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্বের, এবং দেখাতে হবে বিশেষ কোনো প্রয়োগ কেনো অন্য কোনো প্রয়োগের থেকে সামাজিকভাবে উন্নত, বা উৎকৃষ্ট, বা মর্যাদামণ্ডিত ব'লে বিবেচিত। বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞান ও সমাজভাষাবিজ্ঞানের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত উপাত্ত আদর্শায়নের মাত্রার ওপর : প্রথমটি প্রাথমিক উপাত্তকে যে-পরিমাণে আদর্শায়িত করে—ভাষার ব্যাপক ও আদর্শ রূপকে ধারণ করার জন্যে—, সে-পরিমাণ আদর্শায়ন সমাজভাষাবিজ্ঞান কামনা করে না।

রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ সৃষ্টি করতে চায় ভাষার সমস্ত শুদ্ধ, এবং কেবল শুদ্ধ বাক্য। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণতত্ত্বের সাথে মিল আছে অষ্টাদশ শতকের ব্যাকরণতত্ত্বের : উভয়ই ভাষাকে মনে করে সূত্র-নিয়ন্ত্রিত ব্যাপার ব'লে, এবং উভয়তত্ত্বই, ব্যাকরণ রচনায়, ব্যবহার করে 'অবরোহী প্রণালি'। তবে রূপান্তর ব্যাকরণ, প্রচলিত ব্যাকরণের মতো, আনুশাসনিক নয় ;—ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধি নির্দেশ করা এ-ব্যাকরণের লক্ষ্য নয়। রূপান্তর ব্যাকরণের অধিকার রয়েছে, অন্য যে-কোনো শাস্ত্রের ন্যায়, উপাত্ত-আদর্শায়নের। রূপান্তর ব্যাকরণ সাংগঠনিক ব্যাকরণের চেয়ে অনেক শক্তিমান, ও যোগ্যতাসম্পন্ন : সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান যেখানে ভাষার বিভিন্ন সামাজিকশ্রেণীক রূপবৈচিত্র্য নির্দেশ ও বর্ণনা ক'রেই ক্ষান্ত হয়, রূপান্তর ব্যাকরণ সেখানে ওই রূপবৈচিত্র্যের কারণ 'ব্যাখ্যা' করতে পারে। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(১২৪) ক ডক্টর হাসান চমৎকার মানুষ।

খ তিনি একনায়কদের উত্থানপতন সম্পর্কে একটি মূল্যবান বই লিখেছেন।

খ´ সে একনায়কদের উত্থানপতন সম্পর্কে একটি চমৎকার বই লিখেছে।

(১২৪ক, খ) সামাজিক ও ভাষিক মানদণ্ডে ত্রুটিহীন; কিন্তু (১২৪ক, খ´), অনেকের কাছে, সামাজিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ ব'লে মনে হবে। প্রথম বক্তা, যিনি (১২৪ ক, খ) ব্যবহার করেন, তিনি 'ডক্টর হাসান'-কে [+সম্মান] বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মনে করেন, এবং তাঁর প্রতি নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহার করেন [+সম্মান] সর্বনাম 'তিনি', এবং ক্রিয়ারও [+সম্মান] রূপ ব্যবহার করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বক্তা, যিনি ব্যবহার করেন (১২৪ক, খ´), তিনি 'ডক্টর হাসান'-কে সম্মানিত ব্যক্তি মনে করলেও তাঁর প্রতি নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহার করেন [—সম্মান] সর্বনাম 'সে', এবং ক্রিয়ারও [–সম্মান] রূপ ব্যবহার করেন। (১২৪ক, খ´) কি অশুদ্ধ? সাংগঠনিক ব্যাকরণ প্রয়োগ দুটির শুদ্ধাশুদ্ধি সম্পর্কে নিশ্চুপ থেকে এদের নিরাসক্ত বর্ণনা দেবে, কেননা দুটি প্রয়োগই বাঙলা ভাষায় সুলভ। কিন্তু রূপান্তর ব্যাকরণ ঢুকবে আরো গভীরে। রূপান্তর ব্যাকরণ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করবে এদের সামাজিক-ভাষিক মূল্য। রূপান্তর ব্যাকরণ (১২৪)-র উপাত্ত থেকে আবিষ্কার করবে [+সম্মান] সম্পর্কে দুটি সূত্র, এবং সূত্র দুটিকে বিন্যস্ত করবে বিশেষ ক্রমে। [+সম্মান] বিশেষ্যপদের প্রতি [+সম্মান] সর্বনামের সাহায্যে নির্দেশ করাকে বলা যাক 'সূত্র-১,' এবং [+সম্মান] বিশেষ্যপদের প্রতি [—সম্মান] সর্বনামের সাহায্যে নির্দেশ করাকে বলা যাক 'সূত্র-২'। তারপরে ব্যাখ্যা দেয়া যায় যে 'সূত্র-১' হচ্ছে বাঙলা ভাষার স্বাভাবিক ও শ্রদ্ধেয় সূত্র; কিন্তু 'সূত্র-২', যদিও শ্রদ্ধেয় নয়, ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় সাম্প্রতিক বাঙলা ভাষায়। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণতত্ত্ব, তাই, সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক উপাত্তও সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।

রূপান্তর ব্যাকরণ উপাত্ত-আদর্শায়নের পক্ষপাতী; এবং কোনো ভাষা-উপাত্ত ব্যাখ্যার সময় এ-তত্ত্ব বিভিন্ন উপভাষার কোলাহল থেকে ছেঁকে নেয় একটি আদর্শ ভাষা-রীতি (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ৩); Φ১.২.৬)। প্রতিটি ভাষারীতির নিজস্ব শৃঙ্খলা রয়েছে, কোনো রীতিই বিশৃঙ্খল নয়। কোনো ভাষারীতির শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা কি-উপায়ে নির্ণয় করা সম্ভব? প্রশ্নটির সুস্পষ্ট উত্তর দেয়া কঠিন। শুদ্ধতা নির্ণয়ের কোনো ঐশী মানদণ্ড আছে কি? গণতান্ত্রিক প্রণালিতে কি শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করা সম্ভব? চমস্কি যে-সমস্ত বাক্যকে শুদ্ধ মনে করেছেন, ভোট নিয়ে দেখা গেছে অনেকে সে-সব বাক্যকে মনে করেন অশুদ্ধ; আবার চমস্কি কর্তৃক অশুদ্ধ ব'লে ঘোষিত বহু বাক্যকে অনেকে সানন্দে শুদ্ধ ব'লে গ্রহণ করেছেন (দ্র হিল (১৯৬১))। নিচের বাক্যগুলো লক্ষণীয়:

(১২৫) ক হাসিনা যুক্তরাজ্যের রানী।

খ হাসান মাও সেতুংয়ের পিতা।

(১২৬) ক *টিছেলে ভালো।

খ *কেতোমা চাই।

(১২৭) ক *আমি হাঁটছি যে তুমি আসবে।

খ *আমি খুঁড়ছি যে তুমি মন্ত্রী হবে।

(১২৮) ক মেয়েটি অস্তমিত হচ্ছে।

খ ওই রঙটি নীরব।

(১২৯) ক ত্রিভুজ গোলাকার।

খ বৃত্তটি নীরব ও চতুর।

(১২৫ক, খ) অসত্য, তবে ব্যাকরণসম্মত; কিন্তু (১২৬-১২৯)-এর বাক্যগুলোকে কোনো-না-কোনো রকমে ব্যাকরণবিরুদ্ধ মনে করা হয়। ''আস্পেকটস''-কাঠামোর ব্যাকরণে (১২৬-১২৮)-এর বাক্যগুলোকে মনে করা হয় 'বাক্যিক-সূত্রবিরোধী' ব'লে; এবং (১২৯)-এর বাক্যগুলোকে মনে করা হয় 'আর্থসূত্রবিরোধী' ব'লে। এ-বাক্যগুলোর 'অশুদ্ধতা'র মাত্রা সমান নয়। চমস্কি (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ১৪৮-১৫৩)) বাক্যগুলোর ব্যাকরণ বিরুদ্ধতার প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ণয় করতে চেয়েছেন। (১২৬)-এর বাক্যগুলোকে বলা যেতে পারে 'পদগত বিপর্যয়'জাত; অর্থাৎ এ-গুলোতে বিভিন্ন পদের বিন্যাস রীতিবিরুদ্ধ ('*টি ছেলে→ছেলেটি')। (১২৭)-র বাক্য দুটি 'সূক্ষ্ম উপশ্রেণীগত বিপর্যয়'জাত। এ-বাক্য দুটিতে এমন ক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা হয়েছে উপবাক্য, যা উপবাক্য গ্রহণে অসমর্থ (বলতে পারি 'আমি জানি যে তুমি আসবে', বা 'আমি জানি যে তুমি মন্ত্রী হবে')। (১২৮)-এর বাক্য দুটি 'সংগতিনীতি'-বিরোধী। (১২৯)-এর বাক্য দুটিকেও 'সংগতি'-বিরোধী মনে করা হয়। বিভিন্ন ব্যাকরণ-বৈরিতা পর্যবেক্ষণ ক'রে নির্ণয় করা সম্ভব অশুদ্ধতার 'শ্রেণী' ও 'মাত্রা'। দেখা গেছে যে-সব বাক্য বাক্যিক ত্রুটিপূর্ণ, তাদের বিপর্যয়ের মাত্রা আর্থ ত্রুটিকীর্ণ বাক্যের চেয়ে অধিক। তাই ব্যাকরণে বাক্যিক-আর্থ-ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যরাশিকে এমন স্তরক্রমে বিন্যস্ত করা সম্ভব, যার সাহায্যে বাক্যের বিচ্যুতির মাত্রা নির্ণয় করা যেতে পারে। তবে বিচ্যুতির মাত্রা নির্ণয় সম্পর্কে নানাবিধ প্রস্তাব সত্ত্বেও শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার মাত্রা নির্ণয়ের কোনো সুষ্ঠু প্রণালি আজো গ'ড়ে ওঠে নি (দ্র উইনরাইস (১৯৬৬))। বাক্যে আর্থ ত্রুটির চেয়ে বাক্যিক ত্রুটি বেশি মারাত্মক: ভাষার নিয়মকানুন ভালো-ভাবে না জানলে ঘটে বাক্যিক ত্রুটি, এবং নিয়ম জানার পর অবিরাম ঘটানো যায় আর্থ ত্রুটি।

১'৬'১১ **রূপান্তর উপকক্ষ**

ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষের সূত্র প্রয়োগে সৃষ্ট 'গভীর সংগঠন', বা 'তলে'র ওপর প্রযুক্ত হয় রূপান্তর উপকক্ষের রূপান্তরসাধক সূত্র, এবং গভীর সংগঠন নানাভাবে রূপান্তরিত হ'য়ে রচিত হয় বাক্যের 'বহিঃসংগঠন', বা বহির্তল' (দ্র Φ ১'৩'২)। রূপান্তর সূত্রের সারকথা হলো যে রূপান্তর বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত করবে না। ''আস্পেকটস''-কাঠামোর ব্যাকরণের রূপান্তরসূত্র বাক্যের গভীর সংগঠনের কোনো প্রতীককে বর্জন করতে পারে, বা গভীর সংগঠনে যুক্ত করতে পারে নতুন প্রতীক, পারে বিভিন্ন প্রতীককে স্থানান্তরিত করতে, এবং এক প্রতীকের বদলে অন্য প্রতীক ব্যবহার করতে। রূপান্তরসূত্র প্রণয়ন নির্ভর করে বিশ্লেষকের বোধ ও ব্যাখ্যার ওপর: তিনিই স্থির করবেন কোন সমস্যাটিকে তিনি কি-ভাবে আক্রমণ ও সমাধান করতে চান। মনে করা যাক, একজন বিশ্লেষকের উপাত্ত হচ্ছে 'বাঙলা প্রশ্নবোধক বাক্য': অর্থাৎ

তিনি বিশ্লেষণ করতে চান বাঙলা প্রশ্নবোধক বাক্যসৃষ্টির প্রক্রিয়া। তবে তাঁকেই স্থির করতে হবে কি-উপায়ে তিনি এ-বাক্যশ্রেণী সৃষ্টি করবেন। তিনি হয়তো প্রথমে সংগ্রহ করবেন ব্যাপক প্রশ্নবোধক বাক্য-উপাত্ত, এবং পর্যবেক্ষণ করবেন কি-উপায়ে এ-বাক্যসমূহ সৃষ্টি হয় (অর্থাৎ তিনি দাঁড় করাবেন বাঙলা প্রশ্নবোধক বাক্য সম্পর্কে একটি 'তত্ত্ব')। তিনি তাঁর বিশ্লেষণ অনুসারে রচনা করবেন পদসাংগঠনিক সূত্র, এবং রূপান্তরসূত্র। তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখাবেন কি-ভাবে তাঁর সূত্র প্রয়োগে বাঙলা ভাষার সমস্ত শুদ্ধ, এবং কেবল শুদ্ধ প্রশ্নবোধক বাক্য সৃষ্টি হ'তে পারে।

রূপান্তরসূত্র রচনার কতকগুলো কৌশল রয়েছে (দ্র Φ ১'৩'২))। যে-সমস্ত কৌশল "আস্পেকটস"-কাঠামোর ব্যাকরণের সাথে জড়িত, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো Φ১'৬'১'১ পরিচ্ছেদাংশে।

১'৬'১'১ রূপান্তরসূত্র রচনাপ্রণালি

প্রতিটি রূপান্তরসূত্র দ্বি-আংশিক : রূপান্তরসূত্রের প্রথমাংশকে বলা হয় 'সাংগঠনিক বর্ণনা', বা 'সাংগঠনিক সংকেত'; এবং দ্বিতীয়াংশকে বলা হয় 'সাংগঠনিক রূপান্তর'। 'সাংগঠনিক বর্ণনা' ('সাংব') হচ্ছে বাক্যের গভীর, বা মধ্য-সংগঠনের 'বুলিয়ান বিশ্লেষণ', যাতে বাক্যটির সংগঠনকে ভাগ করা হয় কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ উপগ্রন্থিতে (অর্থাৎ কি-রকম সংগঠনের ওপর রূপান্তরসূত্র প্রযুক্ত হবে, তা নির্দেশ করা হয়); এবং 'সাংগঠনিক রূপান্তর'-এ ('সাংরূ') নির্দেশ করা হয় বাক্যটির আভ্যন্তর সংগঠন কি-রূপে রূপান্তরিত হবে। "আস্পেকটস"-কাঠামোর ব্যাকরণে, সাধারণত, সাংগঠনিক বর্ণনায় নির্দেশ করা হয় বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের রূপ; সাংগঠনিক রূপান্তরে, সরল গদ্যে, নির্দেশ দেয়া হয় রূপান্তর সাধনের, এবং অনেক সময় সূত্রের সাথে পেশ করা হয় একগুচ্ছ শর্ত (দ্র Φ ১'৩'২)। একটি রূপান্তরসূত্রের নমুনা (১৩০):

(১৩০) **কর্তা-ক্রিয়ারূপ সংগতিসূত্র**

সাংব :	বাক্য[উ	বিপ[উ	বি	উ]	উ	[ক্রিস]	উ]
			[+… α পুরুষ β শ্রেণী +কর্তা]			[+ক্রিস +…]	
	১	৩	৫			৮	

সাংরূ :

ক   ৫-এর [α পুরুষ β শ্রেণী (যদি থাকে)] ৮-এ সংযোজিত করুন।

খ   যদি ৩ কোনো যুগ্ম ক্রিয়া হয়, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে নিচের স্তরক্রমে ৫ যেনো উচ্চতম হয়:

+ প্রথম পুরুষ
+ দ্বিতীয় পুরুষ, + সম্মান
+ দ্বিতীয় পুরুষ, — সম্মান
+ দ্বিতীয় পুরুষ, + হীন
+ তৃতীয় পুরুষ, + সম্মান
+ তৃতীয় পুরুষ, — সম্মান

শর্ত : ক ১ বাক্য ১—এর কর্তা।

খ ২ আধিপত্য করে ৩ ও ৮-এর ওপর।

সূত্রটি সাম্প্রতিকতম প্রণালিতে রচিত। সূত্রটি নির্দেশ করছে কি-ভাবে বাক্যের ক্রিয়ারূপ বাক্যের কর্তার সাথে সংগতি রক্ষা করবে। 'সাংগঠনিক বর্ণনা'য় দেয়া হয়েছে বাক্যটির তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ : বের ক'রে নেয়া হয়েছে সংগতিসূত্রের জন্যে প্রয়োজনীয় কর্তা-বিশেষ্যপদটিকে, এবং ক্রিয়ামূলের ক্রিয়াসহায়কটিকে। গ্রন্থিগুলোকে সহজে নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে সংখ্যা। যেমন : কর্তা-বিশেষ্যপদটির সংগঠন দেখানো হয়েছে ৩, ৪, ৫, ও ৬ সংখ্যার সাহায্যে ; এবং ৪ ও ৬ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয় ব'লে, এ-সংখ্যা দুটিকে রাখা হয়েছে উহ্য। কর্তা-বিশেষ্যপদ ৩-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি হচ্ছে 'বি' (বিশেষ্য)। এর নিচে দেখানো হয়েছে মিশ্রপ্রতীক, এবং মিশ্রপ্রতীকে সে-সব বৈশিষ্ট্যই উল্লেখিত হয়েছে, যা সংগতিসূত্রের জন্যে প্রয়োজনীয়। 'α' ('আলফা'), ও 'β' ('বিটা') নির্দেশ করছে বিশেষ্যের 'পুরুষ'গত বৈশিষ্ট্য (তা 'প্রথম', 'দ্বিতীয়', 'তৃতীয়' যা-ই-হোক), এবং 'শ্রেণী'গত বৈশিষ্ট্য। [+ কর্তা] নির্দেশ করছে যে-বিশেষ্যটি কর্তা-বিশেষ্যপদের মুখ্য উপাদান। ৮-এ নির্দেশ করা হয়েছে ক্রিয়াসহায়কের বৈশিষ্ট্য। 'সাংগঠনিক রূপান্তর' দেখানো হয়েছে দু'ভাগে। 'সাংব'-র প্রথমাংশ নির্দেশ করছে যে ৫-এর 'পুরুষ (শ্রেণী)'-গত বৈশিষ্ট্যকে আরোপ করতে হবে ৮-এর ওপর, অর্থাৎ কর্তা-বিশেষ্যের 'পুরুষ (শ্রেণী)'-গত বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে হবে ক্রিয়াসহায়কের ওপর। যদি কর্তা-বিশেষ্যপদের বৈশিষ্ট্য হয় [+ প্রথম পুরুষ], তবে 'ক্রিস'-এ বৈশিষ্ট্য হবে +প্রথম পুরুষ], যদি কর্তা—বিশেষ্যপদের বৈশিষ্ট্য হয় [+ দ্বিতীয় পুরুষ, + সম্মান], তবে 'ক্রিস'-এর বৈশিষ্ট্যও হবে [+ দ্বিতীয় পুরুষ, + সম্মান] ইত্যাদি। 'সাংব'-র দ্বিতীয়াংশ নির্দেশ করছে যুগ্ম কর্তা-বিশেষ্যপদের সাথে ক্রিয়ারূপের সংগতি। বাঙলা ভাষায় তিন 'পুরুষ'-এর সমবায়ে গ'ড়ে উঠতে পারে কর্তা-বিশেষ্যপদ, এবং ওই পরিস্থিতিতে ক্রিয়ারূপ তিন পুরুষের সাথেই সংগতি রক্ষা করে না। সংগতি রক্ষা করে 'সাংব' (খ)-তে প্রদর্শিত স্তরক্রম অনুসারে। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(১৩১) ক সে ও আমি যাবো।

খ তুমি ও আমি যাব্বো।

গ সে ও তুমি ও আমি যাবো।

ঘ সে ও তুমি যাবে।

উল্লিখিত উদাহরণে দেখা যাচ্ছে যে কর্তা-বিশেষ্যপদ যদি [+তৃতীয় পুরুষ] ও [+প্রথম পুরুষ]-এর সমবায়ে গঠিত হয়, তবে ক্রিয়ারূপ সংগতি রক্ষা করে প্রথম পুরুষ-এর সাথে ; যদি কর্তা-বিশেষ্যপদ [+দ্বিতীয় পুরুষ] ও [+প্রথম পুরুষ]-এর সমবায়ে গঠিত হয়, তবে ক্রিয়ারূপ সংগতি রক্ষা করে প্রথম পুরুষ-এর সাথে ইত্যাদি। অর্থাৎ ক্রিয়ারূপ যুগ্ম বিশেষ্যপদের সে-বিশেষ্যপদটির সাথেই সংগতি রক্ষা করে, যা 'সাংব' (খ)-তে প্রদর্শিত স্তরক্রমে উচ্চে অবস্থান করে। সাংগঠনিক রূপান্তর সূত্রটি প্রয়োগের জন্যে দুটি শর্তও আরোপ করা হয়েছে সূত্রটিতে।

রূপান্তর ব্যাকরণে সূত্র অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে রচনা করতে হয়, যাতে যে-কেউ যান্ত্রিক প্রণালিতে ওই সূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করতে পারে শুদ্ধ, এবং কেবল শুদ্ধ বাক্য। সূত্রে কোনো অস্পষ্টতা, বা স্ববিরোধ থাকবে না। রূপান্তর ব্যাকরণের চরম লক্ষ্য হচ্ছে কোনো ভাষার সমস্ত সূত্র উদ্‌ঘাটন করা, এবং তাদের বিশেষ ক্রমে বিন্যস্ত করা।

১'৬'১১'২ ' চক্রাবর্তন : সাইক্লিক প্রিন্সিপল

''আস্পেকটস''-কাঠামোর ব্যাকরণে, ও ''আস্পেকটস''-উত্তর রূপান্তর ব্যাকরণে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যে রূপান্তরসূত্রসমূহ 'বাহ্যিক ক্রমবিন্যস্ত' (দ্র ৫ ১'৩'২), এবং তা প্রযুক্ত হয় 'চক্রাবর্তন' প্রণালিতে। প্রয়োগযোগ্য সমস্ত সূত্র, কোনো সংগঠনে, সূত্রস্তূপরূপে প্রযুক্ত হয় না ; বরং প্রযুক্ত হয় এক বিশেষ পরম্পরায় ; এবং চলতে থাকে ওই পরম্পরার চক্রাবর্তন। 'চক্রাবর্তন' রীতি বর্ণনার জন্যে উদাহরণের সাহায্য নেয়া দরকার। মনে করা যাক :

[ক] এমন একটি বাক্যসংগঠন রয়েছে, যা গ'ড়ে উঠেছে 'বাক্য$_১$', 'বাক্য$_২$', 'বাক্য$_৩$', ও 'বাক্য$_৪$'-এর সমবায়ে ; এবং এদের মধ্যে 'বাক্য$_৪$' গ্রথিত 'বাক্য$_৩$'-এ, 'বাক্য$_৩$' গ্রথিত 'বাক্য$_২$'-এ, আর 'বাক্য$_২$' গ্রথিত 'বাক্য$_১$'-এ।

[খ] আমাদের ব্যাকরণে আছে পাঁচটি রূপান্তরসূত্র, যা 'রূসূ^{১}', 'রূসূ^{২}', 'রূসূ^{৩}', 'রূসূ^{৪}', 'রূসূ^{৫}'—এ-ক্রম অনুসারে প্রযুক্ত হয়।

উল্লিখিত সিদ্ধান্ত ভিত্তি ক'রে রূপান্তরসূত্র প্রয়োগের 'চক্রাবর্তন' নীতি বর্ণনা করা যায় (১৩২)-পদচিত্রটির সাহায্যে (দ্র পৃষ্ঠা ১৬০)।

(১৩২) এমন একটি বাক্যসংগঠন, যা গ'ড়ে উঠেছে একটি বাক্যসংগঠনের শরীরে আরেকটি বাক্যসংগঠন গেঁথে দেয়ার ফলে। আমাদের ব্যাকরণে পাঁচটি রূপান্তরসূত্র রয়েছে। এ-সূত্রসমূহ কি-রীতিতে (১৩২)-এ প্রযুক্ত হবে ? রূপান্তর ব্যাকরণের নীতি হচ্ছে যে রূপান্তরসূত্র প্রথমে প্রযুক্ত হবে নিম্নতম বাক্যসংগঠনে (এ-ক্ষেত্রে 'বাক্য$_৪$' -এ), এবং সে-সংগঠনে প্রয়োগযোগ্য সমস্ত সূত্র প্রয়োগের পর সূত্র প্রযুক্ত হবে অব্যবহিত উচ্চ সংগঠনে, এবং তারপরে অব্যবহিত উচ্চ সংগঠনে, এবং পরিশেষে প্রযুক্ত হবে সর্বোচ্চ সংগঠনে। (১৩২)-এ রূপান্তরসূত্র প্রথমে প্রযুক্ত হবে 'বাক্য$_৪$' -এ (যদি 'বাক্য'$_৪$-এর সংগঠন উল্লিখিত রূপান্তরসূত্র প্রয়োগের যোগ্য হয়, তবেই সূত্র প্রযুক্ত হবে ; নইলে নয়)। প্রয়োগযোগ্য সমস্ত সূত্র 'বাক্য$_৪$'-এ প্রযুক্ত হ'লে বলা হবে যে সূত্রপ্রয়োগের 'প্রথম ক্র/বৃত্ত' সম্পূর্ণ হলো। এবার সূত্র প্রযুক্ত হবে 'বাক্য$_৩$'—এ (এতে গৃহীত হবে 'বাক্য'$_৪$ -ও)। প্রয়োগযোগ্য সূত্র প্রয়োগের পর যেতে হবে 'বাক্য$_২$' —এ (এতে গৃহীত হবে 'বাক্য$_৩$' ও 'বাক্য'$_৪$), এবং প্রয়োগযোগ্য সূত্র প্রয়োগের পরে যেতে হবে

উচ্চতম বাক্য 'বাক্য১'-এ (এতে গৃহীত হবে 'বাক্য১'-এর অধীন সমস্ত বাক্য), এবং প্রয়োগ করতে হবে প্রয়োগযোগ্য সূত্রাবলি। সূত্রের 'শেষ চক্র' সম্পূর্ণ হলে রচিত হবে

(১৩২)

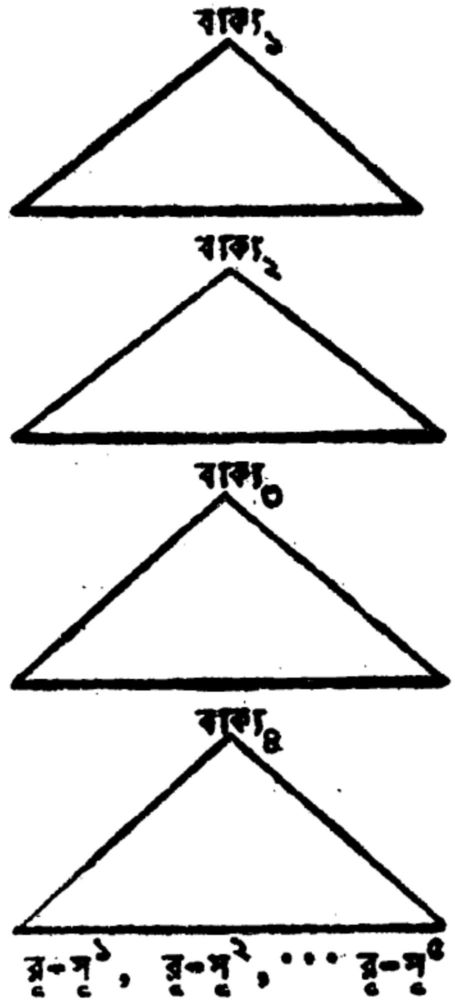

বাক্যের বহিঃসংগঠন। চক্রাকারে. বা বৃত্তাকারে সূত্র প্রয়োগের এ-নীতির অভিধা হচ্ছে 'চক্রাবর্তন নীতি'।]

সূত্রপ্রয়োগের 'চক্রাবর্তন নীতি' রূপান্তর ব্যাকরণের একটি চমকজাগানো কৌশল নয় ; বিভিন্ন বাক্য গঠনের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে এ-নীতি গভীর অন্ত-দৃষ্টিসম্পন্ন। চক্রাবর্তন নীতিকে স্পষ্টভাবে সক্রিয় দেখা যায় 'আত্মবাচক সর্বনামীয়করণ' ও 'কর্তা-থেকে-কর্মে-উন্নয়ন' প্রক্রিয়া দুটির টানা পড়েনে। নিচের বাক্য দুটি লক্ষণীয় :

(১৩৩) ক আমি মনে করি যে হাসান মেধাবী।

খ. আমি হাসানকে মেধাবী মনে করি।

(১৩৩ক, খ) সমার্থক ; সুতরাং মনে করতে পারি যে বাক্য দুটি উৎসারিত হয়েছে অভিন্ন গভীর সংগঠন থেকে। বাক্য দুটির গভীর তল ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে (১৩৩গ)-কে :

(১৩৩) গ [বাক্য$_{১}$ [আমি একথা বাক্য$_{২}$ [হাসান মেধাবী]বাক্য$_{২}$ [মনে করি] বাক্য$_{১}$

(১৩৩গ)-তে প্রবিষ্ট করতে হবে 'সম্পূরক-চিহ্ন' 'যে'; এবং পাওয়া যাবে মোটা-মুটিভাবে গ্রহণযোগ্য বাক্য 'আমি একথা যে হাসান মেধাবী মনে করি'। 'একথা'-কে তার অধীন বাক্যসহ (বাক্য২) সমগ্র বাক্যের ডানে স্থানান্তরিত করলে পাওয়া যাবে 'আমি মনে করি একথা যে হাসান মেধাবী', এবং 'একথা' বর্জন করলে পাওয়া যাবে (১৩৩ক)। (১৩৩খ)-বাক্যটি কি-ভাবে গঠিত হবে? (১৩৩খ)-তে 'হাসান' উপস্থিত কর্মরূপে; কিন্তু (১৩৩গ)—তে 'হাসান' উপস্থিত কর্তারূপে। (১৩৩গ)-তে প্রযুক্ত হ'তে পারে 'কর্তা-থেকে-কর্মে-উন্নয়ন' সূত্রটি: এ-সূত্র নিম্নবাক্যের কর্তাকে ঊর্ধ্ব বাক্যের কর্মরূপে উন্নীত করে। এমন উন্নয়নে পাওয়া যাবে (১৩৩ঘ)

(১৩৩) ঘ বাক্য$_{১}$[আমি বাক্য$_{২}$[হাসানকে মেধাবী]বাক্য$_{২}$ [মনে করি]বাক্য$_{১}$

(১৩৩ঘ) সংগঠনটি সৃষ্টি করবে (১৩৩খ)। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয়:

(১৩৪) ক হাসান$_{১}$ মনে করে যে সে$_{১}$ মেধাবী।
খ *হাসান মনে করে যে নিজ মেধাবী।
গ হাসান নিজেকে মেধাবী মনে করে।

(১৩৪ক)-তে 'হাসান১' ও 'সে১' সমনির্দেশক; অর্থাৎ অভিন্ন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে (অভিন্নতা বোঝানোর জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে 'সমনির্দেশক সূচি' '১' '১')। (১৩৪খ)-বাক্যটি অশুদ্ধ। (১৩৪ক, গ) সমার্থক; এবং সহজেই মনে হয় যে এ-বাক্য দুটি উৎপন্ন হয়েছে কোনো অভিন্ন গভীর উৎস থেকে। (১৩৪ক, গ)--র গভীর সংগঠন রূপে গ্রহণ করতে পারি (১৩৪ঘ)-কে:

(১৩৪) ঘ বাক্য$_{১}$[হাসান$_{১}$ একথা বাক্য$_{২}$[আমি$_{১}$ মেধাবী]বাক্য$_{২}$ মনে করে]বাক্য$_{১}$.

(১৩৪ঘ)-তে 'সম্পূরক-চিহ্ন' 'যে' ঢুকিয়ে, বাক্য২-সহ 'একথা'-কে সমগ্র সংগঠনের ডানে স্থানান্তরিত করে, এবং 'পরোক্ষ উক্তি গঠনসূত্র' প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে 'হাসান মনে করে একথা যে সে মেধাবী'; এবং 'একথা' বর্জন ক'রে পাওয়া যাবে (১৩৪ক)। 'আত্মবাচক সর্বনামীয়করণ' সূত্রের শর্ত হচ্ছে এ-সূত্র প্রয়োগের জন্যে একই 'সরল বাক্যে' থাকতে হবে দুটি 'সমনির্দেশক' বিশেষ্য-পদ। (১৩৪ঘ)-তে 'হাসান' ও 'আমি' সমনির্দেশক, কিন্তু এরা ভিন্ন সরল বাক্যের সদস্য। সুতরাং (১৩৪ঘ)-তে 'আত্মবাচক সর্বনামীয়করণ সূত্র' প্রয়োগ করলে পাওয়া যাবে ব্যাকরণবিরুদ্ধ বাক্য (১৩৪খ)। 'আত্মবাচক সর্বনামীয়করণ সূত্র' প্রয়োগের জন্যে (১৩৪ঘ)-র 'বাক্য২'-এর কর্তা 'আমি'-কে উন্নীত করতে হবে 'বাক্য১'-এর কর্মরূপে। কর্মে-উন্নয়নের পরে যেহেতু 'হাসান' ও 'আমি' সমনির্দেশক, তাই 'আত্মবাচক সর্বনামীয়করণ সূত্র' অনিবার্যভাবে প্রযুক্ত হবে 'বাক্য১'-এ। এর ফলে পাওয়া যাবে 'হাসান নিজেকে মেধাবী মনে করে', অর্থাৎ (১৩৪গ)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে 'কর্তা-থেকে—কর্মে-উন্নয়ন' ও 'আত্মবাচক সর্বনামীয়করণ' সূত্র দুটি প্রয়োগের ক্রম হচ্ছে:

[ক] 'কর্তা-থেকে-কর্মে-উন্নয়ন'

[খ] 'আত্মবাচক সর্বনামীয়করণ'

এবং এরা প্রযুক্ত 'চক্রাবর্তন নীতি' অনুসারে। কেননা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে যে সূত্র প্রয়োগের উল্লিখিত ক্রম সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। ফলে দেখা দেবে 'ক্রমবিন্যাসগত বিরোধ'। এ-বিরোধ নিরসনের জন্যে গ্রহণ করতে হয় এ-সিদ্ধান্ত যে রূপান্তরসূত্র 'চক্রাবর্তন নীতি' অনুসারে প্রযুক্ত হয়।

১'৬'১২ রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ

বাক্যের বহিঃসংগঠন ও মধ্যসংগঠনের ওপর রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ ক'রে সৃষ্টি করা হয় বাক্যের 'বাক্যিক বহিঃসংগঠন', বা 'বাক্যিক বহির্তল'; এবং ওই বহিঃসংগঠনের ওপর প্রয়োগ করা হয় '(রূপ)ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষে'র 'রূপধ্বনিতাত্ত্বিক' সূত্রাবলি। ফলে পাওয়া যায় বাক্যের 'ধ্বনিরূপ'। রূপান্তর ব্যাকরণের বাক্যিক কক্ষ বাক্যের বাস্তব বহিঃসংগঠন সৃষ্টি করে না। বাক্যের বাস্তব বহিঃসংগঠন, বা ধ্বনিরূপ পাওয়ার জন্যে রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষের সূত্রাবলি প্রয়োগ করা আবশ্যক। 'বাক্যিক বহিঃসংগঠন'-কে বলা যেতে পারে 'ধ্বনিতাত্ত্বিক গভীর সংগঠন', যার ওপর 'সৃষ্টিশীল ধ্বনিতত্ত্ব'-এর রীতি অনুসারে প্রয়োগ করা হয় রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রাবলি। রূপান্তর ব্যাকরণের ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষও, আর্থ-কক্ষের মতো, সৃষ্টিশীল নয়; এ-কক্ষ ভাষ্যাত্মক। বাক্যিক কক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট বাক্যের ধ্বনিরূপ নির্দেশ করাই এ-কক্ষের সূত্রাবলির দায়িত্ব। রূপান্তরবাদী ধ্বনিতত্ত্ব, যার নাম 'সৃষ্টিশীল ধ্বনিতত্ত্ব', বা 'সুশৃঙ্খল ধ্বনিতত্ত্ব', নানা দিকে ভিন্ন সাংগঠনিক ধ্বনিতত্ত্ব থেকে। সাংগঠনিকদের মতে ধ্বনিমূল অবিভাজ্য, কিন্তু রূপান্তরবাদীদের মতে ধ্বনিমূল বিভাজ্য ('ধ্বনিমূল' শব্দটিকেই পরিহার করেন রূপান্তরবাদীরা)। একেকটি ধ্বনি, সৃষ্টিশীল ধ্বনিতত্ত্বে, একগুচ্ছ 'স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য'-এর সমষ্টি। সৃষ্টিশীল ধ্বনিতত্ত্ব উৎসারিত হয়েছে ইয়াকবসনীয় ধ্বনিতত্ত্ব থেকে (দ্র ইয়াকবসন ও হাল (১৯৫৬))। সৃষ্টিশীল ধ্বনিতত্ত্বের প্রধান পুরুষ চমস্কি, হাল, পোস্টাল প্রমুখ (দ্র হাল (১৯৫৯), ম্যাথিউজ (১৯৬৫), চমস্কি ও হাল (১৯৬৮), পোস্টাল (১৯৬৮))। ধ্বনিতত্ত্ব আমার লক্ষ্য নয়, তাই এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হলো না (দ্র Φ১'৬'১২'১-১'৬'১২'২)।

১'৬'১২'১ বহিঃসংগঠন ও ধ্বনিসূত্র

গভীর সংগঠনের ওপর রূপান্তরসূত্রাবলি প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট হয় বাক্যের 'বাক্যিক বহিঃসংগঠন'; এবং ওই বহিঃসংগঠনের ওপর প্রযুক্ত হয় ধ্বনিসূত্রাবলি। প্রতিটি বাক্যিক বহিঃসংগঠন হচ্ছে ক্ষুদ্রতম সার্থ ভাষা-এককের—বলা যাক 'রূপমূল'-এর—সমষ্টি (চমস্কি ও হালের ভাষায় 'ফর্মেটিভ')। প্রতিটি রূপমূল, বহিঃসংগঠনে, বহন করে নিজের সমগ্র পরিচয়: রূপমূলটির পদগত পরিচয় কি, তার বিমূর্ত গভীর তলীয় রূপ কি, এবং রূপমূলটির বাক্যিক ও আর্থ বৈশিষ্ট্য কি, সব তথ্য বাক্যের বহিঃসংগঠনে রূপমূলটির সাথে যুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ একটি শব্দ—'মেয়ে'—নেয়া যাক। অভিধানে পরিবেশিত হবে শব্দটির বাক্যিক, আর্থ ও ধ্বনিগঠন সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য; এবং সে-সমস্ত তথ্য বাক্যের বহিঃসংগঠনে শব্দটির সাথে উপস্থিত থাকবে। রূপান্তরবাদী তত্ত্ব অনুসারে যে-কোনো এককই হচ্ছে একগুচ্ছ নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি। তাই 'মেয়ে' শব্দটিকে ধরতে পারি একরাশ নানাবিধ বাক্যিক, আর্থ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি, যা বাস্তব রূপ পায় 'মেয়ে' শব্দে। প্রতিটি বাক্যের বহিঃসংগঠন, ধ্বনিসূত্র প্রয়োগের জন্যে,

সরবরাহ করে প্রতিটি বাক্য সম্পর্কে বিপুল তথ্য। প্রতিটি বহিঃসংগঠন হচ্ছে 'রূপমূল'-এর গ্রন্থি। বহিঃসংগঠনকে নির্দেশ করতে হবে কি-ভাবে ওই গ্রন্থি বিভক্ত বিভিন্ন 'পদ'-এ। প্রতিটি 'পদ' হচ্ছে রূপমূলের উপগ্রন্থি। বাক্যের বহিঃসংগঠন গ্রন্থিকে বিভিন্ন পদে বিভক্ত করতে হ'লে দরকার বহিঃসংগঠন-গ্রন্থির তাৎপর্যপূর্ণ 'বন্ধনীকরণ'। বন্ধনী-করণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে একই রূপমূল একাধিক পদের অংশরূপে গৃহীত না হয়। মনে করা যাক, 'ক', 'খ', 'গ' হচ্ছে বহিঃসংগঠন-গ্রন্থির তিনটি রূপমূল। 'ক খ গ'-গ্রন্থির বহিঃসংগঠনে একবার 'ক খ'-কে একটি পদ, এবং একই সঙ্গে 'খ গ'-কে আরেকটি পদ রূপে নির্দেশ করা যাবে না। এদের পদবিন্যাস হ'তে পারে ((ক খ) গ), বা (ক (খ গ)); কিন্তু যুগপৎ উভয় বিন্যাস দেখানো যাবে না। বহিঃসংগঠনকে যেমন বিভক্ত করতে হবে বিভিন্ন পদে, তেমনি বিভিন্ন পদের জন্যে নির্দেশ করতে হবে যোগ্য অভিধা; এবং ওই অভিধা—যেমন: 'বিপ', 'ক্রিপ' প্রভৃতি—পদনির্দেশক বন্ধনির সাথে নির্দেশ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ একটি অতি সরল বাক্য নেয়া যাক:

(১৩৫) আমি তোমাকে ভালোবাসি।

(১৩৫)-বাক্যে, বা গ্রন্থিতে 'আমি', এবং 'তোমাকে'-র আভ্যন্তর সংগঠনের অভিধা হচ্ছে 'বিশেষ্যপদ'; এবং 'তোমাকে ভালোবাসি'-র অভিধা হচ্ছে 'ক্রিয়াপদ'। এমন-ভাবে বাক্যের প্রতিটি পদের অভিধা নির্দেশ করতে হবে। এ-অভিধাসমূহ সর্বজনীন (দ্র Φ ১·২·৯)।

বাঙলা ব্যাকরণ (১৩৫)-বাক্যটির যে-বহিঃসংগঠন সৃষ্টি করবে, তাকে (১৩৬) এবং (১৩৭)রূপে উপস্থাপিত করা যায় (উভয় উপস্থাপন সমতুল্য):

(১৩৬)

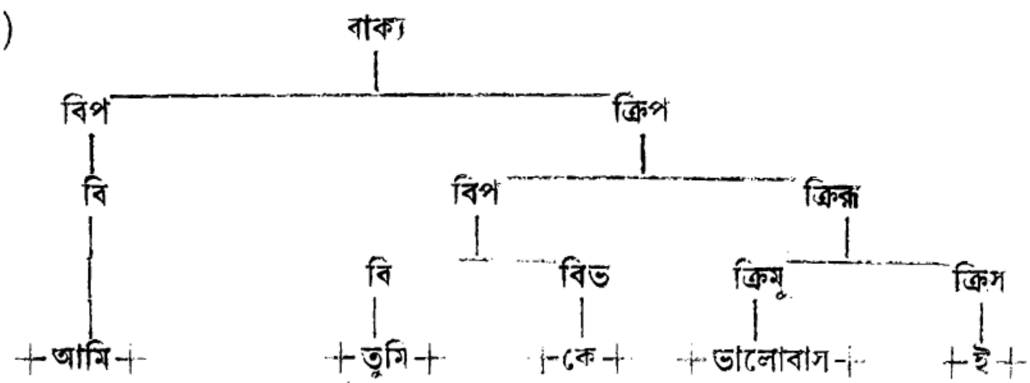

(১৩৭) বাক্য[বিপ[বি[+আমি+]বি]বিপ ক্রিপ[বিপ[বি[+তুমি+]বি

বিভ[+কে+]বিভ]বিপ ক্রিরূ[ক্রিমূ[+ভালোবাস+]ক্রিমূ ক্রিস[+ই+]ক্রিস

]ক্রিরূ]ক্রিপ]বাক্য

পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদখচিত (১৩৬, ১৩৭)-রূপী বহিঃসংগঠনের ওপর প্রযুক্ত হয় রূপান্তরবাদী ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রাবলি। এদের ওপর ধ্বনিসূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে (১৩৫)।

১'৬'১২'২ স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য

সাংগঠনিক ধ্বনিতত্ত্বের একটি মৌল ধারণা হচ্ছে যে ধ্বনিমূল অবিভাজ্য ; এবং ওই তত্ত্বে ধ্বনিমূল নির্ণীত হয় নঞার্থকভাবে। কোনো ধ্বনিমূলের প্রধান চারিত্র্য হচ্ছে যে অন্য ধ্বনিমূল নয়। ধ্বনিমূলের স্তরে সাংগঠনিকেরা সাদৃশ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন বৈসাদৃশ্যের ওপর ; কিন্তু ধ্বনিমূলের চেয়ে নিম্নস্তরে (যেমন : সহধ্বনির স্তরে) সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য উভয় দিকেই মনোযোগ দেয়া হয়। ধ্বনিমূল অবিভাজ্য—এ-'পরমাণুবাদী তত্ত্বে'র বিরুদ্ধে অনেক আগে যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ পেশ করেন ত্রুবেৎস্কয় ও রোমান ইয়াকবসন। তাঁদের মতে, ধ্বনিমূল অবিভাজ্য নয়, বিভাজ্য। বিভিন্ন ধ্বনিমূল হচ্ছে একগুচ্ছ 'স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য'-এর সমষ্টি। রূপান্তরবাদী ধ্বনিতত্ত্ব স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক। সৃষ্টিশীল ধ্বনিতত্ত্বের একটি মৌল সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে 'দ্বিমুখি স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য'-এর রয়েছে এক সর্বজনীন ভাণ্ডার, যার থেকে বিভিন্ন ভাষা সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ। সর্বজনীন ধ্বনিভাণ্ডারের সমস্ত স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য কোনো ভাষাই গ্রহণ করে না, গ্রহণ করে এক খণ্ডাংশ।

সর্বজনীন স্বাতন্ত্রিক ধ্বনিভাণ্ডারে কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা নির্ণয় করা, এবং প্রতিটি স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা বেশ দুরূহ কাজ। এ-বৈশিষ্ট্যসমূহ শনাক্ত করতে হ'লে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব গভীর অভিনিবেশের সাথে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। সর্বজনীন ধ্বনিবৈশিষ্ট্যরাশিকে অবশ্যই মেটাতে হবে নিচের শর্ত তিনটি :

[ক] যে-কোনো ভাষার ধ্বনিক ব্যাপারসমূহের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দেয়ার শক্তি থাকতে হবে বৈশিষ্ট্যসমূহের।

[খ] যে-কোনো ভাষার শব্দপুঞ্জের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনের শক্তি থাকতে হবে এদের।

[গ] 'রূপধ্বনিমূল' সমূহের-'স্বাভাবিক শ্রেণীবিন্যাসের শক্তি থাকতে হবে এদের।

চমস্কি ও হালে (দ্র চমস্কি ও হালে (১৯৬৮, ২৯৩-৩১৯)) সর্বজনীন ধ্বনিবৈশিষ্ট্য-পুঞ্জের ধ্বনিক-উপাদান সম্পর্কে বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। চমস্কি ও হালের (১৯৬৮) প্রস্তাবিত বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

(১৩৮)[±রণনশীল] [+রণনশীল] ধ্বনি সৃষ্ট হয় স্বরযন্ত্রের সে-অবস্থায়, যাতে স্বতস্ফূর্ত-ভাবে ঘোষধ্বনি সৃষ্টি সম্ভব ; আর স্বরযন্ত্রের যে-অবস্থায় স্বতস্ফূর্ত-ভাবে ঘোষধ্বনি সৃষ্টি সম্ভব নয়, তখন জন্মে [-রণনশীল] ধ্বনি ('বিঘ্নিতধ্বনি')।

[±স্বরিত] [+স্বরিত] ধ্বনি সৃষ্ট হয় যখন মুখগহ্বরে রুদ্ধতার সৃষ্টি হয় না ; এবং স্বরতন্ত্রি এমন অবস্থায় থাকে, যাতে স্বতস্ফূর্ত ঘোষায়ন সম্ভব। [–স্বরিত] ধ্বনি সৃষ্টির সময় উল্লিখিত একটি, বা উভয় শর্তই অপূর্ণ থাকে। ঘোষ স্বরধ্বনি ও 'তরলধ্বনি'-সমূহ [+স্বরিত] ; আর 'শ্রুতিধ্বনি', নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি, এবং অঘোষ স্বরধ্বনি ও 'তরল ধ্বনি' [—স্বরিত]।

[±ব্যঞ্জন] স্বরতন্ত্রি-অঞ্চলের মধ্য-এলাকায় চরম প্রতিবন্ধকতার ফলে উৎপন্ন হয় [+ব্যঞ্জন] ধ্বনি ; আর [—ব্যঞ্জন] ধ্বনিসমূহ সৃষ্টির সময় এমন কোনো প্রতিবন্ধকতা ঘটে না।

[±করোনাল] জিভের পাতা তার নিরপেক্ষ, বা স্বাভাবিক অবস্থান থেকে উঁচে উঠিয়ে সৃষ্টি করা হয় [+করোনাল] ধ্বনি ; আর [—করোনাল] ধ্বনি জিভের পাতার নিরপেক্ষ অবস্থানকালে সৃষ্ট হয়। দন্ত্য, দন্তমূলীয়, এবং তালব্য-দন্তমূলীয় ব্যঞ্জনধ্বনিরাশি [—করোনাল], এবং জিভের পাতার সাহায্যে উচ্চারিত তরল ধ্বনি-সমূহও [+করোনাল]। আলজিহ্ব্য [রর], এবং ওষ্ঠ ও জিভের সাহায্যে উচ্চারিত ব্যঞ্জনসমূহ [—করোনাল]।

[±অগ্রবর্তী] মুখগহ্বরে তালব্য-দন্তমূলীয় অঞ্চলে প্রতিবন্ধকতার ফলে উৎপন্ন হয় [+অগ্রবর্তী] ধ্বনি ; এবং [—অগ্রবর্তী] ধ্বনি উৎপন্ন হয় এমন কোনো প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতিতে। স্বরধ্বনি সর্বদাই [—অগ্রবর্তী]। প্রচলিত পরিভাষায় যে-সব ধ্বনিকে বলা হয় তালব্য, জিহ্বামূলীয়, বা গলনালীয় ধ্বনি, সে-সব ধ্বনি [—অগ্রবর্তী] ; আর ওষ্ঠ্য, দন্ত্য, ও দন্তমূলীয় ধ্বনিসমূহ [—অগ্রবর্তী]।

[±উচ্চ] জিভ-দেহ স্বাভাবিক, বা নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে উঁচে উঠিয়ে সৃষ্টি করা হয় [+উচ্চ] ধ্বনিসমূহ ; আর অনুচ্চ, বা [—উচ্চ] ধ্বনিসমূহ উচ্চারিত হয় জিভ-দেহ উঁচে না-উঠিয়ে।

[±নিম্ন] জিভ-দেহ স্বাভাবিক, বা নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে নিচে নামিয়ে সৃষ্টি করা হয় [+নিম্ন] ধ্বনিসমূহ ; আর অনিম্ন, বা [—নিম্ন] ধ্বনিসমূহ উচ্চারিত হয় জিভ-দেহ নিচে না-নামিয়ে।

[±পশ্চাৎ] জিভ-দেহ নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে পেছনে সরিয়ে নিয়ে উচ্চারিত হয় [+পশ্চাৎ] ধ্বনি ; আর অ-পশ্চাৎ, বা [—পশ্চাৎ] ধ্বনি সৃষ্টিকরা হয় জিভ-দেহ পেছনে সরিয়ে না-নিয়ে।

[±বর্তুল] ওষ্ঠ-রন্ধ্রকে সংকীর্ণ ক'রে সৃষ্টি করা হয় [±বর্তুল] ধ্বনি ; আর অ-বর্তুল, বা [—বর্তুল] ধ্বনি উচ্চারণের সময় এমন কোনো রন্ধ্র-সংকীর্ণতা ঘটে না।

[±বণ্টনিত] বায়ুপ্রবাহরেখার ব্যাপক স্থানব্যাপী সংকীর্ণতার ফলে জন্মে [+বণ্টনিত] ধ্বনি ; আর বায়ুপ্রবাহরেখার স্বল্প স্থানব্যাপী সংকীর্ণতার ফলে জন্মে [—বণ্টনিত] ধ্বনি।

[±আবৃত] [+আবৃত] ধ্বনি উৎপন্ন হয় সংকীর্ণায়িত ও দৃঢ়ীভূত দেয়ালসম্পন্ন গলনালি, এবং উচ্চায়িত স্বরতন্ত্রির সাহায্যে। পশ্চিম আফ্রিকার কতিপয় ভাষায় এ-বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

[±নাসিক্য] কোমল তালুর নিম্নায়নের ফলে নাসাপথ দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যেয়ে উচ্চারিত হয় [+নাসিক্য] ধ্বনি ; আর অনাসিক্য, বা [—নাসিক্য] ধ্বনি সৃষ্টি হয় কোমল তালুর উচ্চ অবস্থান কালে, যাতে ফুসফুস-তাড়িত বাতাস কেবল মুখগহ্বর দিয়েই বেরিয়ে যেতে পারে।

[±পার্শ্বিক] এ-বৈশিষ্ট্য শুধু করোনাল ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। [+পার্শ্বিক] ধ্বনি উৎপন্ন হয় জিভের মধ্যাংশের এক ধার, বা উভয় ধার নিচে নামিয়ে। এর ফলে মাঢ়ীর দাঁতের কাছ দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যায় মুখ থেকে। কিন্তু [—পার্শ্বিক] ধ্বনি উচ্চারণের সময় এমন কোনো পার্শ্বপথ খোলা থাকে না।

[±প্রলম্বিত] [+প্রলম্বিত] ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রি-এলাকায় প্রতিবন্ধকতা বা সংকীর্ণতা এমন হয় না, যাতে বাতাস-নির্গমন বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে ; কিন্তু [—প্রলম্বিত], অর্থাৎ স্পৃষ্ট ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখগহ্বরে বায়ুপ্রবাহ সুচারুরূপে রোধ করা হয়।

[±অবিলম্ব মুক্তি] স্বরতন্ত্রি-এলাকায় রুদ্ধতার ফলে যে-সমস্ত ধ্বনি জন্মে, এ-বৈশিষ্ট্য তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্বরতন্ত্রি-অঞ্চলে রুদ্ধতার মুক্তি ঘটে সাধারণত দু'রকমে : স্পৃষ্টধ্বনি সৃষ্টির সময় রুদ্ধতামোচন ঘটে অবিলম্বে ; কিন্তু ঘৃষ্টধ্বনি উচ্চারণের সময় রুদ্ধতামোচনে বিলম্ব ঘটে।

[±দৃঢ়] [+দৃঢ়] ধ্বনি উচ্চারিত হয় স্বেচ্ছাকৃত, যথাযথ, সুস্পষ্ট পেশল প্রচেষ্টায় ; আর অদৃঢ়, বা [—দৃঢ়] ধ্বনি উচ্চারিত হয় দ্রুত, এবং অনেকটা অস্পষ্টভাবে।

[±ঘোষ] [+ঘোষ] ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রি কম্পিত হয় ; আর অঘোষ বা [—ঘোষ] ধ্বনি উচ্চারণ কালে স্বরতন্ত্রি কাঁপে না।

[±নাদ] [+নাদ] ধ্বনিসমূহ কলরোলময় ও কর্কশ ; আর [—নাদ] ধ্বনিসমূহ তেমন নয়।

চমস্কি ও হাল (১৯৬৮, ২৯৮-৩১৯) উল্লিখিত স্বাতন্ত্রিক ধ্বনিবৈশিষ্ট্যসমূহ প্রস্তাব করেছেন (আরো বৈশিষ্ট্য সম্ভবত দরকার হবে)। কোনো ভাষাই উল্লিখিত সমস্ত বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে না, ব্যবহার করে এর এক বিশেষ অংশ। সে সমস্ত ভাষা অধিক পরিমাণে অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে, তাদের সাদৃশ্য অধিক, এবং যে-সমস্ত ভাষা অধিক পরিমাণে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে, তাদের বৈসাদৃশ্য অধিক।

ধ্বনি-প্রতিলিপিতে যে-কোনো উক্তিকে উপস্থাপিত করা হয় পৃথক, স্বতন্ত্র ধ্বনিখণ্ড বা এককের পরম্পরারূপে। এ-ধ্বনিখণ্ডসমূহের প্রতিটি, রূপান্তরবাদী ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে, হচ্ছে একগুচ্ছ ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের (যেমন : [+ঘোষ], [+নাসিক্য] প্রভৃতি) সমাহার। চমস্কি ও হাল (দ্র চমস্কি ও হাল (১৯৬৮, ২৯৪)) প্রস্তাব করেছেন যে ধ্বনি-প্রতিলিপিকে গ্রহণ করা যেতে পারে একটি দ্বিরায়তনিক—দ্বিমাত্রিক—ম্যাট্রিকস ব'লে, যাতে 'স্তম্ভ'-গুলো নির্দেশ করে ধ্বনিখণ্ড, আর 'পংক্তি'-সমূহ নির্দেশ করে

বিভিন্ন ধ্বনিবৈশিষ্ট্য। এ-প্রণালি অনুসারে 'ভালোবাসা' শব্দটির 'ধ্বনি-উপস্থাপন' হবে (১৩৯) (বাঙলা ধ্বনিতত্ত্ব চমস্কীয় প্রণালিতে বিশ্লেষিত হয়নি ; তাই নিম্নের উপস্থাপনে ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান)।

(১৩৯)	/ভ/	/আ/	/ল/	/ও/	/ব/	/আ/	/স/	/আ/
রণনশীল	O	O	O	O	O	O	O	O
স্বরিত	O	+	O	+	O	+	O	+
ব্যঞ্জন		—	+	—	+	—	+	—
করোনাল	—	O	+	O	—	O	O	O
অগ্রবর্তী	+	—	O	—	+	—	O	—
উচ্চ	O	+	O	O	O	+	O	+
নিম্ন	O	O	O	O	O	O	O	O
পশ্চাৎ	O	O	O	O	O	O	O	O
বর্তুল	+	—	—	+	+	—	—	—
বণ্টনিত	O	O	O	O	O	O	O	O
আবৃত	O	O	O	O	O	O	O	O
নাসিক্য	—	—	—	—	—	—	—	—
পার্শ্বিক	—	—	+	—	—	—	—	—
প্রলম্বিত	—	+	—	—	+	—	—	+
অবিলম্ব মুক্তি	+	O	O	O	+	O	—	O
দৃঢ়	O	O	O	O	O	O	O	O
ঘোষ	+	+	—	+	+	+	—	+
নাদ	O	O	O	O	O	O	O	O

(১৩৯)-ম্যাট্রিকসে শূন্য(O) অনিশ্চিতি ও অপ্রযোজ্যতা নির্দেশক (স্তম্ভের শিরে 'ধ্বনিমূল' ব্যবহার করা হয়েছে সুবিধার জন্যে ; রূপান্তরবাদী ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনিমূলের স্থান নেই)।

'সৃষ্টিশীল ধ্বনিতত্ত্বে'র মৌলনীতিসমূহকে প্রকাশ করা যায় নিম্নরূপে :

[ক] ধ্বনিতত্ত্বের মৌলবস্তু হচ্ছে স্বাতন্ত্রিক ধ্বনিবৈশিষ্ট্যরাশি। ধ্বনিমূলসমূহ, যথাযথভাবে বলা যায়, 'রূপধ্বনিমূল-সমূহ হচ্ছে স্বাতন্ত্রিক ধ্বনিবৈশিষ্ট্যগুচ্ছ।

[খ] 'রূপধ্বনিমূল-সমূহ বিমূর্ত একক ; এবং তাদের এমনভাবে গঠন করা হয় যাতে ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিন্যাস সর্বাধিক সাধারণীকৃত সূত্রের সাহায্যে নির্দেশ করা যায়।

[গ] ধ্বনিতত্ত্বে 'বাহুল্য সূত্র' পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

[ঘ] বিমূর্ত ধ্বনিমূলিক উপস্থাপনকে সূত্রের সাহায্যে যুক্ত করা হয় 'ধ্বনিক উপস্থাপন'-এর সাথে।

[ঙ] সাংগঠনিক ধ্বনিমূলের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ অস্তিত্ব নেই।

[চ] ব্যাকরণের ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ সম্পূর্ণরূপে ভাষ্যাত্মক। এ-কক্ষে কাঁচামালরূপে গৃহীত হয় বাক্য-কক্ষ কর্তৃক স্বষ্ট 'বাক্যিক বহিঃসংগঠন'।

১.৭ জেনারেটিভ সিম্যানটিকস : সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব

চমস্কির 'মানতত্ত্ব'-এ (''আস্পেকটস''-কাঠামোর ব্যাকরণে) গৃহীত ক্যাটজ-পোস্টাল নীতিকে—'গভীর সংগঠনেই নির্ণীত হবে বাক্যের সমগ্র অর্থ'—চূড়ান্ত পর্যন্ত টেনে নিলে যে-ব্যাকরণকাঠামো উদ্ভূত হ'তে পারে, তাই 'জেনারেটিভ সিম্যানটিকস', বা 'স্বষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব'। চমস্কি 'মানতত্ত্বে', এবং 'সম্প্রসারিত মানতত্ত্বে' (দ্র চমস্কি (১৯৬৫, ১৯৭১) যেমন সুষমামণ্ডিত ব্যাকরণকাঠামো পেশ করেছেন (দ্র Φ ১.৬.২; Φ ১.৬.৩), তেমন সুষমামণ্ডিত ও সমন্বিত ব্যাকরণকাঠামো আজো পেশ করতে পারেন নি 'স্বষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদী'রা ; তবে তাঁরা চমস্কীয় ব্যাকরণকাঠামোর বিরুদ্ধে এমন তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন যে চমস্কীয় ব্যাকরণকাঠামো সম্প্রতি ব্যাপক সন্দেহের বিষয় হ'য়ে উঠেছে। চমস্কি 'স্বায়ত্তশাসিত বাক্যতত্ত্ব'-বাদী, এবং তাঁর ব্যাকরণ 'বাক্যতত্ত্বভিত্তিক' : কিন্তু স্বষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদীরা স্বষ্টিশীল বাক্যতত্ত্বে অবিশ্বাসী, এবং তাঁদের ব্যাকরণ 'অর্থতত্ত্বভিত্তিক'। স্বষ্টিশীল অর্থতত্ত্বের উন্মেষ ঘটে জর্জ ল্যাকফ-এর প্রভাবশালী গবেষণাগ্রন্থ ''ইররেগুলারিটি ইন সিনট্যাকস'' (১৯৭০ : গ্রন্থটি রচিত হয়েছিলো ১৯৬৫-তে)-এ ; এবং ক্রমশ এ-তত্ত্ব শক্তিমান হ'য়ে ওঠে ল্যাকফ (১৯৭১ক, ১৯৭১খ), ম্যাককলি (১৯৬৮ক, ১৯৬৮খ, ১৯৬৮গ, ১৯৭০ক, ১৯৭০খ, ১৯৭১ক, ১৯৭১খ), পোস্টাল (১৯৭০), রস (১৯৬৭, ১৯৭০) প্রমুখের রচনায় ('কারক-ব্যাকরণ'-এর স্রষ্টা ফিলমোর-এর রচনাবলি এঁদের প্রভূত প্রভাবিত করে)। স্বায়ত্তশাসিত বাক্যতত্ত্বের সাথে স্বষ্টিশীল অর্থতত্ত্বের মৌল পার্থক্য ভাষার কেন্দ্রবস্তু শনাক্তিতে : চমস্কির মতে বাক্যই ভাষার কেন্দ্রবস্তু, তাই ভাষাস্রষ্টা ব্যাকরণের গভীর সংগঠন হওয়া উচিত বাক্যিক; আর স্বষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদীদের মতে অর্থ ভাষার কেন্দ্রবস্তু, তাই ভাষাস্রষ্টা ব্যাকরণের গভীর সংগঠনের হওয়া উচিত আর্থ। চমস্কীয় ব্যাকরণে অর্থতত্ত্ব ভাষ্যাত্মক, কিন্তু স্বষ্টিশীল অর্থতাত্ত্বিক ব্যাকরণে অর্থকক্ষ স্বষ্টিশীল। সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনা এ-রচনার সাধ্যের বাইরে; কেননা তাঁরা আজো কোনো সুষ্ঠু সুষমামণ্ডিত ব্যাকরণকাঠামো পেশ করেন নি ; এবং তাঁরা যে-রীতিতে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেন, তা অতিশয় জটিল ও দুরূহ ;—রূপান্তর ব্যাকরণে সুদক্ষ না হ'লে তাঁদের যুক্তি-কৌশল-প্রকরণ সবই অবোধ্য র'য়ে যাবে। আমি, এ-পরিচ্ছেদাংশে, সংক্ষেপে স্বষ্টিশীল অর্থতত্ত্বের সম্ভাব্য ব্যাকরণ কাঠামোর রূপরেখা তুলে ধরবো।

চমস্কির "আস্পেকটস"-কাঠামোর ব্যাকরণে, ও 'সম্প্রসারিত মানতত্ত্বে' প্রতিটি বাক্যের জন্যে নির্দেশ করা হয় একটি 'বাক্যিক গভীর তল (সংগঠন)'; এবং একটি 'বাক্যিক বহির্তল (বহিঃসংগঠন)' (দ্র Φ১'৬'২ ; Φ ১.৬.৩. ; Φ১.৬.৭)। প্রতিটি বাক্যের গভীর তল ও বহির্তলকে সংযুক্ত করা হয় একরাশ রূপান্তরসূত্রের সাহায্যে। প্রতিটি বাক্যের অর্থ নির্ণীত হয় গভীর তলে ('সম্প্রসারিত মানতত্ত্বে' তিনি প্রস্তাব করেছেন যে বাক্যের বহির্তলও কিছু পরিমাণে অর্থনিয়ন্ত্রণ করে)। ব্যাকরণে একটি ভাষ্যাত্মক আর্থকক্ষ রয়েছে, যার সূত্ররাশি বাক্যিক গভীর তলের ওপর প্রয়োগ ক'রে নির্ণয় করা হয় বাক্যার্থ। সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদীরা চমস্কীয় বাক্যিক গভীর তলে অবিশ্বাসীই শুধু নন; তাঁরা দাবি করেন যে ওই বাক্যিক গভীর তল অপ্রয়োজনীয়;—কেননা তা নানা রকম 'বাহুল্যে'র জননী। তাঁরা দাবি করেন যে বাক্যিক গভীর তল ব'লে কিছু নেই। বাক্যিক গভীর তলের বিকল্পে তাঁরা প্রস্তাব করেন একরকম সংগঠন, যার নাম 'আর্থ উপস্থাপন'। 'আর্থ উপস্থাপন' বাক্যের সমগ্র অর্থ ক্ষুদ্রক্ষুদ্র খণ্ডে ভেঙে গঠন করে বাক্যের অতি বিমূর্ত আর্থ সংগঠন; এবং ওই আর্থ সংগঠনের ওপর শক্তিশালী রূপান্তর-সূত্র প্রয়োগ ক'রে তাঁরা সৃষ্টি করেন বাক্যের বহির্তল। স্বায়ত্তশাসিত বাক্যতত্ত্ব ও সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্বের সমরে প্রথম শহীদ হচ্ছে চমস্কীয় গভীর তল। সৃষ্টিশালী অর্থতত্ত্ব-কাঠামোর ব্যাকরণে রয়েছে অতি বিমূর্ত 'আর্থ উপস্থাপন', শক্তিশালী রূপান্তরসূত্র এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র। আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের ব্যাকরণকাঠামো সরলতর। সৃষ্টিশীল অর্থ-তাত্ত্বিক ব্যাকরণকাঠামোর সংগঠন নিম্নরূপ (১৪০):

(১৪০)

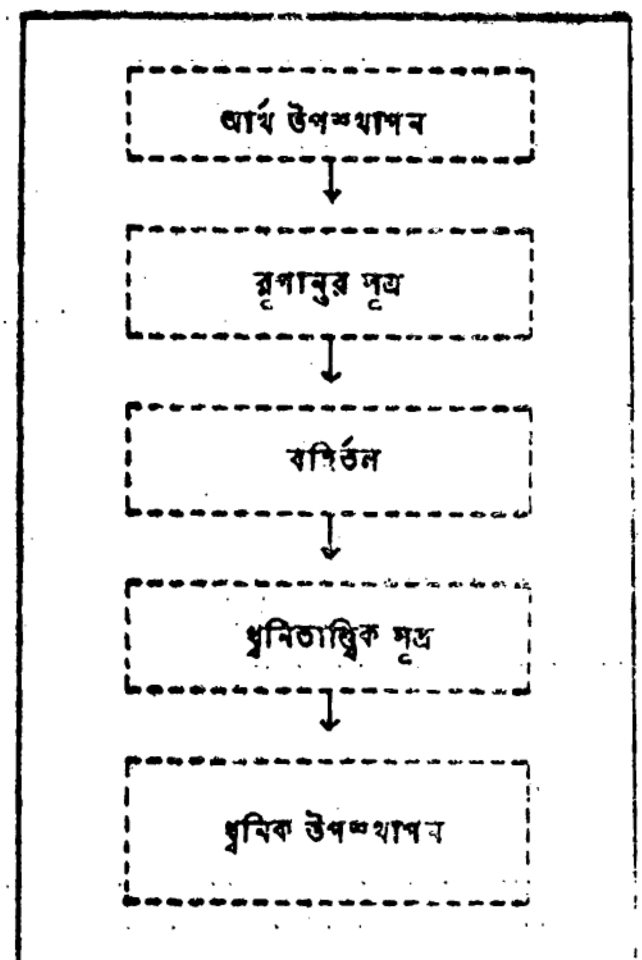

(১৪০)-এ দেখা যাচ্ছে যে এ-ব্যাকরণে কোনো বাক্যিক গভীর সংগঠন নেই ; এবং নেই, চমস্কীয় ব্যাকরণের মতো, কোনো আর্থকক্ষ। বরং এতে 'আর্থ উপস্থাপন' অধিকার করেছে চমস্কীয় ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষ ও গভীর সংগঠনের স্থান (দ্র Φ ১.৬.৭.)। চমস্কীয় ব্যাকরণ ও সৃষ্টিশীল অর্থতাত্ত্বিক ব্যাকরণের পার্থক্য এখানে : চমস্কীয় ব্যাকরণ বাক্যের গভীর সাংগঠনিক বিশ্লেষণ ও তার আর্থভাষ্য, বা উপস্থাপনের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে ; কিন্তু সৃষ্টিশীল অর্থতাত্ত্বিক ব্যাকরণ এ-পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত ক'রে দেয়। অর্থাৎ চমস্কীয় ব্যাকরণ বাক্যতত্ত্বভিত্তিক, কিন্তু এ-ব্যাকরণ অর্থতত্ত্বভিত্তিক। বাক্যতত্ত্বভিত্তিক ব্যাকরণ বাক্যতত্ত্বের স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাস করে, কিন্তু অর্থতত্ত্বভিত্তিক ব্যাকরণ বাক্যতত্ত্বের স্বায়ত্তশাসনে অনাস্থাবাদী (দ্র Φ ১. ৫.৩)। চমস্কীয় ব্যাকরণে ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষের পদসাংগঠনিক সূত্রাবলি আভিধানিক উপকক্ষের সহায়তায় রচনা করে বাক্যের গভীর তল ; এবং ওই গভীর তলের ওপর প্রযুক্ত হয় আর্থকক্ষের ভাষ্যাত্মক সূত্রাবলি ; এবং নির্ণীত হয় বাক্যার্থ। কিন্তু সৃষ্টিশীল অর্থতাত্ত্বিক ব্যাকরণ বাক্যের বাক্যিক গভীর তলকে সম্পূর্ণ বাতিল ক'রে পেশ করে বাক্যের 'আর্থ উপস্থাপন'। ওই আর্থ উপস্থাপন-নের ওপর প্রচুর শক্তিশালী রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করে বাক্যের বহির্তল। সৃষ্টিশীল অর্থতাত্ত্বিক ব্যাকরণের 'আর্থ উপস্থান' এক অত্যন্ত বিমূর্ত ব্যাপার : তাতে বাক্যকে বিভক্ত করা হয় নানাবিধ আর্থপরমাণুতে, এবং ওই আর্থপরমাণুরাশিকে শক্তি-শালী রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ ক'রে রূপ দেয়া হয় বাক্যের। তাঁদের বাক্যবিশ্লেষণ বিশেষভাবে নির্ভরশীল 'সিম্বলিক লজিক'-এর ওপর।

চমস্কীয় ব্যাকরণ বিশেষ সমস্যার মুখোমুখি হয় 'সংখ্যাশব্দ'—'কোয়াণ্টিফায়ার—সম্বলিত বিশেষ্যপদমণ্ডিত একশ্রেণীর বাক্য নিয়ে, যা 'পরোক্ষ বাচ্য'-রূপে ভিন্ন অর্থ পরিগ্রহ করে 'প্রত্যক্ষ বাচ্য'-রূপ থেকে। চমস্কি এ-সমস্যা সমধানের জন্যে স্বীকার ক'রে নেন যে বাক্যের বহির্তলও অনেকাংশে বাক্যার্থ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদীরা বাক্যের সমস্ত অর্থ গভীর তলেই নির্ণয় করার জন্যে প্রস্তাব দিতে থাকেন গভীর-গভীরতর-গভীরতম তলের, যেখানে বাক্যসংগঠন সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হ'য়ে টিকে থাকে শুধু অর্থপরমাণু। চমস্কি অতো গভীরে যেতে অনিচ্ছুক, কেননা বাক্য-সংগঠন বিলোপকারী কোনো কিছু তিনি মেনে নিতে পারেন না। চমস্কি বাক্যসৃষ্টির জন্যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিভিন্ন 'বাক্যিক বৈশিষ্ট্যে'র (দ্র Φ ১.৬.৬); যাতে প্রতিটি শব্দকে ধরা হয় একগুচ্ছ 'বৈশিষ্ট্যে'র সমষ্টি ব'লে। চমস্কীয় তত্ত্বে প্রতিটি একক বৈশিষ্ট্যগুচ্ছ হ'লেও তিনি তাদের বাক্যের গভীর তলে বিভিন্ন সংগঠনে ভাঙতে চান নি। সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদীরা দাবি করতে থাকেন যে চমস্কিকথিত 'বৈশিষ্ট্যে'র মতো কিছু উপাদান বাক্যের আর্থ উপস্থাপনে বিশেষ সংগঠনরূপে উপস্থিত থাকে। সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদীরা তাই বাক্যকে যেমন বিচূর্ণ করেন বিভিন্ন যৌক্তিক অংশে, তেমনভাবে জীর্ণ করলেন শব্দপুঞ্জকেও। অর্থাৎ তাঁরা চমস্কীয় অভিধানকে পরিত্যাগ করেন। উদাহরণস্বরূপ নেয়া যাক. একটি সরল বাক্য :

(১৪১) হাসান হাসিনাকে ভালোবাসে।

চমস্কি এ-বাক্যটির জন্যে যে-গভীর সংগঠনের প্রস্তাব করবেন, তা বাক্যটির বাস্তব রূপ থেকে খুব সুদূর নয়। (১৪১)-বাক্যটির চমস্কীয় গভীর তল হবে (১৪২) :

(১৪২)

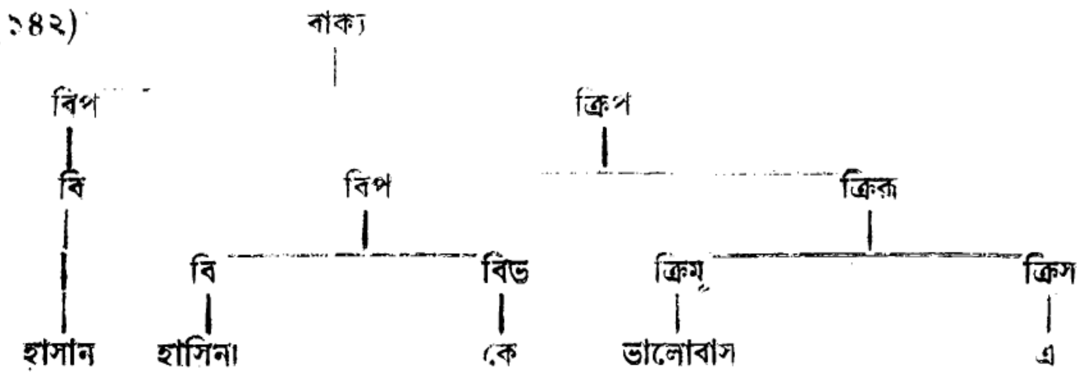

এ-গভীর সংগঠন বেশি গভীর নয়; এর সাথে বহিঃসংগঠনের দূরত্ব সামান্য। কিন্তু সৃষ্টিশীল অর্থতাত্ত্বিক ব্যাকরণে (১৪১)-এর 'আর্থ উপস্থাপন' হবে, অনেকটা, (১৪৩) (দ্র ম্যাককলি (১৯৬৮খ, ১৯৭০ক) :

(১৪৩)

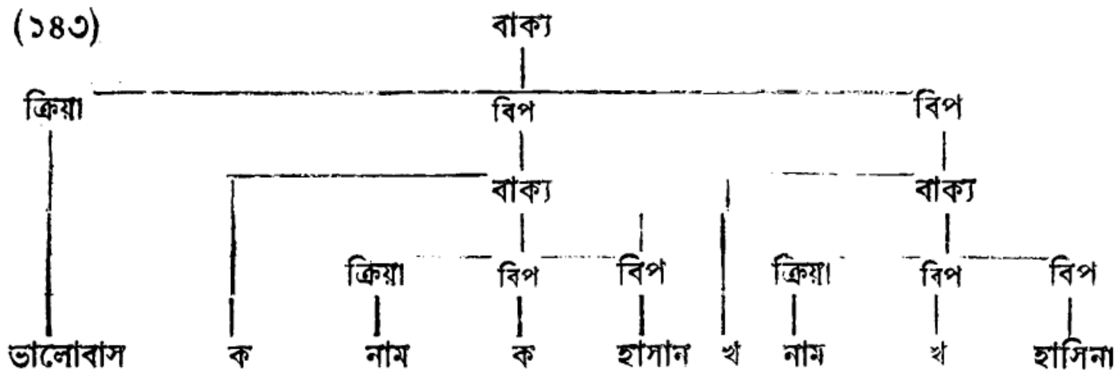

(১৪৩) সুদূর (১৪১) থেকে, এবং গভীর তল (১৪২) থেকে। কিন্তু এটিও যথেষ্ট গভীর নয়; তাই সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদীরা প্রবেশ করবেন, অনেকটা, (১৪৪)-এর মতো দূর গভীরে :

(১৪৪)

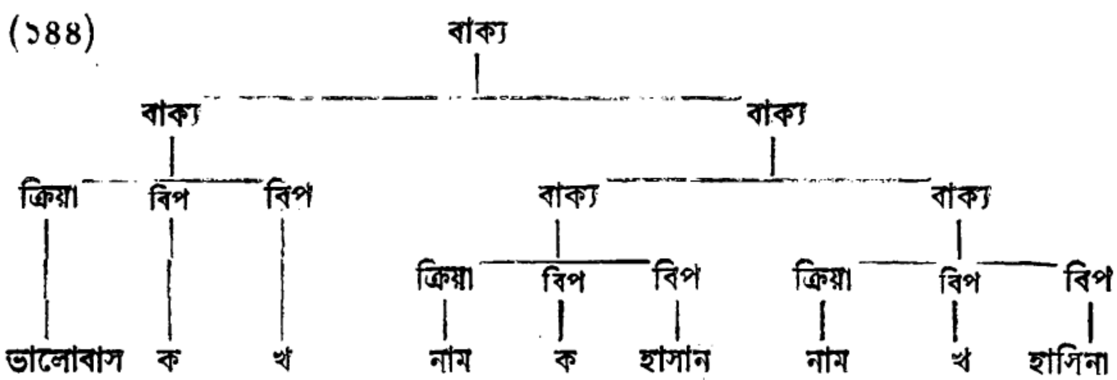

(১৪৪)-ও সম্ভবত যথেষ্ট গভীর নয়: 'ভালোবাস' ক্রিয়াকে ভেঙে ফেলা যায় নানা অর্থপরমাণু খণ্ডে। (১৪৪)-এর ওপর নানাবিধ রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ ক'রে সৃষ্টি করা হবে (১৪১)।

চমস্কীয় ব্যাকরণে ভিত্তিকক্ষের পদসাংগঠনিক সূত্র কর্তৃক সৃষ্ট উপান্তগ্রন্থিতে অভিধান থেকে শব্দসঞ্চার করা হয় একবারে—কোনো রূপান্তরসূত্র প্রয়োগের আগে।

প্রতিটি শব্দকে চমস্কীয় ব্যাকরণে বিবেচনা করা হয় নানাবিধ বাক্যিক-আর্থ-ধ্বনি-তাত্ত্বিক 'বৈশিষ্ট্যে'র গুচ্ছ ব'লে। প্রতিটি শব্দের সাথে যুক্ত 'আর্থবৈশিষ্ট্যগুচ্ছ' ব্যাকরণের আর্থকক্ষের সূত্রাবলি কর্তৃক পঠিত হয় ; এবং নির্দেশিত হয় বাক্যার্থ। কিন্তু সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদীরা শব্দের আর্থবৈশিষ্ট্যসমূহকে 'গুচ্ছ'-এ আবদ্ধ না রেখে তাদের বিভক্ত করেন বিভিন্ন 'আর্থপরমাণু'-তে ; এবং ওই পরমাণুরাশিকে বিন্যস্ত করেন বাক্যসংগঠনের মতো সংগঠনে। চমস্কীয় রীতিতে তাঁরা পদচিত্রের উপান্তগ্রন্থিতে একবারে শব্দসংক্রাম ঘটান না; বরং শব্দের 'আর্থপরমাণু'-সংগঠনের ওপর রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করেন শব্দের পূর্ণ অর্থবাহী একটি সংগঠন ; এবং বাক্য সৃষ্টির এক পর্যায়ে আর্থপরমাণু-সংগঠনকে প্রতিকল্পিত করেন উপযুক্ত বাস্তব শব্দের সাহায্যে। উদাহরণস্বরূপ একটি শব্দ—'মহিলা'—নেয়া যাক। 'মহিলা' শব্দের আভিধানিক সংজ্ঞা দেয়া যেতে পারে এ-ভাবে : 'মহিলা' হচ্ছেন সাবালক, স্ত্রীলিঙ্গসূচক, মনুষ্য। চমস্কীয় অভিধানে 'মহিলা' শব্দটি তার বাক্যিক–আর্থ–ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসহ গৃহীত হবে ; এবং এর আর্থবৈশিষ্ট্যরূপে দেখানো হবে এ-বৈশিষ্ট্যরাশি : 'মহিলা' : : [+সাবালক, +স্ত্রী, +মনুষ্য]। চমস্কীয় তত্ত্বে 'মহিলা' শব্দের অর্থ তা, যা নির্দেশিত হয় [+সাবালক, +স্ত্রী, +মনুষ্য] বৈশিষ্ট্যের সমবায়ে। চমস্কীয় তত্ত্বে আর্থবৈশিষ্ট্য অনুসারে শব্দার্থ নির্ণীত হয়, তবে বাক্যের গভীর তলে শব্দপুঞ্জকে আর্থবৈশিষ্ট্যের সংগঠন, বা পদচিত্ররূপে উপস্থাপন করা হয় না। কিন্তু সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্বে 'মহিলা'-শব্দসম্বলিত কোনো বাক্য সৃষ্টির সময় 'মহিলা' শব্দটিকে দেখানো হবে বাক্যের মূল 'বক্তব্য'-এর ('প্রোপজিশন') বহির্ভূত একটি 'বক্তব্য'-রূপে, এবং 'মহিলা' শব্দটির আর্থপরমাণুরাশিকে বিন্যস্ত করা হবে একটি বিমূর্ত সংগঠনরূপে। সৃষ্টিশীল অর্থতাত্ত্বিকেরা 'মহিলা' শব্দটির জন্যে, সম্ভবত, প্রস্তাব করবেন নিম্নরূপ সংগঠন :

(১৪৫)

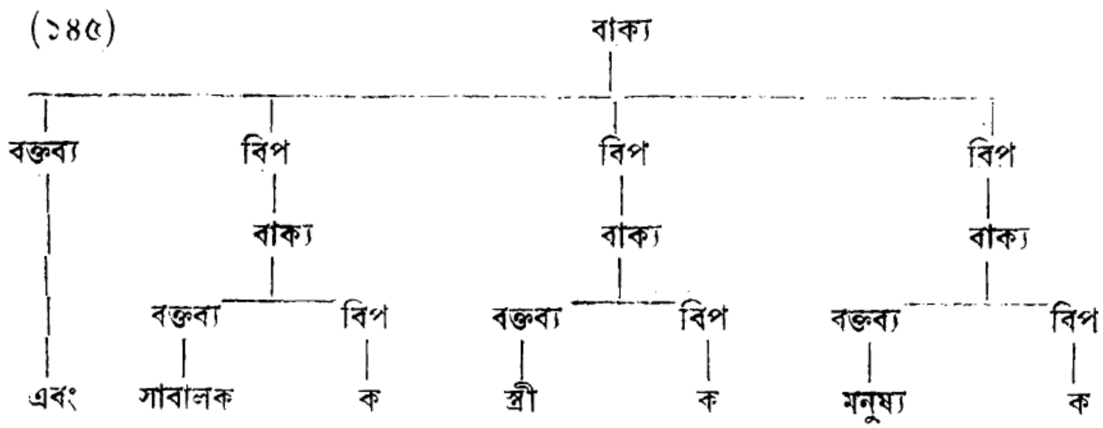

(১৪৫) অত্যন্ত বিমূর্ত : এটি ধারণ ক'রে আছে 'মহিলা' শব্দের আর্থপরমাণুরাশি। এ-সংগঠনের ওপর রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করা হবে এমন সংগঠন, যা এর তুলনায় অনেক বেশি মূর্ত ; এবং এক সময় সে-সংগঠনের বদলে ব্যবহার করা হবে বাস্তব শব্দ 'মহিলা'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব যে-বিমূর্ততামুখি, চমস্কির ব্যাকরণ তার তুলনায় অনেক মূর্ত। সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব বাক্যকে বিচূর্ণ ক'রে ফেলে গভীর তলে, যেখানে টিকে থাকে শুধু ক্ষীণ আর্থপরমাণুরাশি। এ-তত্ত্ব যেনো হানা দিতে চায় মস্তিষ্ক পর্যন্ত : হয়তো আমাদের মস্তিষ্ক বহন করে নানাবিধ আর্থপরমাণু, যা নানা রূপান্তর প্রয়োগে পরিণত হয় সংগঠনমণ্ডিত বাস্তব বাক্যে।

পরিভাষা

অ

অ-অন্তপ্রতীক Non-terminal symbol

অগণনীয় বিশেষ্য Non-count noun

অঘোষ Voiceless, Nonvoice

পরমাণুবাদী Atomism

অধীনতামূলক প্রকেন্দ্রিক সংগঠন Subordinate Endocentric construction

অনির্দিষ্ট Indefinite

অন্তগ্রন্থি Terminal string

অনুসন্ধানপ্রণালি Field Method

অপ্রধান গঠক-শ্রেণী Minor Form-class

অবস্থা State

অব্যবহিত-উপাদান Immediate Constituent

অভাষিক Non-linguistic

অভিধান Lexicon

অল্পপ্রাণ Nonaspirate

অকর্মক ক্রিয়া Intransitive verb

অগ্রবর্তী Anterior

অঘোষ স্বরধ্বনি Unvoiced vowel

অর্থগতভাবে সুগঠিত Semantically well-formed

অনাসিক্য ধ্বনি Nonnasal sound

অন্ত-উপাদান Ultimate constituent

অন্তপ্রতীক Terminal symbol

অপ্যারেটর Operator

অপ্রাকরণিক Non-technical

অবিলম্ব মুক্তি Nondelayed release

অব্যবহিত-উপাদান ব্যাকরণ Immediate Constituent Grammar

অভিজ্ঞতাবাদ Empericism

অর্থতত্ত্ব Semantics

অশুদ্ধ Ungrammatical, Incorrect

আ

আকস্মিক শূন্যতা Accidental gap

আচরণ Behaviour

আণবতত্ত্ব Atomism

আর্থ Semantic

আর্থকক্ষ Semantic Component

আংশিক অভিন্নতা নীতি Criterion of partial identities principle

আচরণবাদ Behaviourism

আত্মবাচক সর্বনামীয়করণ Reflexivization

আর্থ উপস্থাপন Semantic representation

আর্থ গভীর তল Semantic deep structure.

আর্থ তত্ত্ব Semantic theory
আর্থপরমাণু Semantic atom
আর্থ প্রজেকশন সূত্র Semantic projection rule
আর্থ ব্যাকরণ Semantically based grammar
আর্থ বৈশিষ্ট্য Semantic feature
আর্থ মানদণ্ড Semantic Criterion
আর্থ সম্পর্ক Semantic relation
আর্থ সংগঠন Semantic structure
আদর্শ পরিস্থিতি Ideal condition
আদর্শ বক্তাশ্রোতা Ideal speaker-hearer
আদর্শায়িত উপাত্ত Idealized data
আদিগ্রন্থি Initial string
আদিম ধারণা Primitive concept
আধার Form
আধিপত্য Dominance
আধেয় Content
আনুশাসনিক Prescriptive
আনুশাসনিক ব্যাকরণ Prescriptive grammar
আনুষঙ্গিক সম্পর্ক Associative relation
আন্তর ক্রমবিন্যাস Intrinsic order
আন্তর বৈশিষ্ট্য Inherent feature
আন্তর সংগঠন Internal structure
আবশ্যিক রূপান্তর(মূলক) সূত্র Obligatory transformational rule
আবিষ্কারপ্রণালি Discovery procedure
আভ্যন্তর সংগঠন Underlying structure
আবৃত Covered
আভিধানিক উপকক্ষ Lexical subcomponent
আভ্যন্তর সংগঠন Internal structure
আলজিহ্বা Uvular
আরোহী প্রথা/পদ্ধতি Inductive method
আস্পেক্ট Aspect
আহরিত বাক্য Derived sentence
আহরিত সংগঠন Derived sturcture
আহরতি অর্থ Derived meaning

উ

উক্তি Utterance
উচ্চ High
উচ্চ উপাদান-শ্রেণী Higher constituent class
উচ্চতর Higher
উচ্চারক Articulator
উৎপাদন Production
উদ্দীপক Stimulus
উপগ্রন্থি Substring
উপপদগত Subcategorial
উপভাষা Dialect
উপযুক্ততার বহিঃশর্ত External condition of adequacy
উপশ্রেণীকরণ Subcategorization
উপাত্ত Corpus, Data
উপস্থাপন Representation
উপান্তগ্রন্থি Preterminal string
উপাদান Constituent

এ

এক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর Singulary transformation

একাধিক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর Generalized transformation

ঐ

ঐচ্ছিক Optional

ঐচ্ছিক রূপান্তর (মূলক) সূত্র Optional transformational rule

ও

ওষ্ঠ্য Labial

ক

কন্যা Daughter

কভারপ্রতীক (আবরণপ্রতীক) Cover symbol

কর্তা Subject

কর্তা-ক্রিয়া সংগতি Subject-Verb concord

কর্তা-থেকে-কর্মে-উন্নয়ন Subject to object promotion

কর্তৃবাচ্য Active voice

কর্ম Object

কর্মবাচ্য Passive voice

করোনাল Coronal

কল্পজগত-রচয়িতা ক্রিয়া World-creating verb

কক্ষ Component

কাঠামো Framework

কারক Case

কারক ব্যাকরণ Case Grammar

কাল Tense

কালকেন্দ্রিক Synchronic

কালকেন্দ্রিক ভাষাবিজ্ঞান Synchronic Linguistics

কালানুক্রমিক Diachronic

কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান Diachronic Linguistics

ক্যাটেগরি Category

ক্রমবিন্যস্ত Ordered

ক্যাটেগরি প্রতীক Category symbol

ক্রমস্তরিক বিন্যাস Hierarchical Order

ক্রমবিন্যাসগত বিরোধ Ordering paradox

ক্রিয়া Verb

ক্রমহীন Unordered

ক্রিয়াবিশেষণ Adverb

ক্রিয়াপদ Verb Phrase

কেন্দ্র-শাখায়ন Centre-branching

ক্রিয়ারীতি Aspect

খ

খণ্ড Segment

খণ্ডন Segmentation

গ

গঠক-শ্রেণী Form-class

গভীর তল/সংগঠন Deep structure

গভীরতাতত্ত্ব/প্রকল্প Depth hypothesis

গলনালীয় Pharyngeal

গ্রথিত বাক্য Embedded sentence

গ্রন্থন Embedding, Concatenation

গ্রন্থনপ্রতীক Concatenating symbol

গ্রন্থন-রূপান্তর Embedding transformation

গ্রন্থি String

গ্রহণযোগ্যতা Acceptibility

গাঠনিক রূপতত্ত্ব Derivational Morphology

ঘ

ঘটমান Progressive

ঘোষ Voiced

ঘোষণামূলক বাক্য Declarative sentence

ঘোষধ্বনি Voiced sound

ঘোষায়ন Voicing

ঘৃষ্টধ্বনি Affricate

চ

চমস্কীয় বিপ্লব Chomskyan revolution

চক্রাবর্তন নীতি Cyclic principle

চিরসঙ্গনীতি Criterion of constant association

চৈতন্যবাদ Mentalism

চৈতন্যবাদী তত্ত্ব Mentalist theory

জ

জটিল গ্রন্থি Complex string

জটিল বাক্য Complex sentence

জটিল রূপ Complex form

জড়বাদীতত্ত্ব materialistic theory

জাতি Genus

জিহ্বামূলীয় Velar

জৈবিকভাবে Genetically

ড

ডান-পৌনপুনিক সূত্র Right-recursive rule

ডান-শাখায়ন Right-branching

ডামিপ্রতীক Dummy symbol

ত

তল Plane

তত্ত্ব Theory

তত্ত্ব-বৈধকরণ Theory validation

তথ্য Data, Facts

তথ্যদাতা Informant

তরলধ্বনি Liquid

তালব্য-দন্তমূলীয় অঞ্চল Palato-alveolar region

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব Comparative Philology

তুলনামূলক ব্যাকরণ Comparative grammar

তির্যক শ্রেণীকরণ Cross-classification

তৃতীয় পুরুষ Third person

তৃতীয় বন্ধনি Third bracket, Square bracket

দ

দন্তমূলীয় Alveolar

দন্ত্য Dental

দল Syllable

দার্শনিক ব্যাকরণ Philosophical grammar

দুর্বল Weak

দুর্বলভাবে সমতুল্য Weakly equivalent

দুর্বল সৃষ্টিশক্তি Weak generative capacity

দ্বিতীয় পুরুষ Second person

দ্বিতীয় বন্ধনি Second bracket, Brace

দ্বিতীয় শব্দসংক্রাম Second Lexicalization

দ্বিভাষা Diglossia

দ্বিমুখি Binary

দ্বিমুখি বৈপরীত্য Binary opposition

দ্বিসাংগঠনিক Doubl. articulated

দ্ব্যর্থ Ambiguous

দ্ব্যর্থতা Ambiguity

দ্বৈতক্রস Double-cross

দৃঢ় Tense

দৃশ্যমান উপাত্ত Observable data

ধ

ধ্বনি Phone, sound

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য Phonological feature

ধ্বনি(ক) উপস্থাপন Phonetic representation

ধ্বনিবিজ্ঞান Phonetics

ধ্বনিখণ্ড Sound segment

ধ্বনিমূল Phoneme

ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ Phonological conditioning

ধ্বনিমূলপরম্পরা Phoneme-sequence

ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তর Phonological level

ধ্বনিমূলিক উপস্থাপন Phonemic representation

ধ্বনিক-আর্থ-সাদৃশ্য Phonetic-semantic resemblance

ধ্বনিরূপ Phonetic form

ধ্বনিমূল--শ্রেণী Phoneme-class

ধ্বনি-শ্রেণী Sound-class

ধ্বনি-একক Sound unit

ধ্বনিপ্রতীকতা Sound-symbolism

ধ্বনি-উপাত্ত Phonetic data

ধ্বনিলিপি Phonetic transcription

ধ্বনিতত্ত্ব Phonology

ন

নঞর্থক Negative

নবব্যাকরণবিদ Neogrammarian

নামবাচক বিশেষ্য Proper noun

নির্দিষ্ট Definite

নির্দিষ্টায়ন রূপান্তর Definitization transformation

নির্দেশক Deictic

নাদ Strident

নাসিক্য ব্যঞ্জন Nasal consonant

নিম্ন Low

নিম্ন উপাদান-শ্রেণী Lower constituent-class

নিম্নস্তর Lower level

নির্বিশেষীকরণ Generalization

নির্বিশেষ ভাষিক তত্ত্ব General linguistic theory

নির্মিত বস্তু Artifact

নিরুক্ত Etymology

নিষেধচিহ্ন Negative marker

নিষেধ(াত্মক) রূপান্তর Negative transformation

নিয়ন্ত্রণবাদ Determininsm

নৈর্ব্যক্তিকতা Impersonality

প

পদ Phrase

পদ Category

পদগত বিপর্যয় Categorial deviance

পদগত বৈশিষ্ট্য Categorial feature

পদচিত্র Phrase marker

পদশ্রেণীকরণ Categorization

পদসংগঠন Phrase structure

পদসাংগঠনিক উপকক্ষ Phrase structure Subcomponent

পদসাংগঠনিক কক্ষ Phrase structure component

পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ Phrase structure grammar

পদসাংগঠনিক সূত্র Phrase structure rule

পদার্থ Physical

পংক্তি Row

পরম্পরা Sequence

পরমাণুবাদ Atomism

পরমাণুবাদীতত্ত্ব Atomist Theory

পরিচ্ছেদাংশ Section

পরিপূরক বণ্টননীতি Criterion of complementary distribution

পরিমিতি Economy

পর্যবেক্ষণ Observation

পর্যবেক্ষণাত্মক যোগ্যতা Observational adequacy

পরোক্ষ আধিপত্য Indirect dominance

পরোক্ষ কর্ম Indirect object

পশ্চাৎ Back

প্রকল্পনা Speculation

প্রকাশস্তর Expression-palne

প্রকেন্দ্রিক সংগঠন Endocentric construction

প্রচলিত ব্যাকরণ Traditional grammar

প্রজাতি Species

প্রণালিপদ্ধতি Method and procedure

প্রতিকল্পন Substitution

প্রতিকল্পন-শ্রেণী Substitution-class

প্রতিবেশ Environment

প্রতিবেশিক বৈশিষ্ট্য Contextual feature

প্রতিবেশকাতর (নিয়ন্ত্রিত) পদসাংগঠনিক Context-sensitive (restricted)
সূত্র Phrase structure rule

প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক সূত্র Context-free phrase structure rule

প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় Proto-Indo-European

প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা Symbolic logic

প্রত্যক্ষ কর্ম Direct object

প্রধান গঠক-শ্রেণী Major form-class

প্রথম পুরুষ First person

প্রথম শব্দসংক্রাম First lexicalization

প্রলম্বিত Continuant

প্রশ্নবোধক সর্বনাম Interrogative pronoun

প্রক্ষেপণ সূত্র Projection rule

পারস্পরিক স্থানান্তর Permutation

প্রাকরণিক Technical

প্রতিকল্পনিক রূপান্তর Substitution transformation

প্রাথমিক উপাত্ত Primary data

পিতৃভাষা Parent Language

পুংলিঙ্গ Masculine gender

পুনর্লিখন Rewriting

পুরুষ Person

পৌনপুনিক সূত্র Recursive rule

প্রতিবেশকাতর (নিয়ন্ত্রিত) সূত্র Context-sensitive (restricted) rule

প্রতিবেশমুক্ত সূত্র Context-free rule

প্রত্যয় Suffix

প্রত্যয়ান্ত ভাষা Inflectional language

প্রতীক Symbol

প্রত্যক্ষ আধিপত্য Direct dominance

প্রথা Convention

প্রথম চক্র / বৃত্ত First cycle

প্রথম বন্ধনি First bracket, round bracket

প্রশ্নবোধক রূপান্তর Interrogative transformation

প্রশ্ন-নির্দেশক Interrogative deictic

প্রস্তাব Proposition

পারস্পরিক নির্বাচন Cooccurence restriction

পার্শ্বিক Lateral

প্রাকল্পনিক ব্যাকরণ Speculative grammar

প্রাত্যয়িক রূপতত্ত্ব Inflectional morphology

প্রাণীবাচক বিশেষ্য Animate noun

পুঙ্খানুপুঙ্খতা Exhaustiveness

পুনরুদ্ধারযোগ্য Recoverable

পুনর্লিখন সূত্র Rewrite rule

পৌনপুনিক নীতি / তত্ত্ব Recursive principle

ব

বক্তার উদ্দীপক Speaker's stimulus

বণ্টন Distribution

বণ্টনিত Distributed

বদ্ধরূপ Bound-form

বচন Number

বণ্টনিক বাক্যতত্ত্ব Distributional syntax

বণ্টন-শ্রেণী Distribution-class

বদ্ধ রূপমূল Bound morpheme

বন্ধনীকরণ Bracketting

বর্জন Deletion

বর্ণনা Description

বর্ণনাত্মক যোগ্যতা Descriptive adequacy

বর্ণনামূলক Descriptive

বর্ণনামূলক ব্যাকরণ Descriptive grammar

বর্তুল Round

বর্তুল বাক্য Rounded sentence

বস্তু Object

বস্তু ও প্রক্রিয়া Item and Process

বস্তু ও বিন্যাস Item and arrangement

বস্তুবাচক বিশেষ্য Nonanimate noun

বহির্তল Surface structure

বহিঃসংগঠন Surface structure

বাক্য Sentence

বাক্যাংশ Parts of speech

বাক্যিক কক্ষ Syntactic component

বাক্যকাঠামো Sentence-frame

বাক্যিক ক্যাটেগরি Syntactic category

বাক্যতত্ত্ব Syntax

বাক্যিক গভীর তল Syntactic deep structure

বাক্যিক দ্ব্যর্থতা Syntactic ambiguity

বাক্যিক বহিঃসংগঠন Syntactic surface structure

বাক্যিক বৈশিষ্ট্য Syntactic feature

বাক্য-শ্রেণী Sentence-type

বাক্যিক সংগঠন Syntactic structure

বাছাই Choice

বাচ্য Voice

বাঁ-শাখায়ন Left-branching

বাম-পৌনপুনিক সূত্র Left-recursive rule

বাস্তবায়ন Realization

বাহ্যিক ক্রমবিন্যাস Extrensic ordering

বাহুল্য বৈশিষ্ট্য Redundant feature

বাহুল্য সূত্র Redundancy rule

বিকল্প Substitute, Alternative

বিকল্প উদ্দীপন Substitute stimulus

বিকল্প সম্প্রসারণ Alternative expansion

বিকেন্দ্রিক সংগঠন Exocentric construction

বিঘ্নিত ধ্বনি Obstruent

বিচ্ছিন্ন উপাদান Discontinuous constituent

বিধেয় Predicate

বিন্যাসসংগতিনীতি Criterion of pattern congruity

বিবৃতিধর্মী-না-সূচক সংগঠন Declarative negative construction

বিবৃতিধর্মী-হ্যাঁ-সূচক সংগঠন Declarative affirmative construction

বিভক্তি Case-marker

বিভাজন Division

বিমূর্ত বিশেষ্য Abstract noun

বিপ্রতীপ Contrastive

বিলগ্ন উপাদান Discontinuous constituent

বিশেষ্যপদ Noun Phrase

বিশ্লিষ্ট ভাষা Isolating language

বিশৃঙ্খলাবাদ Anomalist

বিশ্লেষাত্মকতা Analyticity

বিষয়গত সর্বজনীনতা Substantive universal

বুলিয়ান বিশ্লেষণ Boolean Analysis
ব্যুৎপত্তি Derivation
ব্যুৎপত্তিশাস্ত্র Etymology
বৃত্তাকার Circular
বৃন্ত Node
বৃন্তনাম Node-label
বৃক্ষচিত্র Tree-diagram
ব্লুমফিল্ডীয় Bloomfieldian
ব্লুমফিল্ডীয় ভাষাবিজ্ঞান Bloomfieldian linguistics
বেনজিনচক্র Benzene-ring
বোধ Notion, Concept
ব্যঞ্জন Consonant
ব্যত্যয় Anomaly
ব্যাখ্যাত্মক যোগ্যতা Explanatory adequacy
ব্যবহারিক ব্যাকরণ Grammar of usage
ব্যাকরণ Grammar
ব্যাকরণিক গঠক-শ্রেণী Grammatical form-class
ব্যাকরণিক বস্তু Grammatical element
ব্যাকরণিক সম্পর্ক Grammatical relation
ব্যাকরণিক সূত্র Grammatical rule
ব্যাকরণসম্মত Grammatical
ব্যাকরণসম্মতি Grammaticalness
বৈপরীত্য Contrast
বৈপরীত্যসূচক Contrastive
বৈপরীত্যসূচক বণ্টন Contrastive distribution

ভ

ভাষিক রূপ Linguistic form
ভাষাবৃত্ত Language system
(ভাষা)বোধ Competence
(ভাষা)প্রয়োগ Performance
ভূমিকা Function
ভূমিকা-শব্দ Function-word
ভাষা-অর্জন Language acquisition
ভাষা-সর্বজনীনতা Language universal
ভাষা-অর্জন-কল Language acquisition device
ভাষিক সর্বজনীনতা Linguistic universal
ভূমিকাগত ক্যাটেগরি Functional category
ভাষ্যাত্মক Interpretive
ভিত্তি উপকক্ষ Base subcomponent
ভাষিক প্রতীক Linguistic symbol
ভিত্তি কক্ষ Base component
ভিত্তিসূত্র Base rule
ভিত্তিগ্রন্থি Base string
ভিত্তি পদচিত্র Base phrase marker
ভবিষ্যদ্বাণী Prediction
ভাষিক তত্ত্ব Linguistic theory
ভাব Mood
ভাষাবিজ্ঞান Linguistics
ভাষাতত্ত্ব Philology, Linguistics
ভাষিক Linguistic
ভগিনী Sister

ম

মধ্যগ্রন্থি Intermediate string

মধ্যসংগঠন Intermediate structure

মনুষ্যবাচক বিশেষ্য Human noun

মাত্রা Degree

মান ইংরেজি Standard English

মান ভাষা-রূপ Standard language

মিশ্রপ্রতীক Complex-symbol

মুক্ত রূপ Free-form

মুখ্যকর্ম Direct object

মূর্ধন্য Retroflex

মূল্যায়নপ্রণালি Evaluation procedure

মৌলবাক্য Kernel sentence

মৌল সংগঠন Base structure

মধ্যবাচ্য Middle voice

মনোভাষাবিজ্ঞান Psycholinguistics

মহাপ্রাণ Aspirate

মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান American structural linguistics

মানতত্ত্ব Standard theory

মানরূপ Satndard form

মুক্ত রূপমূল Free morpheme

মুখগহ্বর Oral cavity

মুখ্য ক্রিয়া Main verb

মূলভাষা Ursprache

ম্যাট্রিকস Matrix

মৌল গ্রন্থি Base string

য

যন্ত্রবাদ Mechanistic Theory

যান্ত্রিকভাবে Mechanically

যোগ্যতার শর্ত Conditions of adequacy

যৌক্তিক কর্তা Logical subject

যৌগিক বাক্য Coordinate (conjoined) sentence

যান্ত্রিকতাবাদ Mechanistic Theory

যুগ্ম বাক্য Coordinate sentence

যোগ্যতার স্তর Levels of adequacy

যৌগিক প্রকেন্দ্রিক সংগঠন Coordinate Endocentric construction

যৌগিক রূপান্তর Coordinating transformation

র

রণনশীল Sonorant

রূপগত Formal

রূপগত ব্যাকরণ Formal grammar

রূপতাত্ত্বিক স্তর Morphological level

রূপধ্বনিমূল Morphophoneme

রূপ Form

রূপতত্ত্ব Morphology

রূপগত সর্বজনীনতা Formal universal

রূপধ্বনিতাত্ত্বিক Morphophonological, Morphophonemic

রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ Morphophonological component

রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র Morphophonological rule
রূপমূল Morpheme
রূপমূলপরম্পরা Morpheme-sequence
রূপমূলপ্রতীক Morpheme-symbol
রূপমূলিক খণ্ড Morphemic segment
রূপমূল-শ্রেণী morpheme-class
রূপ-শ্রেণী Form-class
রূপান্তর Transformation
রূপান্তর Variation, Alternant
রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ Transformational Generative grammar
রূপান্তর(সাধক) কক্ষ Transformational component
রূপান্তরবাদী Transformationalist
রূপান্তর(মূলক) উপকক্ষ Trnasformational Subcomponent
রূপান্তর(মূলক) সূত্র Transformational rule

ল

লিঙ্গ Gender
লুপ Loop

শ

শক্তিমান Strong
শক্তিমানভাবে সমতুল্য Strongly equivalent
শক্তিমান সৃষ্টিশক্তি Strong generative capacity
শনাক্তি Identification
শনাক্তকরণ Identification
শব্দ Word
শব্দগঠনিক রূপতত্ত্ব Derivational morphology
শব্দ ও শব্দ-শ্রেণী Word and paradigm
শব্দক্রম Word-order
শব্দপ্রতীক Word-symbol
শব্দবাদী Lexicalist
শব্দবস্তু Word-item
শব্দ-শ্রেণী Word-class
শব্দসংক্রাম Lexicalization
শব্দসামঞ্জস্যনীতি Criterion of consistency of words
শর্ত Condition
শংসামূলক অর্থতত্ত্ব Referential semantics
শাখায়নপ্রণালি Branching method
শাব্দসূত্র Lexical rule
শারীরবাদ Physicalism
শির Head
শুদ্ধ Correct
শুদ্ধতা Correctness
শ্রুতিধ্বনি Glide
শূন্যপ্রতীক Null-symbol
শূন্যবস্তু Zero-element
শেষ চক্র Last cycle
শৃঙ্খলাবাদী Analogist
শৃঙ্খলিত Concatenated
শ্রেণী Class
শ্রেণীকরণ Classification
শ্রেণীকরণী ভাষাবিজ্ঞান Taxonomic Linguistics
শ্রেণীপ্রতীক Class-symbol
শ্রোতার সাড়া Hearer's response

স

সকর্মক ক্রিয়া Transitive verb

সংখ্যাশব্দ Quantifier

সংগতিবিধি Concord, Agreement

সংগতিসূত্র Selectional rule

সংগতিবিধি Selectional restriction

সংযোজক Conjunction

সংযোজন Addition

সমধ্বনিক রূপ Homophonous form

সমনির্দেশক Coreferential

সমবায়ী কাঠামো Compositional framework

সম্পূরকীকরণ Complementation

সম্পূরক বাক্য Complement sentence

সংপ্রসারিত মানতত্ত্ব Extended standard theory

সমাজভাষাবিজ্ঞান Sociolinguistics

সম্বন্ধাত্মক (খণ্ড) বাক্য Relative (clause) sentence

সম্মানাত্মক Honorific

সরল বিবৃতিধর্মী-হ্যাঁ-সূচক বাক্য Simple declarative affirmative sentence

সরল রৈখিক Linear

সর্বজনীন ভাষিক তত্ত্ব Universal linguistic theory

সর্বনাম Pronoun

সহজাত বৈশিষ্ট্য Inherent feature

সহধ্বনিমূল Allophone

সহাবস্থান Cooccurence

স্তম্ভ Column

স্তরক্রম Hierarchy

স্বগ্রথিততা Self-embedding

সংকলনধর্মিতা Cumulative

সংখ্যাবাচক বিশেষ্য Count noun

সংগতি বৈশিষ্ট্য Selectional feature

সংগঠন Construction, Structure

সংযুক্ত প্রশ্ন Tag-question

সংযোগচিহ্ন Concatenation symbol

সংক্ষেপক Abbreviator

সমধ্বনিক শব্দ Homophonous word

সমনির্দেশক সূচি Coreferential index

সম্পর্কিত বাক্য Related sentence

সম্পূরকচিহ্ন Complementizer

সম্প্রসারণী রীতি Expansionist method

সমার্থক Synonymous

সমার্থকতা Synonymy

সমাপ্ত ব্যুৎপত্তি Terminated derivation

সমীকরণ Equation

সরল রূপ Simple form

সরল সংগঠন Simple construction

সর্বজনীন ভাষিক বৈশিষ্ট্য Universal linguistic feature

সসীম অবস্থার ব্যাকরণ Finite state grammar

সহজাত বোধ Innate idea

সহরূপমূল Allomorph

সহায়ক সংগঠন Constituent structure

স্তর Level

স্ত্রীলিঙ্গ Feminine gender

স্বগ্রথিত সংগঠন Self-embedded structure

স্ববিরোধিতা Self-contradictoriness

স্বভাববাদ Physis

স্বরতন্ত্রি Vocal cord

স্বরতন্ত্রি এলাকা Vocal tract

স্বরযন্ত্র Larynx

স্বরিত vocalic

স্বয়ংক্রিয় সাংগঠনিক বর্ণনা Automatic structural description

সাংগঠনিক দ্ব্যর্থতা Structural ambiguity

সাংগঠনিক সংকেত Structural index

সাংগঠনিক বর্ণনা Structural description

সাংগঠনিক রূপান্তর Structural transformation

সাধারণীকরণ Generalization

সাধারণত্ব শর্ত Condition of generality

সাধারণ বিশেষ্য Common noun

সামঞ্জস্য Consistency

সাম্পর্কিক Relational

সাম্পর্কিক বোধ Relational notion

সাবালক Adult

সাম্য Equivalence

সাড়া Response

স্থানান্তরণ Extraposition

স্থানিক বৈশিষ্ট্য Local feature

স্বাতন্ত্রিক অর্থ Differential meaning

স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য Distinctive feature

স্বাধীন রূপান্তর Free variation

স্বাভাবিক শ্রেণী Natural class

স্বাভাবিক সাড়া Natural response

স্বায়ত্তশাসিত Autonomous

স্বায়ত্তশাসিত বাক্যতত্ত্ব Autonomous syntax

স্বায়ত্তশাসিত ভাষাবিজ্ঞান Autonomous linguistics

সাংগঠনিক অর্থ Structural meaning

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান Structural linguistics

সাংগঠনিক সম্পর্ক Structural relation

সিদ্ধান্তপ্রণালি Decision procedure

স্কিমা Schema

স্পৃষ্টধ্বনি Stop

সৃষ্টিশীল Generative

সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব Generative semantics

সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদী Generative semanticist

সৃষ্টিশীল ধ্বনিতত্ত্ব Generative phonology

সীমাচিহ্ন Boundary symbol

সুমিতি Symmetry

সুস্পষ্ট Explicit

সুশৃঙ্খল ধ্বনিতত্ত্ব Systematic Phonology

সুষম ভাষাসমাজ Homogenous language community

সূত্র Rule

সূক্ষ্ম উপশ্রেণীকরণ বৈশিষ্ট্য Strict subcategorization feature

হ

হ্রস্বীকরণীরীতি Reductionist method

ক্ষ

ক্ষুদ্রতম (শব্দ)জোড় Minimal pair

রচনাপঞ্জি : নির্বাচিত

দু-শ্রেণীর রচনা গৃহীত হয়েছে এ-রচনাপঞ্জিতে : (ক) এক শ্রেণীর রচনা সরাসরি সাহায্য করেছে এ-প্রবন্ধ রচনায় ; এবং (খ) অন্য একরাশ রচনা সাহায্য করেছে পরোক্ষভাবে, তাই সে-সবের প্রতি নানা স্থানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে প্রবন্ধদেহে। রচনাপঞ্জিতে গ্রন্থজাতীয় রচনাবলিকে নিম্নরেখান্বিত করা হয়েছে, আর প্রবন্ধনিবন্ধ শ্রেণীর রচনারাশিকে ঘিরে দেয়া হয়েছে একক-উর্ধ্বকমায়। সর্বাধুনিক রীতিতে রচিত এ-রচনাপঞ্জিটিকে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ক'রে রাখা হয়েছে মূল প্রবন্ধের সাথে। উৎস-নির্দেশের চলিত প্রণালি পরিহার ক'রে উৎসনির্দেশ করা হয়েছে প্রবন্ধদেহেই। এখানে পাওয়া যাবে এমন নির্দেশ—(চমস্কি (১৯৫৭, ১০))। সংকেতটি নির্দেশ করছে চমস্কির ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত রচনার ১০ পৃষ্ঠার প্রতি। পাঠকদের রচনাপঞ্জির সহায়তায় খুঁজে নিতে হবে তথ্য-উৎস। রচনাপঞ্জিতে প্রতিটি রচনার প্রথম প্রকাশ তারিখ দেয়া হয়েছে ; কিন্তু যে-সব ক্ষেত্রে আমি ব্যবহার করেছি অন্য সংস্করণ, সেখানে কোন সালে প্রকাশিত সংস্করণটি আমি ব্যবহার করেছি, তা জানানো হয়েছে রচনাবিবরণীতে। যেমন : চমস্কি (১৯৫৭)-র সাথে সংলগ্ন গ্রন্থটির বিবরণীতে যদি পাওয়া যায় ১৯৬০-এর উল্লেখ, তবে বুঝতে হবে যে ওই গ্রন্থটির ১৯৬০-এর সংস্করণ আমি ব্যবহার করেছি।

সংক্ষেপসূত্র

FL — *Foundations of Language.* International Journal of Language and Philosophy Dordrecht, Holland.

IJAL — *International Journal of American Linguistics.* Baltimore.

JL — *Journal of Linguistics.* The Journal of the Linguistics Association of Great Britain. London and New York.

Lg — *Language.* Journal of the Linguistics Society of America. Baltimore.

LI — *Linguistic Inquiry.* The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Allen, H B (ed., 1958)

Readings in Applied English Linguistics. Indian Edition, 1972. Amerind Publishing Co., New Delhi, India.

Anderson, J M (1971)

The Grammar of Case. Cambridge University Press, London.

Bach, E and R T Harms (eds., 1968)

Universals in Linguistic Theory. New York : Holt, Rinehart and Winstin Inc.

Bach, E (1968)

'Nouns and Noun Phrases'. In Bach and Harms (1968).

———(1971)

'Syntax Since *Aspects*.' In O'Brien (1971).

Bierwisch, M (1970)

'Semantics'. In Lyons (1970).

———(1971)

'On Classifying Semantic Features'. In Stienberg and Jakobovits (1971).

Bush, J T (1973)

The Scientific Approach. Academic Press : London and New York.

Bloomfield, L (1926)

'A Set of Postulates for the Science of Language'. In Joos (1957).

———(1933)

Language Allen and Unwin Ltd : London, 1965.

Botha, R P (1968)

The Function of the Lexicon in Transformational Generative Grammar. Mouton : The Hague.

Carroll, J B (1953)

The Study of Language. A Study of Linguistics and Related Disciplines in America. Cambridge, Mass : Harvard University Press.

Chomsky, N (1956)

'Three Models for the Description of Language'. *IRE Transactions on Information Theory,* IT-2 : 113-24.

———(1957)

Syntactic Structures. Mouton : The Hague.

———(1958)

'A Transformational Approach to Syntax.' In Fodor and Katz (1964).

———(1959)

'A Review of B F Skinner's *Verbal Behavior*. In Fodor and Katz (1964).

———(1961a)

'On the Notion "Rule of Grammar".' In Fodor and Katz (1964).

———(1961b)

'Some Methodological Remarks on Generative Grammar'. In Allen (1958).

———(1961c)

'Degrees of Grammaticalness'. In Fodor and Katz (1964).

———(1964a)

Current Issues in Linguistic Theory. The Hague : Mouton.

———(1965)

Aspects of the Theory of Syntax. The MIT Press, Cambridge, Mass.

———(1966a)

Cartesian Linguistics : A Chapter in the History of Rationalist Thought. New York : Harper and Row.

———(1966b)

Topics in the Theory of Generative Grammar. The Hague : Mouton.

———(1968)

Language and Mind. New York : Harcourt, Brace and World.

———(1971)

'Deep Structure, Surface Structure and Semantic Interpretation'. In Stienberg and Jakobovits (1971).

———(1972)

Studies on Semantics in Generative Grammar. The Hague : Mouton.

———(1975)

Reflections on Language. New York : Pantheon Books.

———and Morris Halle (1968)

The Sound Pattern of English. New York : Harper and Row.

Dinneen, F P (1967)

An Introduction to General Linguistics. Holt, Rinehart and Winston Inc., New York.

Ferguson, C A and Munier Chaudhury (1960)

'The Phonemes of Bengali'. Lg, Vol 36, No 1, 23-59.

Fillmore, C J (1966a)

'Toward a Modern Theory of Case'. In Reibel and Schane (1969).

————(1966b)

'A Proposal Concerning English Prepositions'. In Dinneen, F P (ed.,). Monograph Series on Languages and Linguistics, No 19, Georgetown University Press, Washington.

————(1968a)

'The Case for Case'. In Bach and Harms (1968).

————(1968b)

'Lexical Entries for Verbs'. In FL, 4, 373-393.

————(1969)

'Types of Lexical Information'. In Steinberg and Jakobovits (1971).

————(1971)

'Some Problems for Case Grammar'. In O'Brien (1971).

————and D T Langendoen (eds., 1971)

Studies in Linguistic Semantics. Holt, Rinehart and Winston, New York.

Fodor, J A and J J Katz (eds., 1964)

The Sturcture of Language Readings in the Philosophy of Language.

Prentice-Hill Inc., New Jersey.

Fries, C C (1952)

The Structure of Engilsh. Harcourt, Brace and World, New York.

————(1961)

'Advances in Linguistics'. In Allen (1958).

Fudge, E C (ed., 1973)

Phonology. Penguin Books.

Gleason, H A (1955)

An Introduction to Descriptive Linguistics. Oxford and IBH publishing Co., 1970, India.

Gleitman, L R (1965)

'Coordinating Conjunctions in English'. In Reibel and Schane (1969).

Green, J (1972)

Psycholinguistics Chomsky and Psychology. Penguin Education, 1974.

Greenberg, J H (1966)

Language Universals. The Hague : Mouton.

Halhed, N B (1978)

Grammar of the Bengali Language. Hoogly.

Halle, M (1959)

The Sound Pattern of Russian. The Hague : Mouton.

——————(1962)

'Phonology in Generative Grammar'. In Fodor and Katz (1964).

Harman, G (ed., 1974)

On Noam Chomsky. Anchor Books : New York.

Harris, Z S (1942)

'Morpheme Alternants in Linguistic Analysis'. In Joos (1957).

——————(1946)

'From Morpheme to Utterance'. In Joos (1957).

——————(1951)

Structural Linguistics : Formerly entitled *Methods in Structural Linguistics,* University of Chicago Press, 1963, Chicago.

——————(1954)

'Distributional Structure'. In Fodor and Katz (1964),

————(1957)

'Cooccurence and Transformation in Linguistic Structure'. In Fodor and Katz (1964).

Hill, A (1961)

'Grammaticality'. In Allen (1958).

Hockett, C F (1947)

'Problems of Morphemic Analysis'. In Joos (1957).

————(1948)

'A Note on 'Structure'.' In Joos (1957).

————(1954)

'Two Models of Grammatical Description'. In Joos (1957).

————(1958)

A Course in Modern Linguistics. Oxford and IBH Publishing Co., 1970, India.

Huddleston, R (1976)

An Introduction to Engilsh Transformational Syntax. Longman : London.

Hymes, D (1972)

'Review of *Noam Chomsky*'. In Harman (1974).

Jackendoff, R C (1972)

Semantic Interpretation in Generative Grammar. MIT Press, Mass.

Jacobs, R A and P S Rosenbaum (eds., 1970)

Readings in English Transformational Grammar. Ginn and Co., Mass.

Jacobsen, B (1977)

Transformational Generative Grammar. North-Holland Publishing Company: Amsterdam.

Jakobson, R and M Halle (1956)

Fundamentals of Language. Mouton.

Joos, M (ed. 1957)

Readings in Linguistics. The Development of Descriptive Linguistics in America since 1925. American Council of Learned Societies, Washington.

Katz J J (1964)

'Semi-Sentences'. In Fodor and Katz (1964).

———(1972)

Semantic Theory. New York : Harper and Row.

———and J A Fodor (1963)

'The structure of a Semantic Theory'. In Fodor and Katz (1964).

———and P M Postal (1964)

An Integrated Theory of Linguistic Descriptions. MIT Press, Mass.

Kempson, R M (1977)

Semantic Theory. Cambridge University Press, Cambridge.

Klima E S (1964)

'Negation in English' In Fodor and Katz (1964).

Koutsoudas, A (1966)

Writing Transformational Grammars An Introduction. McGraw-Hill.

Kuhn, T (1962)

The Structure of Scientific Revolutions. Chicago U Press.

Lakoff, G (1970)

Irregularity in Syntax : TAS in Linguistics, New York.

———(1971)

'On Generative Semantics'. In Steinberg and Jakobovits (1971).

———(1971b)

'Presupposition and Relative Well-formedness'. In Steinberg and Jakobovits (1971).

Leech, G (1969)

Towards a Semantic Description of English. London : Longmans.

———(1974)

Semantics. Penguin Books : London

Lees, R B (1957)

'Review of *Syntactic Structures*'. In Harman (1974).

———(1960)

The Grammar of English Nominalization. The Hague : Mouton

———(1962)

'Transformatoinal Grammars and the Fries' Framework'. In Allen (1958).

Lyons, J (1966)

'Towards a 'Notional' Theory of the 'Parts of Speech'. JL 2:2,9,19-26.

————(1968)

Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge U Press : London.

————(1970a)

Chomsky. Fontana Modern Masters Series, London.

————(ed., 1970b)

New Horizons in Linguistics. Penguin Books, 1971.

————(1970c)

'Generative Syntax'. In Lyons (1970b).

————(1977)

Semantics. Vol 1 and 2. Cambridge University Press : Cambridge.

Macley, H (1971)

'Overview'. In Steinberg and Jakobovits (1971).

McCawley, J D (1968a)

'The Role of Semantics in a Grammar'. In Bach and Harms (1968).

————(1968b)

'Concerning the Base Component of a Transformational Grammar'. FL, Vol 4, 243-69.

————(1970a)

'Where Do Noun Phrases Come From'. In Steinberg and Jakobovits (1971).

————(1970b)

'English as a VSO Language'. *Lg*, 46 : 286-99.

————(1971a)

'Interpretive Semantics Meets Frankenstein'. *FL*, 7 : 285-95.

————(1971b)

'Prelexical Syntax'. In O'Brien (1971).

Matthews, G H (1964)

Hidasta Syntax. The Hague : Mouton.

Matthews, P H (1970)

'Recent Developments in Morphology'. In Lyons (1970).

———(1974)

Morphology. An Introduction to the Theory of Word-structure. CUP.

Nida, E A (1960)

A Synopsis of English Syntax. The Hague : Mouton. 1966.

O'Brien, R J (ed., 1971)

Report of the Twenty-Second Annual Round Table Meeting on Linguistics and Language Studies. Georgetown U Press, Washington D C.

Popper, K R (1963)

Conjectures ana Refutations : The Growth of Scientific Knowledge. London : Routledge and Kegan Paul.

Postal, P M (1964a)

Constiuent Structure : A Study of Contemporary Models of Syntactic Descriptions. Bloomington.

———(1964b)

'Limitations of Phrase Structure Grammars'. In Fodor and Katz (1964).

———(1968)

Aspects of Phonological Theory. New York : Harper and Row.

———(1971)

'On the Surface Verb 'Remind''. In Fillmore and Langendoen (1971).

Reibel, D A and S A Schane (eds., 1969)

Modern Studies in English : Readings in Transformational Grammar. Prentice-Hall, New Jersey.

Ross, J R (1967)

Constraints on Variables in Syntax. Bloomington, Indiana.

———(1970)

'On Declarative Sentences'. In Jacobs and Rosenbaum (1970).

Sapir, E (1921)

Language. New York.

———(1925)

'Sound Patterns in Language'. In Joos (1957).

Searle, J (1972)

'Chomsky's Revolution in Linguistics'. In Harman (1974).

Steinberg, D D and L A Jakobovits (eds., 1971)

Semantics : An Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics and Psychology. CUP, 1974.

Stockwell, R P, B Schachter, and B H Partee (1973)

The Major Syntactic Structures of English. Holt, Rinehart and Winston, New York.

Trubetzkoy, N S (1939)

'Phonemes and How to Determine Them'. In Fudge (1973).

Twaddell, W F (1935)

'On Defining the Phoneme'. In Joos (1957).

Weinreich, U (1966)

Explorations in Semantic Theory. In *Current Trends in Linguistics*, Vol 3, 395-447, Edited by T A Sebeok, also in Steinberg and Jakobovits (1971). Also published by Mouton : The Hague.

Wells, R S (1947)

'Immediate Constituents'. In Joos (1957)

Yngve, V (1961)

'Depth Hypothesis'. In *Syntactic Theory : Structuralist*, edited by Householder.

আজাদ, হুমায়ুন (1976)

Pronominalization in Bengali. Unpublished PhD Dissertation, University of Edinburgh, Edinburgh, U K. [এ-গ্রন্থে লেখকের নাম হুমায়ুন কবীর।]

——— (1977)

'Reflexivization in Bengali'. Jahangirnagar Review, Jahangirnagar University, Dacca. Vol 1, No 1, 128-159.

———(1978)

'Reciprocal Structures in Bengali'. Jahangirnagar Review, Jahangirnagar University, Dacca. Vol 2, 171-190.

———— (১৯৭৬খ)

'ট্রান্সফরমেশনাল জেনারেটিভ ব্যাকরণ'। বাঙলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, কার্তিক-চৈত্র, ৫৭-৮৩।

———— (১৯৭৭খ)

'বাক্য সর্বনামীয়করণ'। ভাষা-সাহিত্যপত্র, চতুর্থ বর্ষ, ১০৭-১৩৮ ; বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গির-নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

———— (১৯৭৭গ)

'ব্যাকরণবোধ ও বাঙলা ব্যাকরণ'। ''একুশের সংকলন'', বাঙলা একাডেমী।

———— (১৯৭৯ক)

'প্রচলিত ব্যাকরণ'। প্রকাশিতব্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা পত্রিকা, জুন ১৯৮০।

———— (১৯৭৯খ)

'সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান'। প্রকাশিতব্য : বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, জুন ১৯৮০।

———— (১৯৮০)

'কারক ও কারক ব্যাকরণ'। অপ্রকাশিত।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার (১৯৩৯)

ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪২ ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

———— (১৯৭২, নবীন সংস্করণ)

সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। বাকসাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

হাই, মুহম্মদ আবদুল (১৯৬৪)

ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব। বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।